জীবন-রহস্য

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ।। কলকাতা-৯

জীবন-রহস্য

সময়ের দূরত্বে সাধারণ কথাই রূপকথা হয়ে যায়। জীবনে কেউ তো আর বিশিষ্ট হবার জন্য গুছিয়ে ঘটনা ঘটায় না। বহতা নদীর মতই জীবনটা নাচতে নাচতে ঢেউ তুলে কালের তীর ধরে কথা-কাহিনী ছড়াতে ছড়াতে বয়ে যায়। তারপর একদিন সবজীবনই মৃত্যুর মত এক অনন্ত নিদ্রা বা মহাসাগরে গিয়ে পড়ে। সেই নিদ্রাসাগরই আমাদের জীবনের মোহানা। কিংবা এই মোহানা থেকেই অনন্ত জন্মের মহাজীবন!

আমি এমন কেউ নই যে, আমার কথা বলতে গিয়ে এত গম্ভীর হয়ে যাব। বরং বিদায়, মৃত্যু, পতন—এসব তো চিরকালই হাসতে হাসতে বলেছি। দুঃখের ভেতরেও হাসির ঝিলিক আমার আগে চোখে পড়ে। গুরুগম্ভীরের অসঙ্গতি আমায় হাসায়।

আমার বাবা আগের শতাব্দীর একেবারে শেষ দিককার বালক। এই শতাব্দীটাও পুরো বাঁচতে ইচ্ছে ছিল তাঁর। মরবার বছর আমার বউকে লাউশাক রাঁধতে বলে রান্নাঘরের সামনে মোড়ায় বসে একদিন বললেন, এই শীতটা বাঁচলে ঠিক নব্বই করে দেব।

তখন তাঁর তিরাশি। আমার বউ কয়লার আঁচে দুধ, কাঁচালঙ্কা, নৈনিতাল আলুর ফালি দিয়ে অতি উপাদেয় লাউশাক রাঁধছিল শ্বশুরের জন্য। বাবা বললেন, আমি জীবনে দু'বার বিয়ে করেছি। দু'বারই ফর্সা, লম্বা আর বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করেছি। তোদের মত না। ছেলেগুলো যে কি বিয়েই করলো!

কথাটার মানে ছেলের বউয়েরা কেউই তেমন ফর্সা বা বড়লোকের মেয়ে নয়। অথচ সেরকমই এক পুত্রবধূ বেলা দশটার সময় তাঁর জন্যে লাউশাক রাঁধছে। এসব ছিল স্নেহের সম্ভাষণ, কিংবা ভালবেসে আলাপ আলোচনা। যে ছেলের বউকে যখন পছন্দ হত তখন তাকে তিনি এইসব প্রিয় সম্ভাষণ করতেন।

বাবার আশি বছরের জন্মদিনে তাঁর পাশে বসে ভাত খেয়েছি। শুকনো লঙ্কায় লাল রংয়ের মাছের ঝোল। ভাত মাখলে হাত যেন হলুদ হয়। প্রচুর তেল মশলা। সেই সঙ্গে বেশ উঁচু করে ভাত। যার কাছাকাছিও আমরা খাই না। জীবনকে তিনি সবসময় রসনায় দাঁড় করিয়ে রাখতেন।

বাবার বাবা আমার জন্মের আগে মারা যান। নট্টকোম্পানীর যাত্রাপালায় আয়ান ঘোষ সাজতেন নাকি। ঠাকুমা ছিলেন তেজী মহিলা। গলায় গলগণ্ড। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। ঠাকুর্দা যাত্রা করতে গেলে, ফাঁকা বাড়িতে রাতে ডাকাত পড়লে ঘরের ভেতর ঠাকুরমা স্বামীর হুঁকোটা হাতে নিয়ে ঘুড়ুক ঘুড়ুক শব্দ তুলে হাঁকতেন—ফারাক যা! তার মানে বাড়ির কর্তা,আমি এখন বাড়ি আছি।

এসব কথা মায়ের মুখে শুনেছি। বড় ভাল কথক ছিলেন মা। বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপকের মেয়ে। বড় সদর শহরে জন্ম। বিয়ে হয়েছিল দোজবরে আমার বাবার সঙ্গে। অবশ্যি আমাদের প্রথমা মা বিয়ের ক'বছর পরেই এশিয়াটিক কলেরায় মারা যান। তাঁর কোন সন্তান ছিল না। স্মৃতি বলতে—একটা তেলের বাটি। তাতে খুদে লেখা ছিল—সৌরভিনী। প্রথমার নাম তাই ছিল কিনা জানি না। দেশবিভাগ অব্দি বাবা টানা চল্লিশ বছর ওই বাটি থেকেই সর্ষের তেল নিয়ে জমপেশ করে সারাগায়ে মাখতেন। পার্টিশনের পরে এপারে আসার সময় সেই বাটিটা, একটা ক্যারম বোর্ড আর বড়দার শরীরচর্চার বারবেলটা হারিয়ে যায়। অন্যের তুলনায় পার্টিশনে আমরা কমই হারিয়েছি বলতে হবে। তবে হারিয়েছি—কৈশোর, রূপকথা আর জলজ্যান্ত একজোড়া নদী—রূপসা আর ভৈরব।

দাদামশায় বাল্যবিবাহ নিবারণী সমিতির সভাপতি ছিলেন। তাঁর বন্ধু ছিলেন—ফজলুল হক, নাজিমুদ্দিন, নবাব সলিমুল্লা—যাঁর বাড়িতে মুসলিম লীগ ভূমিষ্ঠ হয়। ১৯১৯তে সেই সলিমুল্লার বাড়ি দেখে এসেছি ঢাকার সদর ঘাটের কাছে। জরাজীর্ণ প্রাসাদ। সর্বাঙ্গে অশ্বত্থের শেকড়ের অক্টোপাস। জানলা নেই—দরজা নেই। ভেতরে জুয়াড়ি আর সাপের আড্ডা।

দাদামশায় দশ কন্যা দুই পুত্রের জনক ছিলেন। পড়ার ঘরে লোহার সিন্দুকে দুই ছেলের জন্যে একলক্ষ কাঁচা টাকা জমিয়েছিলেন। বন্ধ ঘরে বসে ইতিহাস, ল্যাটিন, হিব্রু পড়তেন। আর কাঁচাটাকা বাজিয়ে শব্দ শুনতে ভালবাসতেন। অসম্ভব সুপুরুষ আর পণ্ডিত ছিলেন। দুবেলা খাবার আধঘণ্টা আগে আদার রস খেতেন খিদে বাড়াতে। এগারো থেকে তের মাসের মাথায় বাবা হতেন। সেতার বাজাতেন ভাল। পড়াতেন ভাল। সস্তার আমলে জমিদার-তনয়দের প্রাইভেট টিউটর ছিলেন মোটা টাকায়। জানি না, কোশ্চেন লিক করতেন কিনা। অর্শ আর ভগন্দরের মত দু'দুটো ফোর্থক্লাস অসুখে ভুগতেন। সামথিং কিকিং। তাঁর শ্রাদ্ধে গিয়ে দেখি—বিশাল বাথরুমে দশজোড়া জুতো সাজানো। চকচক করছে। আমরা পরি তখন রবার সু।

সদর ঘাটে প্রাতঃভ্রমণের সময় গড়গড়া খেতেন। তখন পেছনে চাকরের হাতে অম্বুরী তামাক সাজানো আলবোলায় সুগন্ধী ধোঁয়া উড়তো।

বাল্যবিবাহ নিবারণী সমিতির এই দুঁদে সভাপতি নিজের মেয়েদের বিয়ে দিতে লাগলেন আট-ন'বছর বয়সে। গৌরীদানের পুণ্য অর্জন। প্রত্যন্ত গাঁ থেকে দোজবরে ধরে ধরে। যাতে কিনা একশো টাকার ভেতর বিয়ে কমপ্লিট হয়। টাকা জমাচ্ছিলেন তখন। এই প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে আর পরের বছরগুলোয়।

তাই আমার ন'বছরের মা গিয়ে পড়লো নদী আর খালের জটাজালে ঘেরা এক গাঁয়ের শ্বশুরবাড়িতে। শ্বশুর যাত্রার দলে আয়ান ঘোষ। বিয়ে করে

জায়গাজমি পেয়ে উঠে এসেই যাত্রাদলে জয়েন করেছেন। অভিনয় আর গাঁতিদারি একই সঙ্গে চলে। শোনা কথা, নদীর ঘাটে বাঁধা বজরায় তাঁর সঙ্গিনী থাকতো।

অনেক পরে লায়েক হয়ে বুঝলাম, জীবনে অনেক কিছুই ফিরে শুরু করা যায় না। মা তো কাচের পুতুল নয় যে ভেলকিওয়ালার ম্যাজিক মলম দিয়ে ফিরে জুড়ে দেবো—নয়তো মাকে বলতাম—মা, তুমি আবার ন'বছরের সেই খুকিটি হয়ে যাও তো—মনে কর আমরা তোমার ছেলেরা কেউ জন্মাইনি—তোমার জীবন আবার ফিরে শুরু হোক।

মায়ের কোন খেদ ছিল না। গাঁয়ের পুকুরে বসে বাসন মাজছেন—এমন সময় বিলেত থেকে তাঁর বাল্যসখীর চিঠি এল। বোধহয় নিজের ছেলেমেয়েদের মধ্যেই পূর্ণতা খুঁজতেন তিনি।

আমরা জন্মেছি দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানে। যখন ডি. এ., পেনিসিলিন, গুপ্তরোগ আসেনি। ঠিকেদারি ছড়ায়নি। যৌথ পরিবার ভাঙেনি। অর্থবলের চেয়ে লোকবল যে অনেক বড় এই বিশ্বাসটা মানুষের ছিল। মুদি চাকরেবাবুর পেছন পেছন ঘুরতো—দয়া করে আমার দোকান থেকে মাসকাবারি সওদাটা করবেন।

নারকেল গাছের সুখী অলস পাতাগুলোর আড়মোড়া ভাঙার ফাঁকে জ্যোৎস্না এসে বারান্দায় পড়তো। পাড়ার বড় দিঘিতে সাঁতার কেটে, জল উথালপাথাল করে তবে স্নান। বহুরূপী, দরবেশ, মুস্কিল আসান আর লালপাগড়ি সমান আকর্ষণ করতো। আর কুইট ইন্ডিয়ার পরে পরেই আদালতের মাথায় চরকা আঁকা পতাকা তোলা যে কত গুরুতর ব্যাপার, তখন তা সবটা বুঝতে পারিনি। যুদ্ধ, দশচাকার লরি বোঝাই হুল্লোড়বাজ সৈন্যদের রাস্তা পার হওয়া, ব্ল্যাক আউট আর হঠাৎ গজানো ঠিকেদার বড়লোক আমাদের জ্ঞানী করে দিল কৈশোরেই।

কিন্তু তার আগে মাকে দেখতাম উঠোনে বেড়া দিতে, ছাগল পুষতে, গান গাইতে। বড় দুই দাদা ঢাকা আর কলকাতায় পড়তো। বাবা চাকরি নিয়ে ছোট শহরে বাড়িভাড়া নিয়ে উঠেছেন। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, দারোগার শহর। খেয়াঘাট, কোর্ট, সিনেমাহল, বটতলা, হাইস্কুলের শহর। বেশ্যালয়, যাত্রা, থিয়েটার, গানের মাস্টারের শহর।

মা ছাগল পুষতেন দুটো কারণে—আমরা মিছরি দিয়ে জ্বাল-দেওয়া ছাগলের দুধ খেতাম। ফলে কোনদিন সর্দিকাশি হয়নি। আর ছুটিতে দাদারা এলে বাচ্চা পাঁঠা কাটা হোত।

ছাগলদের মা নাম দিয়েছিল—হরিণ, ধাড়ি, শুক্লা। এদের ঘর মা নিজে পরিষ্কার করতো। শুক্লা কয়েকবার বাচ্চা দেবার পর চরতে বেরিয়ে একদিন সন্ধ্যেয় আর ফিরলো না। পরে হিসেব করে দেখেছি—মায়ের তখন তেত্রিশ চৌত্রিশ বছর বয়স। এখন একজন ওই বয়সের মহিলা নিশ্চয় ছাগল পোষে না,

'প্রবাসী' পড়ে না, 'বৈবতক' মুখস্থ বলে না কিংবা নিজের বড় ছেলে ছুটিতে এলে তার সঙ্গে চার্লি চ্যাপলিনের 'গ্রেট ডিক্টেটর' দেখতে যায় না উল্লাসিনী সিনেমা হলে। এখনো সে দৃশ্য চোখে ভাসে। মাকে নিয়ে বড়দা সিনেমায় যাচ্ছে। যেন কোন দিদিকে নিয়ে ছোট ভাই সিনেমায় যাচ্ছে। মায়ের বারো বছর বয়সে বড়দা হয়েছিল।

বাবা কোর্ট থেকে অনেক রাতে বাড়ি ফিরলেন। ঘুষ খেতে হোতো বলে বাবাকে বেশি কাজ করতে হত। দক্ষ লোক ছাড়া ঘুষ খেয়ে হজম করা যায় না। ঘুষ মানে ছ'কোনা সিকি, দুয়ানি, বড় তামার পয়সা। সেগুলো সন্ধ্যেরাতে লাল কেরোসিনের প্রায়-অন্ধকার হেরিকেনের সামনে একদিন বাবাকে গুনতে দেখেছিলাম। আট টাকা ছ'আনা মোট। মায়ের হাতে তুলে দিচ্ছিলেন বাবা। ঘুষের পয়সা রাখবার জন্যে মা বাবার পাঞ্জাবির বাঁদিকের অরিজিনাল পকেট কাচি দিয়ে কেটে একটা বড় পকেট নিজেই সেলাই করে বসিয়ে দিয়েছিলেন সেখানে। আমরা বলতাম কোর্টের পাঞ্জাবি।

বাড়ি ফিরেই বাবা নিরুদ্দেশ শুক্লার কথা শুনলেন। কিন্তু বাবার এসবে মন দেবার সময় ছিল না। থাকতোও না। কোনমতে খাওয়া দাওয়া করে ফাইল খুলে বসে গেলেন অন্ধকার হেরিকেনের সামনে। সঙ্গে পান আর মতিহারি তামাক। আমরা ঘুমের ভেতর লাস্ট ট্রেন ছাড়ার শব্দ পাই। শেষরাতে কলকাতার গাড়ি থামতো আমাদের স্বপ্নের ভেতর। স্টিমারের ভোঁ শুনে বুঝতাম ফ্লোরিকান ছাড়লো। কিংবা গারো। আরেকটা স্টিমারের নাম ছিল বালুচ। তার ভোঁ সবচেয়ে গম্ভীর। দিনের বেলায় এই বালুচের ডেক থেকেই রান্না মাংসের সুগন্ধ স্টিমারঘাটের বাতাসে ছড়িয়ে পড়তো।

বাড়ির উল্টোদিকে খোলার ঘরে থাকতো দুই বোন। আলাপি আর গোলাপি। দুই বোনই ঝিগিরি করতো! তাদের পাশের ঘরে থাকতেন কনস্টেবল জুলফিকারদা। প্রায়ই বিকেলে মাটির বারান্দায় বসে অনেক তোড়জোড় করে বউকে পোস্টকার্ড লিখতেন।

তো সেই আলাপি আর গোলাপি বাটি-চালান দিল। থালার ওপর বাটি। তার ভেতর চাল। বাটিটা উপুড় করে রাখা। আলাপি বলল, মা শুক্লাকে চুরি করেছে নরসিং দারোয়ান।

জমিদারবাবুর দারোয়ান। আমরা তাদেরই বাড়ির ভাড়াটে। সামান্য ভাড়াটের বউয়ের কথায় স্বীকার যাবে কেন দারোয়ান!

মায়ের মান রাখতে বাবা মামলা ঠুকলেন। একদিন সাহেবের কোর্টে মাকে যেতে হল। মা তার প্রিয় ছাগলের কথা বলতে গিয়ে আদালতে কেঁদে ফেলল। গাভিন শুক্লাকে কেটে খেল নরসিং। একবার ভাবলো না, ওর পেটে বাচ্চা?

জেল হল নরসিংয়ের। ধন্য ধন্য পড়ে গেল সারা পাড়ায়। তারপর তা

ছড়ালো সারা শহরে। খবরটা বোধহয় আরও চাউর হয়। কোন মফঃস্বল বার্তায় বোধহয় বেরোয়। সেখান থেকে পড়েই কিনা জানি না—জেলার ভারতবিখ্যাত মানুষ স্যার পি. সি. রায় মাকে একখানা চিঠি দিয়েছিলেন।

আমরা তখন জেল খাটিনি। স্বাধীনতা আন্দোলনে যাইনি কেউ। শুধু শুনতাম—বাবার খুড়তুতো ভাই, আমাদের ক্ষীরোদকাকা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের যুদ্ধে পুলিশের গুলিতে মারা যান। তাঁকে আমরা কোনদিন দেখিনি। আমরা শুধু বেঁচে থাকবার চেষ্টা করছিলাম। প্রকৃতির সঙ্গে—উড়োখবরের সঙ্গে—রূপকথার সঙ্গে বড় হচ্ছিলাম।

নদীর ঘাটে পাটের গদি ছিল মতিলাল ঘাষিরামের। বাবার নামও মতিলাল দিয়ে শুরু। নতুন পিওন একদিন একটা খাম ফেলে দিয়ে গেল বাড়িতে। বাবা খুলে দেখেন তার ভেতর চৌষট্টি হাজার টাকার চেক্ একখানা। বাবা আমার হাতে দিয়ে বললেন, যা, ঘাষিরামের গদিতে দিয়ে আয়। ভুল করে দিয়ে গেছে।

তখন বোধহয় বাবার মাসমাইনে চৌষট্টি পেরোয়নি। কিন্তু তাই বলে বাড়িতে আনন্দের কোন অভাব ছিল না। দাদারা ছুটিতে এলে সারা বাড়ি সুখে ভাসতো। ভোররাতে উঠে বড়দা আমাদের দুই ছোটভাইকে নিয়ে নদীর ধারে শিববাড়ি বেড়াতে যেতো। পথে খানিকটা গিয়ে বড়দা সুধীন পেশকারের বাড়ির সামনে দাঁড়াতো। আমাদের দূরের একটা গাছ দেখিয়ে বলতো, কে আগে ওখানে যেতে পারো। আমরা দু'ভাই ছুটতাম। ছুটে গিয়ে গাছের আড়ালে দাঁড়াতাম। সুধীনবাবুর বড় মেয়ে সুরমাদি তখন শাড়ি ধরেছে। ভোরবেলা, তখনো ভাল করে আলো ফোটেনি, ফুল তুলতো সুরমাদি। বড়দা সেই ফুল একটা নিয়ে সুরমাদির চুলে গুঁজে দিত। সেই প্রথম প্রেম দেখি। পরে, অনেক পরে নিজের বেলায় অত সুন্দর করে কারও চুলে ফুল দিতে পারিনি। সে স্টাইলই আলাদা। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে পৃথিবীর ফুলগুলো অনেক সাদা ছিল। সদ্য কিশোরীদের মাথায় আরও অনেক চুল ছিল—সে চুল আরও লম্বা হত—আরও কালো দেখাতো।

আসলে সেটা ছিল জীবনেরও ভোরবেলা। যেন কোন অনন্ত ভোর, কোনদিন যা ফুরোয় না। তখন কি জানি জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে অল্পদিনের ভেতরেই দুপুর, বিকেল এসে যাবে—গভীর নিশীথকে সামনে রেখে বসে থাকবো কোনদিন!

বর্ষায় আমাদের বাড়ির সামনের পুকুর ভেসে গিয়ে আলাপি গোলাপির উঠোনের জামরুল গাছের অষ্টাবক্র শেকড় ঢেকে ফেলল। সাদা মাখন রংয়ের জামরুলগুলো ঝাঁকড়া গাছের নুয়ে পড়া সবুজ পাতা ভর্তি ডালপালার ভেতর দিয়ে তারা হয়ে ঝুলে আছে। আমার ছোট ভাইকে নিয়ে সে গাছে উঠলাম। বর্ষায় ভিজে গাছ। পিছলে দু'ভাইই নিচের পুকুরে পড়লাম। সে কি আনন্দ! পৃথিবীটা যেন জল দিয়েই তৈরি! অত উঁচু থেকে পড়েও ব্যথা পাচ্ছি না।

একদিন ভোরে উঠে শুনি আলাপি গোলাপি দুই বোনকেই সাপে কেটেছে। আলাপিকে বাইরে এনে শুইয়ে দিল জুলফিকারদা। মারা গেছে আলাপি। জুলফিকারদার চোখে জল। মুখে ক্ষোভের ছায়া। বলল, গোলাপিও বাঁচবে না। নাক বসে গেছে। খোনা গলায় কথা বলছে। একজোড়া গোখরো আছে ঘরে। গোলাপির একটা কিছু করি। তারপর ওদের ধরবো।

বেলা দেড়টা দুটোর ভেতর গোলাপিও গেল। তাকেও বাইরে এনে শুইয়ে দিল জুলফিকারদা। আমাদের মায়ের চোখেও জল। আহা রে! দু বোনে মুড়ি ভাজতো, মোয়া পাকাতো আর ঝিগিরি করতো। ধর্মে সইবে না—

হরিবোলের ভেতর ডবল ডেডবডি শ্মশানে চলে গেল। আমাদের দাদারা বাঁশ কেটে এনে বেলা দশটা-এগারোটা নাগাদই ভারা বানাচ্ছিল। ওরা রওনা হয়ে যেতেই জুলফিকারদা দিনে দিনেই একটা হেরিকেন ধরিয়ে ফেলল। তারপর বড় একটা শাবল হাতে আলাপিদের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, গর্তটা আমি চিনি।

অনেকটা মাটি খুঁড়ে ফেলল জুলফিকারদা। চ্যাটাইয়ের দেওয়াল। গোল-পাতার ঘর। মাটির মেঝে। বাইরে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছিল। আবার রোদ উঠছিল। বেলা চারটে নাগাদ কি ফোঁসফোসানি! সাপেরও রাগ থাকে জানতাম না। তার চেয়েও বেশি রাগ জুলফিকারদার। গর্ত খুঁড়ছে আর চেঁচাচ্ছে—তখন মনে ছিল না? ওদের দু'বোনকেই কাটলি কেন (যেন একজনকে রেহাই দিলে এতটা দোষের হত না)?

একজোড়া গোখরো। দুটোই ধরা পড়ল। ভয়ে সবাই আমরা উঠোনে পিছিয়ে এসেছি। জুলফিকারদা প্রথমটাকে ধরেই এ্যায়সা এক ঝাঁকুনি দিল—সে তো সাপ নয়—লাটিম ঘোরানোর লেত্তি হয়ে উঠোনে চিৎ হয়ে পড়ল। পরেরটারও সেই দশা। দুটোই পাঁচ'ছ হাত করে লম্বা।

বর্ষার বিকেল। ওরা যেই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে হাতের থাবার চেয়েও বড় ফনা তোলে—আর অমনি জুলফিকারদা এক একটাকে ধরে মাথার ওপর ঘূর্ণী দিয়ে যম-ঝাঁকুনি মারে।

পিটিয়ে মারবো না। জ্যান্ত পোড়াবো।—জুলফিকারদা বলতেই আমরা দু'ভাই আলাপি গোলাপির মুড়ি ভাজার উনুনের তুলে রাখা পাটকাঠি, শুকনো কাঠকুটো উঠোনে এনে জড়ো করি। শেষে জুলফিকারদা হেরিকেন কাৎ করে কেরোসিন ঢাললো। মহা ধুমধামে জ্যান্ত সাপ সৎকার চললো সন্ধ্যেরাত অব্দি।

মা আমাদের বুঝিয়েই পারে না—আলাপি গোলাপি আর কোনদিন ফিরে আসবে না। প্রতিশোধ আর মৃত্যুর সঙ্গে একই দিনে দেখা হল। সেই সঙ্গে দেখলাম মানুষের শেষযাত্রা। আর জানলাম—দক্ষ কথাটার মানে জুলফিকারদা।

যাত্রাদলের অভিনেতার ছেলে হয়ে বাবা থিয়েটার বা গানবাজনায় যাননি। জমিজমাও নাড়াচাড়া করেননি। সিধে সরকারী চাকরি। বাংলাদেশের ম্যাপের

নিচে সমুদ্রের ভেতর যেসব দ্বীপের ছোটো ছোটো ফোঁটা চোখে পড়ে—সেই মার্টিন আইল্যান্ড, চর কুতুবদিয়া, সন্দ্বীপে নৌকো করে মানুষ নিয়ে যেতো কোন এক ইউনি সাহেব। সরকারী কলোনাইজার ডিপার্টমেন্ট থেকে বাবা সেই সাহেবের সঙ্গী। কুড়ি বাইশ বছর বয়স। নৌকোয় সাহেবের মুরগি রান্না করা, নোটবইতে ডিক্টেশন নেয়া, আবার বড় নৌকো থেকে দ্বীপে মানুষ নামানোও বাবার কাজ।

এসব কথা শোনা। আমাদের জন্মের বিশ বাইশ বছর আগের কথা। সময় মিলিয়ে দেখেছি—তখন পৃথিবীতে কত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে—চার্চিল তারও বছর-দশেক আগে বুয়োর যুদ্ধ থেকে বাড়ি ফিরে দেখলো, তার মায়ের আবার বিয়ে হচ্ছে—রবীন্দ্রনাথ তার কয়েক বছর বাদে বলাকা লিখবেন—আর আমার বাবা ভাসন্ত নৌকোয় বসে দোদুল দশায় মাংস বানাচ্ছেন—আবার ইউনি সাহেবের ডিক্টেশনও নিচ্ছেন। একসঙ্গে এই দুটো কাজ কি করে সম্ভব? অনেক—অনেক পরে আমার মনে হত বাবা প্রথম পানিপথের যুদ্ধেও ছিল।

এই:বাবাকে দেশে ফিরে লাঠি হাতে খালপাড়ে যেতে হোত। কেননা তার নয় দশ বছরের ইজের পরা দাসা বালিকাবধূ বহুক্ষণ হল সাঁতার কাটছে। নাইতে নেমে আমাদের মা নাকি জল থেকে উঠতো না।

যখন ইস্কুলে পড়ি—তখন দেখেছি—বাবা ফাইল হাতে কলকাতার ট্রেনে উঠছেন! আমরা বাবাকে স্টেশনে তুলে দিতে গেছি। কামরার জানলায় বসে বাবা। আর প্ল্যাটফর্মে আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে কিছু মেয়ে পুরুষ। দাড়ি-ওয়ালা বুড়ো। অশক্ত বিধবা মা। কিংবা ঘোমটা দেওয়া বউ। সঙ্গে কাচ ছেলে।

সবারই চোখে জল। সবারই মুখে এক কথা। মতিবাবু! পেশকারবাবু! দয়া করে একটু দ্যাখবেন। আপনার চেষ্টায় অসাধ্য কিছু নাই।

বাবা হয়তো বললেন, দুটো ডাব কেটে রেখে যা! যা গরম—

অমনি তারা ডাব আনতে ছুটলো।

কোন বুড়ো হয়তো কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, আপনি না দেখলি এই কচি বউডা বেধবা হবে পেশকারবাবু।

বাবা ওদেরই ডাবটা খেয়ে হয়তো খেঁকিয়ে উঠলো, তা আমি কি করবো? খুন করার সময় আমারে বলে করেছিল?

যখন হয়ে গেছে তখন আর কি করা যাবে বলেন! আপনি দেখলি সব ঠিক হয়ে যাবে। যে খুন হল সে তো আর বাঁচবে না। জ্যাতা মানুষটারে বাঁচায়ে রাখেন। আপনার কলমের জোর জানতি কি আর আমাদের বাকি আছে!

বাবা চুপ করে থাকতেন। ট্রেন ছেড়ে দিলে ওরা গাড়ির পেছন পেছন দৌড়োতো। একটু দ্যাখবেন মতিবাবু!

বাবা ওরই ভেতর কামরার বাইরে মাথা এগিয়ে দিয়ে আমাদের বলতেন,

অনুকূল মিত্তিরের মুদিখানায় সর্ষের তেলের টিনটা পড়ে আছে, মনে করে এনে রাখবি। বলেই বাবার মাথা কামরার ভেতর ফিরে গেল।

বাবা কলকাতা যাচ্ছে। দায়রা জজের ফাঁসির অর্ডার হাইকোর্টকে দিয়ে কনফার্ম করিয়ে আনতে। বছরে এমন দু'চারবার যেতোই বাবা। বাবার ভাষায় মোটা টি. এ.। একবার ঘুরে এলেই পাঁচ টাকা বারো আনা। নগদ নগদ। এ কি ছাড়া যায়—

আমি তখন ওদের দেখতে পেতাম। প্রায় ডিস্ট্যান্ট সিগনাল অব্দি ছুটতে ছুটতে আসামীর ফ্যামিলির অনেকেই লাইনের পাশে এবড়োখেবড়ো খোয়াভর্তি মাটিতে পড়ে গেছে। কেবল ছোটো ছেলেটা তখনো দৌড়োচ্ছে। ভ্রুক্ষেপহীন নির্বিকার ট্রেনটা তখন বিন্দু হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল।

এরই ভেতর তেরোখেদার কাছাকাছি বর্ষার রাতে ত্রিপলে ঢাকা কোন স্টিমার চারশো প্যাসেঞ্জার নিয়ে ডুবে গেল। তখনো টাইটানিকের কথা পড়িনি। শিববাড়ির ডগায় অশ্বত্থ-চারা আরও বড় হল।

আমি আমার ছোটো ভাইকে নিয়ে স্কুলে যাই। রাস্তার গলা পিচ উডপেন্সিলের পেছন দিয়ে খুঁটিয়ে তুলে নাড়ু পাকাই। কবরখানা রোড—ধর্মসভা—ডাকবাংলোর মোড়—গান্ধী পার্ক—বড় মাঠ—পুলিশ লাইন। তারপর আমাদের স্কুল। একদম আদালত মার্কা চেহারা। ক্লাস বসে গেছে। কম্পাউন্ডের বাইরের রাস্তায় বাংলো থেকে ডি. এম. সাহেব বেরোলো। হাফপ্যান্ট পরে। হপ করতে করতে সাইকেলে।

কি রে? আজও দেরি হল কেন?

গরমের ভেতর এতটা রাস্তা ছুটতে ছুটতে এসেও ফার্স্ট পিরিয়ডের শুরুতে ক্লাসে আসতে পারিনি। এস. এম. আলি স্যার পড়াচ্ছিলেন। সবদিকে তাঁর নজর। নিজের সাইকেলের রডে খোদাই করে লেখা এস. এম. আলি। এক এক দিন তিনি নিজেই হাতের দু'খানা পাঞ্জা সারা ক্লাসের দিকে উঁচু করে তুলে কাঁপাতে থাকেন—আর বলেন—আমার হাতের তালুতে পোকা আছে। তোগো মারবার জন্য তারা আমার হাতের মধ্যে কিলবিল কিলবিল করে।

চারদিক রোদে গনগন করছে। ছোটোভাই টুক করে তার ক্লাসে ঢুকে গেছে। আমি ঢুকতে পারছি না। জীবনে কোথাও একটু ছায়া নেই। সব তেতে আছে।

বললাম, রান্না হতে দেরি হল স্যার—

দেরি হল কেন?

মায়ের শরীর তো ভাল নয় স্যার—

কি হয়েছে?

কাল রাত্তিরে আমাদের একটা ভাই হল স্যার।

তোদের তো পেরায়ই ভাই হয় দেখতিছি। যা জায়গায় গিয়ে বস।

লাস্ট বেঞ্চিতে গিয়ে বসি। সেখানেই আমার মার্কামারা বন্ধুরা বসে। নৃপেন, মাখন, সোয়েদুল, ইসলাম, অচিন্ত্য, হায়দার আলি। বছরের গোড়ায় সবাই মন দিয়ে বইয়ের মলাট দিই। বই খুলেই পয়লা পাতায় লিখি—দিস বুক বিলংস টু—

নৃপেন জানতে চাইল, এবারের ভাইটা কেমন হল ?

নীল রঙের—

যাঃ !

সত্যি।

তোদের না একটা লালভাই হয়েছিল ?

হুঁ। সেটা তো সাতদিনের বেশি বাঁচলো না।

আসলে পরে বুঝতে পেরেছি—মাকে কাপড় কাচতে হত—রান্না করা ছিল মাঝে মাঝে—তা ওপর উঠোনে কাঠের আঁচে ধানসেদ্ধর কড়াই ওঠানো নামানো—উপরন্তু মা মাঝে মাঝেই আছাড় খেতো। তাই আমাদের কিছু ভাই সময় হবার আগেই পৃথিবীতে এসে যেতো—কিংবা পেটে থাকতেই ব্যথা পেয়ে নীল লাল হয়ে যেতো। তাদের কেউ বেঁচেছে—কেউ বাঁচেনি।

তখন নতুন একটা প্রাণ বাড়িতে এলেই আনন্দ। সে নিজের ভাই-ই হোক আর আমাদের পোষা ছাগলের বাচ্চাই হোক। নতুন প্রাণ তো। ভাই হলে একটু বড় হয়ে ফেনাভাত খাবে। ছাগলের বাচ্চা হলে ভাতের ফ্যান খাবে উঠে দাঁড়াতে শিখলেই। বাড়ির বারান্দায় সব সময় হাসিখুশির ছেঁড়া পাতা উড়ছে। কারও না কারও অক্ষর পরিচয় চলছে। সে পাতা উড়ে গিয়ে উঠোনে পড়লেই হল। পাঁঠা বা পাঁঠি তা মুহূর্তে খেয়ে ফেলবে।

আদালতের সামনেই বটতলায় মুহুরী, মোক্তার, উকিল। তার ভেতরেই সালসার বিজ্ঞাপন ঝুলিয়ে সাধু বসে। বাবা কোর্ট থেকে ফেরার পথে সেই সালসা কিনে ফিরতেন। মাকে দিয়ে বলতেন, খাও। গায়ে গত্তি লাগবে। রক্ত হয়।

মা খেতো। খেয়ে মায়ের গায়ে রং ফুটে বেরোতো।

একবার নগেন ডাক্তারকে ডাকতে হল। সে বাবাকে বলল, আপনার ওয়াইফের তো অ্যানিমিয়া। ডুমুর, থোড়, মেটে, মোচা—এসব খুব খাওয়ান। রক্ত হবে।

কেন ? ওষুধ তো খাচ্ছে।

কি ওষুধ ? দেখি !

বাবা সালসার একটা আধোখালি বোতল এগিয়ে দিয়ে বললেন, এটা খাবার পর মোটাও হয়েছে। নগেন ডাক্তার বোতলটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গন্ধ শুঁকে বলল,

এ তো দিশী। একে রক্ত কম তাতে এই খাওয়াচ্ছেন—মোটা তো হবেই—গায়ের রংও ফিরে যাবে—কিন্তু ডেলিভারির সময় মরে যাবেন যে!

ওটা দিশী?

খাঁটি দিশী। গন্ধ শুঁকে দেখুন না।

মা কিন্তু মরেনি। অনেক পরে নিজে সংসার করতে গিয়ে বুঝেছি—মা সূর্যের আলো, চাঁদের জ্যোৎস্না, আমাদের দাপাদাপি, আমাদের নিয়ে ভবিষ্যতের স্বপ্ন, খাবার থালায় নধর সবুজ সব ডাঁটালো কাঁচালঙ্কা থেকেই বেঁচে থাকার রস শুষে নিতো। নয়তো ইতিহাসের মমতাজের মতই চোদ্দবার জননী হয়েও মা কি করে ছাগল পুষতো, গান গাইতো, নিজের ছোটোবেলা, বিয়ের কাহিনী অমন রূপকথার মত বলতো! নিশ্চয় ঘুমের ভেতরে মা স্বপ্নে ইতিহাসের বীরাঙ্গনা হয়ে যেতো—কিংবা নিশুতি রাতে গাছপালার শেকড় থেকে পৃথিবীর ভেতরে রস টেনে নিতো।

আমাদের প্যান্টে বোতাম নেই। বইয়ের মলাট নেই। মাথার বালিশের ওয়াড় নেই। রান্নাঘরের ছাদের টালি ঝড়ে উড়ে গেছে কয়েকখানা। তবু আমরা দ্রুত বেড়ে উঠছি। ক্লাসে প্রমোশন পাচ্ছি। একদম ছোটো ভাইটা হাঁটতে শিখেই দৌড়চ্ছে। আমরা জানি না কোন যুগে আছি। হিমযুগ? না সত্যযুগ? ঠিক বলতে পারব না। ওর ভেতরেই মা একদিন হয়তো হেরিকেনের আলোয় ফাটাচটা একটা আয়নার সামনে বসে ছাল উঠে যায় এমন একটা পাফ বুলিয়ে মুখে পাউডার মাখলো। তারপর কাঁখে আমার পরের ভাইটাকে নিল। পেছন পেছন আমি। চললাম সবাই জমিদারবাবুর বাড়ি। সারা এলাকায় ও-বাড়িতেই একটি রেডিও। মায়ের অনুরোধে জমিদারগিন্নি রেডিওটা খুলে দিল। কলকাতা থেকে বড়দার গলা ভেসে এল, তোমায় চিনি গো চিনি—ওগো বিদেশিনী—

মা গান শুনবে কি! দু'চোখে জল। এই সময় জল আমার কাছে একটা নরম পৃথিবী। যার ভেতর আছাড় খেলে ব্যথা লাগে না। রহস্যময়। অন্তহীন। যার ওপর নৌকোয় ভাসা যায়। নিচে ডুব দিলে মনে হয়, হয়তো মৎস্যকন্যাদের দেশে পৌঁছে যাবো। ভৈরবের বুকে তীর ঘেঁষে লগি ঠেলে তির তির করে এগোই। ডুব দিয়ে ভুস করে ঠেলে উঠতে গিয়ে দেখি, একদিন আর ওপরে ভেসে উঠতেই পারছি না। যেখানেই ভাসতে যাই সেখানেই মাথার ওপর নৌকো ঠেকে। এদিকে দম ফুরিয়ে গেছে।

বুকের ভেতর সে কি যন্ত্রণা! চোখে জল ঢুকে যাচ্ছে। যতবার ভেসে উঠতে যাই কানের পাশে বিরাট বিরাট লোহার নোঙর। একটুর জন্যে মাথায় লাগে না। বুঝলাম আমি তখন ভৈরবের জলের নিচে সেই জায়গাটায় আছি যেখানে পরের পর পাটের বড় নৌকোগুলো সার দিয়ে মাঝনদী অব্দি নোঙর

ফেলে ভাসছে। হাত দু'খানা শিথিল হয়ে ঝুলে পড়লো। যে শরীরটাকে স্প্রিং জ্ঞানে যা ইচ্ছে করে বেড়াই—সেটাই এখন একদম মাটির। বিসর্জনের সরস্বতীর মতই টুপ করে একদম জলের তলায় খসে পড়বে।

সামান্য যেটুকু প্রাণ ছিল সেদিন শরীরে, তারই জোরে একদম ফটো ফিনিশে দুই বজরার মাঝখানে ভেসে উঠলাম শেষ মুহূর্তে। তারপর বুকভরে বাতাস খেলাম—আকাশের দিকে তাকিয়ে—চিৎ হয়ে ভাসতে ভাসতে। বুঝলাম আমার তো এতক্ষণে তলিয়ে ভৈরবের গহীন জগতে চলে যাওয়ার কথা!

উপরের পৃথিবীতে আমার এই বিপদে কোন উনিশ বিশ হয়নি। রাস্তায় দিব্যি সাইকেল-রিক্সা। নদীর ঘাটের গাছপালায় দিব্যি সূর্যের আলো। ভাগ্যিস মরে যাইনি। মরে গেলে মা ঠিক মারতো। ওটাও তো তখনো একটা অন্যায়। মায়ের কথা না শুনে মরে যাচ্ছি! অ্যানুয়াল পরীক্ষা বাকি। ক্লাস ফোরে ওঠা হয়নি! এই সময় কি মরা যায়! তেজোদের বাগানের গাছে গাব পাকবে এবার। সন্ধ্যে সন্ধ্যে বাদুড় আসছে। ওগুলো খাবে কে! এখন মরা যায় না কিছুতেই।

জল থেকে উঠে লাল চোখে কালীবাড়ির পেছনে বটতলায় কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিলাম। আমার একটু আগের মরে যাবার বিপদের কথা কাউকে বলা যাবে না। তাহলে নিশ্চিত ধোলাই। মুখ ফসকে বেরোলেই হল। বেঁচে থেকেও সুখ নেই।

কিংবা বেঁচে থাকার ভেতরেই সুখের নদীটা কুল কুল করে বয়ে যায় সবসময়। আঙুল কেটে গেলে চুষে রক্ত বন্ধ করার সময় তা যেন আন্দাজে টের পাই। ব্যথা —অথচ মুখে অন্যরকমের স্বাদ।

আমার সঙ্গে সবসময় ছোট ভাই। আমরা দু'জন দু'জনের ছায়া। আমাদের চেয়ে সাইজে সবাই বড়। রাস্তা দিয়ে হাঁটা পাশের গরুটা। নারকেল গাছ। এমন কি সবে শাড়ি ধরা সেদিনকার খেলার সাথী সব কচি কচি দিদিরাও। তাদের সঙ্গে ফুল তুলে মালা গাঁথি। শেষরাতে আকাশে তখনো চাঁদ। বাতাসে শীত। অন্ধকার বকুল গাছের তলায় সারা রাত ধরে ঝরে পড়া সাদা তারার গুঁড়ো। টগরদি, সুষমাদির পাশে বসে ছুঁচসুতোর বদলে সুনোলতায় মালা গাঁথি। আমাদের না ছিল ভগবান—না ছিল কোন মানসী যার গলায় মালা পরাবো। কিন্তু ফুল দিয়ে নিজের হাতে গাঁথা—তাতেই আনন্দ। ততক্ষণে ভোর হয় হয়। মালা গাঁথার সঙ্গিনী দিদিদের সেই সময় কী সুন্দর যে লাগে। রীতিমত অপ্সরী। এই বয়সে নতুন পড়া রামায়ণ মহাভারতের রথ, রানী, সুন্দরী—সবই দেখতে পাই আশেপাশে—আকাশে অবিরাম চলন্ত মেঘের অঙ্গভঙ্গীতে, টগরদি সুষমাদিদের কটাক্ষ, ভ্রূভঙ্গীতে।

এই সময় বড়দার চিঠি কলকাতা থেকে না এলে মা এক একদিন দুপুরে কিছুই খেতো না। সন্ধ্যের দিকে কোন কোনদিন রাস্তার দিকে চেয়ে বসে থাকতো।

যদি বিকেলের ট্রেনে এসে পড়ে। সেই আন্দাজে রান্নাও চাপাতো মা। যদি দৈবাৎ এসে পড়ে বড়দা। হাজার হোক বড় ছেলে তো। আমরা তো ভাই। কিছুকাল অন্তর অন্তর হই। কিন্তু বড়দা যে বড়ছেলে। একবারই হয়। কোন কোনবার মায়ের তাকিয়ে থাকা রাস্তা দিয়ে বড়দা সত্যি সত্যি এসেও পড়তো। সেদিন সন্ধ্যেবেলা আনন্দ আর ধরে না।

একতলা দুই ঘরের বাড়ির সামনে পেছনে টালির ছাদের নিচে বারান্দা। ভেতরে উঠোন। সামনে জঙ্গল। উঠোনের শেষে রান্নাঘর। তাঁর পেছন বাঁশ-বাগান। সে বাগান পেরোলেই কালা আর ফোতোর মাটির ঘর। কালা একজন সহিস। জমিদারবাবুর ডবল ঘোড়ার গাড়ি ধোয়। ছোলা ভেজায়। ঘোড়া দলাইমলাই করে। আর ওর বড়ভাই ফোতো কোচোয়ান। জমিদারবাবুর গাড়ি চালায়। ওদেরই ছোটোবোন ফ্যাকাশি। দাইগিরি করে। মায়ের মুখেই শুনেছি—ফ্যাকাশির খুব পাকা হাত।

আমাদের একটা বোন হল। সাকুল্যে একটাই বোন আমাদের। সেই বোন হামা দিল। হাঁটতে শিখলো। তার পর চোখে কাজল টেনে একদিন ভাই-ফোঁটাও দিল।

ক্যালেন্ডারে ১৯৪০-৪১ সাল এল। চলেও গেল। আমরা বারান্দায় বসে হাতের লেখা লিখছি। সামনে অ্যানুয়াল। সকালবেলা আমরা সবাই বাড়ির সামনের বারান্দায় বসে যেতাম। কোন ভাই কয়লা খাচ্ছে। তখনো বুদ্ধি হয়নি। কোন ভাই বই ছিঁড়ছে। কেউবা অংক কষছি। কেউবা হাতের লেখায় ব্যস্ত। বাবা মাদুরে বসে কোর্টের কাগজ ঠিক করছেন। সামনে দুজন দাড়িওয়ালা মক্কেল গম্ভীর হয়ে বসে। একজন মক্কেলকে বাবা বোধহয় মাঝে মাঝে বলছিলেন, ও হাসিমুদ্দিন ভাই, পান খাবেন?

হাসিমুদ্দিন সাহেব বলছেন, না মতিবাবু, আপনি আগে কাগজ দেখে কাজটা তুলে দেন তো।

এমন সময় ফ্যাকাশি এসে হাজির, ও মইদ্যা—

বাবা চশমার ভেতর দিয়ে বিরক্ত হয়ে তাকালেন, কি?

একটা কথা বলি মইদ্যা। তোমার মাইয়েডা জম্মে হাঁটতি শিখে গেল, আর আমার দাইগিরির পয়সাটা এখনো দিলে না? কেমন লোক বলদিনি তুমি!

দিইনি?

কোথায় দিলে! এখনো তিনডে সিকি পাই—

কিছু তো দিয়েছি।

সাতসিকে দিলে দুবারে। আর তিনডে সিকি পাই।

কাল আসিস। এখন যা—

না মইদ্যা, এখন দাও। র‍্যাশন তোলবো।

সেটা কি জিনিস রে ফ্যাকাশি ?

সেও জানো না। গরমেণ্ট যে দোকানে দোকানে চাল দিচ্ছে। কাপড় দেবে! যুদ্ধুর ছোট ভাইয়ের নাম র‍্যাশন। নাও সিকি তিনডে দিয়ে দাও।

হাসিমুদ্দিন সাহেব নিজের পকেট থেকে তিনটে সিকি ঝনাৎ করে বের করে দিয়ে বললেন, ন্যান্ মতিবাবু, আমাদের কাজটা এবার ভুলে দেন।

আমাদের বাড়ি শহরের ভেতর আলাদা একটা নগরে। এ শহরে দুটো নদী, আটটা হাই স্কুল, দুটো কলেজ, তিনটে পার্ক, রেলস্টেশন, স্টিমারঘাট পাশাপাশি, পঁচিশ ত্রিশখানা দুর্গাপুজো, তিনটে সিনেমাহল—তাছাড়াও একটা নাট্যনিকেতন, গাদাগুচ্ছের লাইব্রেরি, উকিল, ডাক্তার, মুন্সেফ, বাজার, বটতলা, রেলকলোনী—কত কি। কলকাতা মোটে শ'খানেক মাইল। ভদ্রলোক, ছোটলোক, বড়লোক, গরীব লোক, পাগল, বোকা, বোবা, হাবা সবাই সবাইকে চেনে। কালীবাড়ি, দুর্গাবাড়ি, মসজিদ, কাজি, অরবিন্দ আশ্রম, ভারত সেবাশ্রম, রামকৃষ্ণমন্দির, শ্মশান, কবরখানা, গোরস্থান—কোনোটারই অভাব নেই। উপরন্তু যাত্রাপার্টি, বেশ্যালয়, টাউন ক্লাব, সঙ্গীতভবন, পুলিশ লাইন, চাঁদসী, কোর্ট-কাছারি, স্বপ্নাদ্য বিলির সাধু, কাঠগোলা, হেকিম, খেয়াঘাট, হোমিওপ্যাথ, অ্যালোপ্যাথ, কবিরাজ—মায় ওঝা, রোজা—সব সব—কী নেই!

রীতিমত বড় শহর। মিউনিসিপ্যালিটির জলজ্যান্ত চেয়ারম্যান। প্রাইমারি স্কুলের ব্রাহ্ম হেডমাস্টার। কংগ্রেস অফিস। জনযুদ্ধের স্লোগান দিতে দিতে মিছিল বেরোয় বিকেলে। এরকম শহরের ভেতর আবার নগর কিসের ?

নগর মানে একজন লোক জমি কিনে শহরের গায়ে নিজের নামে নগর বসায়। বীরেন্দ্রনগর। তিরিশ-চল্লিশখানা একতলা বাড়ি। তাতে আমরা সবাই ১২-১৪ টাকার মাসকাবারি ভাড়াটে। মাঝে মাঝে পুকুর। খেলার মাঠ। নারকেল বাগান। নগর বানিয়ে বীরেন্দ্রবাবু দোতলা বাড়িতে থাকতো নিজেকে জমিদার ঘোষণা করে। তাকে আমি দেখিনি। তার ছেলেকে দেখেছি। চারুবাবু। তাকেই আমি জমিদার হিসেবে দেখি।

ভুগোলের ক্লাসের গ্লোবে এই বীরেন্দ্রনগর কোনদিন জায়গা পায়নি ঠিকই, কিন্তু আমাদের মনে বীরেন্দ্রনগরকে বলা যায় জীবনরহস্যের হস্তিনাপুর। মহাকাব্যের মাল-মেটিরিয়াল দিয়ে বানানো।

চারুবাবুর ডবল ঘোড়ার গাড়ি দাঁড়িয়ে। কোচোয়ান ফোতো কোচবাক্সে চাবুক হাতে বসে। পেছনের পাদানিতে কালা বা কালো দাঁড়িয়ে। ফোতোদা বলল, জানিস খোকোন, চারু না আমার ছোটো ভাই—

পাদানি থেকে কালোদাও বলল, তোরা জানিসনে ? আমরা তো ভাই হই।

কিছু বলতে পারি না। কিন্তু মনের ভেতর খটকা। জমিদারের ভাই

কোচোয়ান ? সহিস ? মায়ের কাছে জানতে চেয়ে ধমক খেলাম। শেষে ঘোড়া দলাই মলাই করতে করতে নির্জন আস্তাবলে কালোদাই একদিন বলল, আমাদের মায়ের সঙ্গে তো চারুর বাবার বিয়ে হয়নি, তাই। নয়তো বীরেনবাবু আমাদেরও বাবা। এরপরেও তাকিয়ে আছি দেখে কালোদা বলল, মাকে অবিশ্যি বাবা জায়গাজমি দিয়ে গেছে। সেখানেই তো ওই ঘর তুলেছি আমরা।

কর্ণের গল্পেও গাড়ির চাকা আছে। কিন্তু সে গল্পটা অন্যরকম। কোথায় চারুবাবু, আর কোথায় ফোলোদা, কালোদা আর তাদের বিধবা বোন ফ্যাকাশি! ওরাও তো এই জমিদারির কেউ হতে পারতো। তা নয়—ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া আমড়া আর জিওল গাছের উঠোন ঘেঁষা মাটির ঘরে থাকা। সামনেই পানাপুকুর। তাতে সজনে ফুল ঝরে পড়ছে।

জীবনটা দেখছি একটু একটু করে রামায়ণ মহাভারতের সাইড স্টোরি ফলো করে চলছে। বেদনা, আনন্দ—সবই খনিজ অভ্রের মত পরতে পরতে মাখামাখি হয়ে আছে। আনন্দের খোসা তুলতেই বেদনার বীজ বেরিয়ে পড়লো। সে বীজের পরত তুলে ফেললে আবিষ্কারের আকাশ। যুগ যুগ ধরে কোটি কোটি মানুষের জীবন এইভাবেই বয়ে আসছে। এর ভেতরেই নিত্যদিন সূর্য ওঠে ভোরবেলায়। জ্যোৎস্না হাসে সন্ধ্যেরাতে। শ্রাবণের ধারাবর্ষা ফি সনে জানলার কাঠে ব্যাংয়ের ছাতাকে জন্মাতে উৎসাহ দেয়। মানুষের ছেলে হয়। তার নাতি আসে। বংশ-সুখের ভেতর জীবনটা একদিন সবকিছু অসমাপ্ত রেখে অনালোকে পাড়ি দেয়। সে হয়ে যায় তখন স্মৃতি। তার অবয়বকে ঘিরে তখন ফটো, মূর্তি।

ভাগ্যিস এসব চিন্তা তখন মনে আসে না। সেই সময়টাকে বলে বালক বয়স। দিনের আলোও যেন বালক। খুশিতে, আনন্দে, স্বপ্নে, আশাভঙ্গ মাখানো তখনকার মায়ের মুখখানি মনে পড়লে মনে হয়—মাও যেন বালিকা ছিল। এই কঠিন পৃথিবীকে চিনতো না।

জ্যোৎস্নারাতে বড়দার স্কুল-জীবনের বন্ধু এসেছে। ব্রিটিশের জেল থেকে সদ্য ছাড়া পাওয়া। বড়দা কলকাতায় কলেজে পড়ছে। মেসে থাকে। পুত্রবন্ধুকে খেতে বলে মা বড়দার স্বাদ পাচ্ছে খানিকটা। বড়দার বন্ধু অজিতদা বলল, মাসীমা, এবার আপনাকে মুক্তির একখানা গান শোনাবো। বড়ুয়া, কানন, পঙ্কজ, মেনকা, ইন্দু মুখার্জীর কি অভিনয়!

তারপর তো গান চললো। আজ সবার রঙে রঙ মেলাতে হবে—

মা মুগ্ধ হয়ে শুনছে। আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখছি। যাকে বলা যায়, গান দেখছি। জেলখাটা যুবক। গালে দাড়ি। গায়ে বড়ুয়া পাঞ্জাবি। খদ্দরের। বয়সটা যৌবন। মুখে গান্ধীজী। উঠোনে জ্যোৎস্না। তার ভেতর মায়ের লাউমাচা। পোষা ছাগলরা চরে বেড়াচ্ছে। মায়ের কোলে আমাদের ভাই।

মায়ের দু'পাশে আমি আর আমার পরের ভাই। ভেতরের উঠোনে আমাদের কিছু বড় এক ভাই মাদুরে হেরিকেনের সামনে বসে পড়ছে। বাবা তখনো কোর্ট থেকে ফেরেনি। কী সুস্থির, কী শান্ত, কী নিশ্চিন্ত জীবন। শোনা যায়—পৃথিবীর কোথায় যেন যুদ্ধ লেগেছে।

কিছু বড় হয়ে দেখলাম—অনেকে সাঁতার জানে না, সাইকেল চালায়নি। আরও বয়স বাড়লে দেখলাম—অনেকে নদীও দেখেনি। অথচ ম্যাপ আঁকার সময় পরীক্ষার খাতায় এশিয়ার নদীগুলি এংকে বসে আছে। আকাশের চেয়ে সাইজে ছোট এই একটা জিনিস—সব সময় মাটিতে পড়ে থাকে। যাকে লোকে বলে নদী। সেইরকম নদীর পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে আমি আর আমার ছোট ভাই একদিন বহুদূরে চলে গেলাম।

॥ দুই ॥

রেল-ইঞ্জিনের ঘেঁষ ফেলা কালো রাস্তা। সে রাস্তা এক সময় রেল ইয়ার্ড পেরিয়ে শিববাড়িতে চলে এল। নির্জন শিবমন্দির। ডান হাতে নদীর বুকে টাবুরে নৌকো। ছোটভাইকে নিয়ে আরও এগিয়ে যাই। দুপুরবেলার নদী-তীর। দূরে দূরে লণ্ড।

শিববাড়ি পেরোবার পরেই ধানক্ষেত। লাথগঞ্জের ইঁটের পাঁজা। আগুন দিয়ে আর খোলাই হয়নি। এখন বুঝি বাড়ি করার মতলব নিয়ে ইঁট পোড়ানো। রেস্ত ফুরিয়ে যাওয়ায় গেরস্ত আর পাঁজা খোলেনি। শীতের মাঠ। ধান কাটার পর ন্যাড়া। দূরে দূরে কুঁড়েঘর।

আমি আর আমার ভাই একটা বাদাম গাছের নিচে এসে দাঁড়ালাম। সারা চরাচরে একটাও লোক নেই। পাশেই আস্ত একটা নদী। রাস্তা ফুরিয়ে গিয়ে ঘাসের ভেতর হারিয়ে গেছে। উঃ, কি আনন্দ!

আমি আর টোটো—আমার ছোট ভাই—আমরা পৃথিবীর শেষপ্রান্তে এসে পেঁৗছেছি। কিংবা এখান থেকেই পৃথিবীর শুরু। ঠিক এই জায়গাটার কথা কোন ভূগোল বইতে নেই। শুকনো বাদাম পাতায় ঢাকা মাটির নিচেই বুড়ো গাছটার শেকড়।

শিরশিরে বাতাসে আমি আর টোটো লাফাতে লাগলাম। কিসের যেন একটা মুক্তি। কোনো বাধা নেই। নদীর গা ঘেঁষে তীর দিয়ে আমরা দু'ভাই দৌড়োচ্ছি। পায়ের পাতা একদম স্প্রিং। ন'দশ বছর বয়সের শরীর। কোথাও কোন খুঁত নেই। টোটোর বয়স বছর ছয়েক। ঘুমোনোর সময়টা বাদ দিয়ে বাকি সময়টা পৃথিবীর সব কিছু চোখ দিয়ে চাখি। জিভ দিয়ে খাই। ঘুমের ভেতরেও স্বপ্ন দেখতে বোধহয় জেগে কাটাই। স্বপ্ন ফুরোলে ঘুম ভাঙে। তখন

মনে হয়, কি যেন ভুলে গেলাম। কিছুতেই মনে পড়ছে না। তবু আনন্দ। তবু স্ফূর্তি। সকালটা শুরুই হয় এভাবে—যেন কত মজা ঘটবে আজ সারাটা দিন। টোটো আর আমার চলাফেরা তখন এমন—যেন আমাদের মৃত্যু নেই—এই পৃথিবীতে আমরা দু'ভাই অমর।

জায়গাটা এত বিরাট, এতই নির্জন, গাছপালা এখানে এত স্বাধীন, বাতাস পর্যন্ত দেখা যায় এতই ফুরফুরে। টোটোকে বললাম—আয় ল্যাংটা হই—

যদি কেউ দেখে ফেলে!

কে দেখবে? কোন লোক নেই।

তারপর আমি আর টোটো—কোন কারণ নেই—সারাটা মাঠ উদোম হয়ে দৌড়োচ্ছি। আমাদের ছোটবেলারও ছোটবেলা ফিরে পেয়েছি যে। আকাশের নিচে এই জায়গাটায় কি করে যেন কোন মানুষ নেই। গরু নেই। ঘরবাড়ি নেই। শুধু আমরা দুই ভাই। আর স্বাধীনতা।

মাথার ওপর প্যান্ট টুপি করে বসিয়ে নিয়ে টোটো আর আমি নদীর গায়ের জঙ্গল ভেদ করে এগোচ্ছি। বুনো লতা, কাঁটাগাছ, ঘন সবুজ পাতার সব গাছ। খরগোস পালিয়ে গেল। এই জায়গাটাই বোধহয় খালিশপুরের জঙ্গল। শুকনো পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে একসময় আমরা দু'জন সে জঙ্গল বোধহয় ফুরিয়ে ফেললাম। ভেতরকার ঘন অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছিল।

পরে, অনেক পরে হিসেব করে দেখেছি—আমরা দু'ভাই যখন ল্যাংটো হয়ে প্যান্ট মাথায় খালিশপুরের জঙ্গল ভেদ করে এগোচ্ছি—তখন জার্মানরা ইহুদীদের পোড়াবে বলে মালগাড়িতে লাদাই করে পোল্যান্ডের এক রেলস্টেশনে নিয়ে গিয়ে নামাচ্ছে। ছাই ছাই আকাশ থেকে তখন বৃষ্টি হচ্ছিল।

আমি যখন এটা করছি—তখন অন্যরা কি করছে—এটা যাচাই করে দেখা আমার অভ্যেস হয়ে যায় পরে।

যেমন আজ গৌতম ঘোষের 'পার' ছবিটি সমরেশ বসুর 'পাড়ি' গল্পটি নিয়ে তোলা—এ গল্প এক শীতে "পরিচয়ে" বেরিয়েছিল—তখন মীরার সঙ্গে আমার দারুণ প্রেম—বিবাদ—ভালবাসা। এখন 'পার'-এর কথা উঠলেই সমরেশদার শীতকালে বেরোনো 'পাড়ি'—মীরা—আমার ত্রিশের নিচে বয়স—সবই একসঙ্গে মনে পড়ে যায়। মনে পড়ে যায়—এই বহতা অদৃশ্য বাতাসের ভেতর কত মানুষের কলরোল চাপা পড়ে আছে। কত কত সময়কার আলো, ক্ষোভ, আনন্দ, তৃষ্ণা, অতৃপ্তি এই বাতাসের পরতে লুকিয়ে আছে। একটু জঞ্জাল তুললেই সব বেরিয়ে পড়বে।

খালিশপুরের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে একসময় নদী ফুটে উঠল। উঃ, সে কি সিন্! সামনেই ফাঁকায় নদী।

গাদা গাদা সাহেব খালিগায়ে কাজ করছে। নদীর পাড়ে। নদীর মাঝখানে

গাদাবোট। সেখানেও খালিগায়ে সাহেব। বিরাট কাঠের বোর্ডে সাদা করে ইংরেজিতে লেখা—'রুজভেল্ট জেটি'।

টোটো তো অবাক। আমি বললাম, আমেরিকান দেখবি? দ্যাখ। সাদা সাদা আমেরিকান। ওদের ভেতর কয়েকটা লালচে ছিল। বেশ কয়েকটা ছিল একদম কালো। নিগ্রো। নির্জন নদীতীরে এমন পেল্লায় ময়দানবী কাণ্ড তার আগে কখনো দেখিনি।

অনেক পরে ভাকরায় গিয়ে দেখেছি—শতদ্রুর সঙ্গে বিপাশার মিলন ঘটাতে পাহাড় ফাটিয়ে টানেল কাটা হচ্ছে। শুনেছিলাম—ত্রিশ হাজার লোক দশবছর ধরে এই কাজ করে চলেছে। আর দেখেছিলাম রাজস্থানের গঙ্গানগরে খাল কাটা—এখন যার নাম ইন্দিরা ক্যানাল। মরুভূমির ভেতর মাইলের পর মাইল জল নিয়ে যাচ্ছে খাল।

বাবা বিয়ের সময় পেয়েছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধ।

আমরা বালক বয়সে পেলাম দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ।

আমার বড় মেয়ে তার ছেলেকে স্কুল থেকে নিয়ে আসার পর একদিন আমার কাছে জানতে চেয়েছিল, বেহালায় পরমাণু বোমা পড়তে পারে কিনা?

কিছু বলা যায় না। সময় এখন নানাভাবে তার লেজে মোচড় দিচ্ছে। মাইকেল-বঙ্কিম আগাগোড়া রেড়ির তেলে নয়তো হেরিকেনের আলোয় 'মেঘনাদবধ', 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখলেন। আমাদের বাবা আগের শতাব্দীর শেষদিককার বালক। আমাদের এই শতাব্দীর শেষে বুড়ো হবার কথা। তাই মনে হয়—ব্রাহ্মসমাজ রোড কিম্বা ম্যান্টনের মোড়ে একটা পরমাণু বোমার খসে পড়া তো কিছু আশ্চর্য কাণ্ড নয়।

যুদ্ধ তাহলে খালিশপুরের জঙ্গলে এসে পড়ল। ভৈরব নদীর বুকে জাহাজ ভিড়বে। এর আগে আকাশের নিচে আমরা এত বড় কাণ্ড দেখিনি। সারা শহরে খান দুই মোটরগাড়ি, গার্লস্ স্কুলের একখানা মোটে বাস, সারা পাড়ায় একটি মোটে রেডিও, সারা শহরে একটি মোটে রেল স্টেশন— একটিই স্টিমারঘাট আর যুদ্ধ তো সারা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দুর্গাপুজো। রোজই অষ্টমী। রোজই মহানবমী। যদিও সবাই জেনে গেছি—অন্তে ভাসান।

বাবা তখন কমিশন আদালতের জজসাহেবদের 'বেঙ্গলীবাবু'। 'দি মিস্টার এভরিথিং'। মহকুমা কমিশন আদালতের হাজারো ফ্যাচাংয়ের 'মিস্টার সলিউশন'। এখনকার মত সব রাস্তা পিচ্ হয়নি। নাভারণ থেকে সাতক্ষীরের বাস সুরকির লাল রাস্তায় লাল ধুলো উড়িয়ে ফিরছে। ধুলোমাখা চলন্ত একখানা মৌচাক—মানুষের মৌচাক। তাদের সারা গায়ে লাল ধুলোর পাউডার।

আমি আর টোটো মার্কিন নেভির জেটি তৈরির কাজ অনেকক্ষণ ধরে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে বোবা হয়ে গেলাম। নদীর বুকটাকে ওরা খেলার মাঠ বানিয়ে

কাঠের পাটাতন ভাসাচ্ছে। নদীর তলপেটে পাতাল খুঁড়ে সিমেন্টের বিম ঢালাই চলছে। জিপ গাড়ি নামে যেন খুদেমত একটা ছুটন্ত চালাঘর এদিক সেদিক তীরবেগে ছুটে যাচ্ছে ডাঙায়—ফিরে আসছে। এই তুলনায় আমরা মা-বাবার সঙ্গে থাকি তো একটা দেশলাই বাক্সে। ছাদ ফুটো। বর্ষায় জল পড়ে। বারান্দার টালি উড়ে গেলে তা আর বদলানো হয় না। উঠোনভর্তি ছাগল, ঢেঁড়স গাছ, লাউমাচা। বছর বছর ভাই হয় আমাদের। রোদ উঠলে মুতের কাঁথা শুকোতে দেয় মা। জানলার কাঠে উই ধরে আছে। হেরিকেন ধরালে শীতের সন্ধ্যায় অন্ধকার আরও ঘোলাটে হয়ে যায়।

যাকে বলে বাক্‌রুদ্ধ দশা দুই ভাইয়ের।

তখন কি জানি—সেই সময় থেকে বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশ বছর পরে ওই খালিশপুরেই যাবো! সেখানে সরকারী হাউসিং এস্টেট। তার এক ফ্ল্যাটে আবু ইসহাকের সঙ্গে চায়ের টেবিলে বসে গল্প করবো। সে 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' উপন্যাসের লেখক। যে উপন্যাস নিয়ে ওপারের গর্ব করার মত বিখ্যাত ছায়াছবি। ইসহাক পেশায় সরকারী নিরাপত্তা বাহিনীর কর্তা। চা খাচ্ছিলাম—আর ভাবছিলাম—কোথায় সেই খালিশপুরের জঙ্গল! বাইরে তখন সন্ধ্যেরাতের অন্ধকার। পরদিন ভোরবেলা রুজভেল্ট জেটির খোঁজে বেরিয়ে দেখা পেলাম—এক পরিত্যক্ত, জীর্ণদশা নদী-পাটাতনের। কোথায় গেল হাজার হাজার খালি-গা মার্কিন নৌসেনা—তাদের পরিশ্রম—ঘাম—জেদ—প্রাণশক্তি। সব ভোঁ ভোঁ। শুনশান। তবে দেখলাম নদীটা একদম রোগা হয়ে গেছে। কিংবা হয়তো আমাদের ছোটবেলার চোখ নদীটাকে বড় দেখেছিলাম। আসলে জীবনের ভোরবেলায় সবই বড় লাগে। বিশেষ করে নদী, পাহাড়, রাস্তা, মাঠ, মেঘ, বন্ধুত্ব, বীরত্ব, ঘৃণা—সব—সব।

নদীটাকে রুগ্ন দেখে সেবারই ঢাকায় গিয়ে পাঁচতারা সোনার গাঁ হোটেলে উঠে ডলির সঙ্গে আলাপ হল। ছিপছিপে হিরোইন। 'সূর্য-দীঘল বাড়ি' ফিল্মের নায়িকা। একথা সেকথার পর আমরা ওর বাড়িতে গেলাম। ওর স্বামী আফ্রিকায় ছবি তুলতে গেছে। প্রায় সারা রাত গল্প করে—গান শুনে যখন ভোর ভোর চলে আসছি—ডলি ঝুলবারান্দার টব থেকে আমায় একটা গোলাপ ছিঁড়ে দিল। রাস্তায় বেরিয়ে বটু (বিখ্যাত লেখক এবং পাগল প্রেমিক) বলল, ডলির মা তো নীলিমা ইব্রাহিম।

নীলিমাদি? ওঁর সঙ্গে তো আমি শেষরাতে বকুল ফুল কুড়িয়েছি। মালা গেঁথেছি! বুনো লতা দিয়ে।

মনুদি, টগরদি, নীলিমাদি ফুল কুড়োতে যাবার সময় আমায় সঙ্গে নিত। টোটোকে নিত না। টোটো তখন খুব ছোট ছিল। প্রফুল্লবাবুর মেয়ে কিংবা তাঁর ভাইয়ের মেয়ে নীলিমাদি। রেডিওলজিস্ট ইব্রাহিমদাকে বিয়ে করেছিলেন।

বটু বলল, চিনতেন ?

চিনবো কি ! তাঁর মেয়ে ? আগে বলবে তো ! আগে বলতে হয় !

মুখে কোন কথা নেই। আমি আর টোটো লাল সুরকির রাস্তা দিয়ে ফিরছি। এমন সময় দেখি লাল ধুলোমাখা বাস সাতক্ষীরে থেকে ফিরছে। লেভেলক্রসিং বন্ধ। বাসটা এক ঝাঁকড়া শিরিষ গাছের নিচে পথ না পেয়ে দাঁড়িয়ে।

বাসের ছাদে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বাঁধা হাতলওয়ালা দু'খানা চেয়ারে দু'জন বসে। একজন আমাদের বাবা—জজসাহেবের বেঙ্গলীবাবু—দি মিস্টার এভরিথিং—কমিশন আদালতের মিস্টার সলিউশন—চ্যাম্পিয়ন ম্যানেজার—অলিম্পিক ঘুষখোর ! গালের ভুলভুলে সাদা দাড়ি ধুলোয় তখন লালচে। পরে বয়স বাড়তেই বাবার গায়ে এই অ্যাডজেকটিভগুলো জুড়েছি। যখন তিনি থেমে পড়া বাসের ছাদে শক্ত করে বাঁধা হাতলচেয়ারে বসে, তখন এসব বিশেষণ মনেও আসে নি। তখন বাবার পাশে আরেকখানা ওরকম ভাবে বাঁধা চেয়ারে জেলা স্কুলের মৌলবী সাহেব বসে। গলাবন্ধ সেরওয়ানী। বুক অব্দি কাঁচাপাকা দাড়ি। পাজামার নিচে 'সু-জুতো'। মাথায় ফেজ। ফেজের আবার লটকানো লেজ—টুকরোমতন।

ভেতরে জায়গা হয়নি বলে বিশিষ্ট যাত্রীর জন্যে বাসের ছাদে এই বিশেষ ব্যবস্থা। যেন গেস্ট যাত্রী। এখন দেখলে কেউ বলবে—কোন অভিযাত্রীর জয়রাইড্। তখন কিন্তু বাবা চলন্ত বাসের ছাদে চেয়ারে বাবু হয়ে বসে পঞ্চাশ ষাট মাইল রাস্তা হাওয়ার ঝাপটা খেতে খেতে এসেছেন। মাথার ওপর অবাধ্য গাছের ডাল পড়লে দক্ষ প্যাসেঞ্জার হিসেবে সময়মত মাথা নিচু করেছেন—নয়তো অ্যাকসিডেন্ট। ট্রেসপাসার বাঁশঝাড়ের দড়ো কঞ্চির খোঁচা থেকে ছুটন্ত বাসে বসে চোখ বাঁচিয়েছেন।

এই সময় তাঁর পায়ের কাছে ছেলেমেয়েদের জন্যে আনা একডালা ক্ষীরের গজা আর একজোড়া সাতক্ষীরের ওল। তাদেরও দড়ি দিয়ে সাপটে বাঁধা। পাছে গড়িয়ে পড়ে যায়।

আমি আর টোটো বাসের পেছনের লোহার সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে গজার ডালা, ওলের জোড় নামিয়ে ফেললাম। বাবা বলল, রিক্সা করে বাড়ি চলে যা তোরা। আমি পরে যাচ্ছি।

ক্লাসিকাল গানের আগে ক্লাসিকাল বাবার সঙ্গে ছোটবেলার সত্যযুগের রাস্তায় আমাদের এইভাবে দেখা। আমরা সংখ্যায় বেশি বলে বাবা আমাদের স্নেহ দিতে পারতেন না—কোর্টের কাজের চাপে মনোযোগ দিতে পারতেন না। তাই খাওয়া দিয়ে এইভাবে আমাদের পুষিয়ে দিতেন। এইটেই ছিল তাঁর বাবা-ত্ব।

আমরা এখনো বলতে পারি না—আমাদের বাবা কালো ছিলেন, না ফরসা ছিলেন ? আমাদের তো মনে হয়—আমাদের বাবা বাদামী ছিলেন। গম আর পাকা ধানের রং দিয়ে বাবার গায়ের চামড়া রং করা ছিল। কিন্তু কেওড়াতলায়

ইলেকট্রিক চুল্লোর পেছনে সিঁড়ি দিয়ে নেমে—নিচে তাঁর যেটুকু কালেক্ট্ করলাম—তাতে ধুনুচির পোড়া কালো ছাইয়ের চেয়ে বেশি কিছু লাগলো না। তবে কি বাবা কালো ছিলেন ?

অথচ শীতে বাবা তেল মাখতে বসলে বাবাকে কোনদিন কালো লাগেনি। যেন বাদামী বাদামী। পিঠে, পেটে ফুট ফুট লাল তিল। মুসুরির ডালের বড় দানার মত। সেই তিলগুলো এখন আমার পিঠে, পেটে ফিরে এসেছে। ওগুলো-কে বাবার গায়ে দেখেছিলাম চল্লিশ-পয়ঁতাল্লিশ বছর আগে। আমি তাঁর চেয়ে চল্লিশ বছরের ছোট !

খালিশপুরের সরকারী কোয়ার্টারে আবু ইসহাকের সঙ্গে চা খেয়ে শহরে গিয়েছি। যে বাড়িটায় বাবা এসে মাকে নিয়ে সংসার পেতেছিলেন—যেখানে আমরা ভাইয়েরা জন্মাতাম—হতাম—সেই বাড়িটা দেখতে।

বাড়িটা কেমন আছে ? কেমন হয়েছে ?

গিয়ে দেখি বাড়িটাই নেই। সেখানে অন্য একটা বাড়ি। আগের বাড়ি ভেঙে—নতুন করে তৈরি হয়েছে। কোন নতুন বাসিন্দার কয়েকটি ছেলেমেয়ে—আমাদের আগেকার বয়সের—বারান্দায় তুমুল খেলছে—আমাদেরই মত—আমরা যেমন খেলতাম।

খেলুড়ে একজনকে বললাম—এখানে একটা বাড়ি ছিল !

ভাইবোনদের খেলা থেমে গেল। একজন বলল, এখানে ? এখানে তো এই বাড়িটাই আমার আব্বা ভাড়া নিয়েছেন। অন্য কোন বাড়ি তো আমরা দেখিনি।

মানে—এখানে আর একটা বাড়ি ছিল কি না ?

আরেকটা বাড়ি ? কই ? আমরা তো দেখিনি !

খেলা থামিয়ে ওদেরই আরেক ভাই (ভাই-ই হবে) এগিয়ে এল। এই বাড়ির আগে আরেকটা বাড়ি ? তা কি করে হয় ! বাড়ি হওয়ার আগে এখানে তো সমুদ্র ছিল।

বুঝলাম, বলে কোন লাভ নেই। নিশ্চয় স্কুলে প্রাকৃতিক ভূগোল পড়ছে। সেসব বই এইভাবেই শুরু হয়—এই ভূখণ্ড একদা সমুদ্রগর্ভে ছিল। ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিলে কালক্রমে তাহা মনুষ্য-বসতিতে পরিণত হয়।

আমরা যে এখানে একসময় ছিলাম—ছেলেটি নিশ্চয় তা ভাবতে পারে নি। ওর বিশ্বাসমত ওদের আগেকার সবই প্রাগৈতিহাসিক। আমরা 'ছিলাম'-এর চেয়ে আমি 'আছি' যে অনেক জোরালো।

ডানপাশের বাড়িটায় গেলাম। আগের মতই আছে। অবিকল আমাদের হারানো বাড়ি। সেই সামনে বারান্দা, মাথায় টালির ছাদ। বারান্দার গায়ে ক্লাসঘরের মত পাশাপাশি দুখানা ঘর। মাঝখান দিয়ে সরু ফালি পেরোলে

ভেতরে আরেকখানা টানা বারান্দা। তার মাথাতেও টালি। ভেতরে উঠোন। উঠোনের কোণে পাতকুয়ো। একদিকে রান্নাঘর।

এ বাড়িতে থাকতেন সুষমাদির বাবা চাঁদসী চিকিৎসক ডাঃ যজ্ঞেশ্বর রায়। তাঁর ছেলেমেয়েরা আর ভাইয়ের ফ্যামিলি। ভাইকে ডাকতাম মেজো ডাক্তার। তিনি ছিলেন দাদার কম্পাউণ্ডার। সাপ আঁকা সাইনবোর্ডের নিচে ছিল ডাক্তারখানা। বিনা অস্ত্রে চাঁদসীর চিকিৎসা। সেই সাইনবোর্ড নেই। কেউ নেই। আছেন শুধু মেজো ডাক্তারের বৃদ্ধা বিধবা—আর তাঁর ছেলের বউরা --ছেলেরা নদীর ঘাটে দোকান করে।

পরিচয় দিতে বৃদ্ধা কেঁদে ফেললেন। বললেন, কিছু খেয়ে যাও।

খিদে নেই। বলে জানতে চাইলাম, ওই নয় মাস কোথায় ছিলেন?

তোমাদের মেজো ডাক্তার তো দেশ ছাড়েননি। বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন। ওই নয় মাস আমরা জঙ্গলে জঙ্গলে কাটাই। তখন পা ফুলে গিয়ে অচল হয়ে পড়েন। ওঁকে আমরা জঙ্গলে ফেলে আসি। কিছু খেয়ে যাও বাবা।

খেতে পারলাম না। এই মেজো খুড়ি বিয়ে হয়ে এসে অনেকদিন নিঃসন্তান ছিলেন। পুরনো শাড়ির রঙীন সুতো খুলে নিয়ে আমার মাথার বালিশের ওয়াড়ে ফুল তুলে দিয়েছিলেন। আমায় খুব ভালবাসতেন। আমার সব আবদার সইতেন। বর্ষায় তখন চারদিক ভেসে যেতো—তবু চারদিকে যখন সারাদিন ধরে ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়েই চলেছে—তখন এই মেজো খুড়ি আমার জন্যে গরম ডালের বড়া ভেজে পাঠিয়ে দিতেন।

একবার এমন এক অজায়গায় ফোঁড়া হয়েছিল—লোকের সামনে বেরোতে পারি না। ডাঃ যজ্ঞেশ্বর রায় খোলা বারান্দায় শুইয়ে দিয়ে ভাল করে ক্ষুরে ধার দিলেন রসিয়ে রসিয়ে—আমারই চোখের সামনে—বারান্দার কোণাতে। তারপর সেই ক্ষুর শোধন হল আগুনে পুড়িয়ে।

আমায় ধরে বেঁধে অস্ত্রোপচার হল। অথচ সাইনবোর্ডে লেখা থাকতো বিনা অস্ত্রে চিকিৎসা। সুষমাদি বলল, চেঁচাস না। সেরে গেলে আরাম পাবি। মনোরঞ্জনদা ঘটিতে করে গরমজল করছিল। ফোঁড়া কাটার পর সেই গরম জলে তুলো ডুবিয়ে সেঁক। এরপরে আর ফোঁড়া থাকে!

খুব ব্যথা পেয়েছিলাম। কোন গরুও এত কষ্ট পায় না অপারেশনে। তাই মনে হয়েছে পরে।

মনোরঞ্জনদা ছিল ডাঃ যজ্ঞেশ্বর রায়ের অপারেশনে মেল অ্যাটেন্ডান্ট। আসলে মনোরঞ্জন মল্লিক নদীর ওপার থেকে শহরে পড়তে আসা এক নিরুপায় যুবক। প্রতি বছর আই. এ. পরীক্ষা দিয়ে ফেল করতো। ফেল করার পরদিন থেকে নবোদ্যমে মনোরঞ্জনদা নোট বই মুখস্থ করতে শুরু করে দিত গুনগুন করে। সকাল থেকে বেলা বারোটা অব্দি। বেলা তিনটে থেকে পাঁচটা। আবার

সন্ধ্যেরাত থেকে গভীর রাত অব্দি। সেই একই গুনগুন, দুলে দুলে। ঢুলে ঢুলে। ঘুম চোখে।

দুপুরবেলা ছিট-কাপড়ওয়ালা গজকাঠি দিয়ে মেপে মেপে মার্কিন কাপড়, ব্লাউজের কাপড়—এইসব বিক্রি করছে। সুষমাদিদের বারান্দায়। গাঁঠরি বেঁধে ওঠার সময় কাপড়ওয়ালা বলল, একটা ব্লাউজ পিস যে পাচ্ছি না!

সুষমাদি বলল, আমরা তো নিইনি।

মনোরঞ্জনদা বলল, ভাল করে দ্যাখো—তোমার কাছেই আছে।

আর অন্যসব বাড়ির মেয়ে-মাসীরাও ছিল সেখানে। তারাও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। ভাল করে দ্যাখো ভাই। ছিট-কাপড়ওয়ালা পট করে মনোরঞ্জনদার শার্ট তুলে কোমরে গুঁজে রাখা ব্লাউজ পিসটা বের করল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যসব বাড়ির মেয়ে-মাসীরাও ছুটে পালিয়ে গেল। ছিট-কাপড়ওয়ালা সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাবার সময় বলল, আমরা এক নজরেই লোক চিনি।

সুষমাদি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল, তুমি চুরি করেছিলে?

মনোরঞ্জনদা মাথা নিচু করে মিনমিন করে বলল—তোমায় দেবো বলে।

বছর বছর ফেল করা! তার সঙ্গে আবার এই চুরি? দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি। বাবা আসুক—

রাতে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ার পর পাশের বাড়িতে একটা ধস্তাধস্তির আওয়াজ শুনেছিলাম। চিৎকার। কথা-কাটাকাটি। মারধোর। দৌড়োদৌড়ি।

ডাঃ যজ্ঞেশ্বর রায়ের বারান্দার একটা কোণে, চ্যাটাইয়ে আড়াল করা জায়গায় মনোরঞ্জনদা থাকতো। কেরোসিন কাঠের টেবিল, কেরোসিন কাঠের খাট, কেরোসিন কাঠের বুকর্যাক আর গামছা বুনুনীর মশারি—এই নিয়ে ছিল মনোরঞ্জনদা—ভোরে উঠে দেখি মনোরঞ্জনদা নেই।

আমরা কাঁচপোকা ধরে দিলে তার টিপ পরতো সুষমাদি। সেই টিপ পরে সুষমাদি একদিন বিকেলে কয়েকজন ভদ্রলোকের সামনে আসন করে বসলো। তারপর ঘোর বর্ষার ভেতর হরলালদা এসে তাকে বিয়ে করে নিয়ে চলে গেল। জামাইষষ্ঠীতে সুষমাদিকে নিয়ে হরলালদা এল। হাফপ্যান্ট। লাল কেডসের ভেতর খাকিরংয়ের গরম মোজা। গায়ের হাফশার্ট প্যান্টের ভেতর গোঁজা।

পয়লা জামাইষষ্ঠীতে এসে সুষমাদি বাড়ির সামনের বারান্দায় মাদুর পেতে বসলো। আমি, টৌটৌ আরও অনেকে ঘিরে বসেছি। পাশেই একটা চেয়ারে হরলালদা পা ক্রস করে বসলো। সুষমাদি হারমোনিয়াম বেলো করে গাইতে লাগলো—

> শেফালী তোমার আঁচলখানি
> বিছাও শারদ প্রাতে—এ—এ

ভাবতেও পারিনি কোনদিন এ-গান যাঁর লেখা—এ-গান যাঁর সুরে সেদিনকার

সারা বাঙলাদেশকে মাৎ করে দিয়েছিল সেই হীরেন বসুর সঙ্গে প্রায় চল্লিশ বছর পরে দেখা হবে—তিনি হারমোনিয়াম বাজিয়ে গেয়ে শোনাবেন গানখানি। আগে যে কত সাহসী—বড় করে কল্পনা করার মানুষ ছিলেন। হীরেন বসু কলকাতায় সিনেমার পরিচালক ছিলেন। ছবি করতে বোম্বাই গিয়েছিলেন। আফ্রিকাতেও। সুর তো দিতেনই। নিজেরই লেখা গানে।

নতুন জামাইয়ের সান্ধ্য-জলখাবারের সঙ্গে আমরাও লুচি বেগুনভাজা পেলাম। গানের পর হরলালদা বাঘের গল্প বলল। সুন্দরবনে রেঞ্জার হরলালদা। তার এলাকায় বাঘ আছে মোট সাতটা। হরলালদাকে নিয়ে বনবিভাগের মোট পাঁচজন লোক সেখানে। বাঘেদের কোন অস্ত্র নেই। স্রেফ দাঁত আর নখ সম্বল। হরলালদা-দের কোন অস্ত্র নেই। স্রেফ লাঠি সম্বল। আর পায়ে কেডস।

হরলালদা বলেছিল—তাই বাঘগুলোকে আমরা নজরে নজরে রাখি। জানি—আমাদের দেখে ওদের খুব লোভ হয়! ওরাও আমাদের নজরে রাখে।

আমাদের এই নিস্তরঙ্গ, প্রশান্ত জীবনে—গাছের ডাবগুলো পেকে ঝুনো নারকেল হচ্ছিল। মাটির নিচে ওল, আলু, কচু সাইজে বাড়ছিল। পাখিগুলো আকাশ চিরে দিয়ে উড়ে যায়। জলের নিচের মাছগুলো ডুবে থাকার আনন্দে দিঘির বুকে ঘাই মারে। ভোরে ঘুম ভেঙে জাগলেই আমার আর টোটোর বয়স একদিন করে বেড়ে যায়।

জমাইষষ্ঠী যায়। বর্ষা যায়। শীত আসে -যায়। এর ভেতর কখন আম গাছে বউল এসে গেল। আর ক'দিনের ভেতর গাছে গাছে পাখি আসবে। আমি আর টোটো যখন মেঠো শুকনো রাস্তা ধরে শহরের শেষে নতুন নতুন জায়গা—ময়লাপোতা, বেনেখামার, গোবরচাকা আবিষ্কার করি—তখন সন্দেহ হয় এসব জায়গা 'ভারত ও ভূমণ্ডলে' আছে তো? কোন ভূগোলে কোনদিন ডাকতে ডাকতে হাঁফিয়ে পড়া কোন পাখির নাম পাইনি। পাইনি লাল সুরকির রাস্তার দু'ধারের শীতভোর ফুটে থাকা শেয়ালকাঁটার হলুদ ফুল।

বছরে মাসখানেক ছুটি জমিয়ে বাবা আদায়ে বেরিয়ে গেল। এই শীতের মাঝামাঝি কাদের কাছ থেকে বাবা ফসল আদায় করতেন জানতাম না তখন।

বিয়ে করে ঠাকুরদা ঠাকুরমাকে পেয়েছিলেন। পেয়েছিলেন যাত্রাপার্টি করার নিশ্চিন্ত ছুটি। আর পেয়েছিলেন জায়গাজমি। পৃথিবীর ম্যাপের নানা প্রান্তে। তিনটে নদী, দু'টো জলা পার করে দিয়ে বঙ্গোপসাগরের পাড়ে বাবা তাঁর বাবার পাওয়া জমির ফসল আদায়ে যেতেন।

সময়মত ফেরা হত না বাবার। এদিকে তেল ফুরিয়েছে। মুসুরির ডাল নেই। হলুদ নেই। চাল বাড়ন্ত। মায়ের কথামত আমি আর টোটো রোজ সকালে নদীর ঘাটে যাই। যদি বাবা আসে। সারি সারি পাটের নৌকো। মাগুরা যাবার

লঞ্চ ছাড়লো। টাবুরে নৌকোগুলো পুঁটিমাছের মত চলে ফিরে বেড়ায়। কোথায় বাবা!

বজরা নৌকোগুলো চোখে খুঁজি। যদি বাবা থাকে। যদি রাতে এসে ঘাটে ভিড়ে ভোরের জন্যে অপেক্ষা করে থাকেন। কোথায়! প্রায় বজরাতেই কেউ না কেউ নমাজ পড়তে বসেছে। বিসমিল্লাহির রহমানে রাহিম। মালেকে ইয়াও মেদ্দিন।

না, বাবা আসে নি।

অতএব পাঁচআনা সেরে তিন বছরের বাঁধানো 'প্রবাসী' মুদিখানায় চলে গেল। নিয়ে এলাম হলুদ, সর্ষের তেল, মুসুরির ডাল।

অনুকূল মিত্তির উকিল। তার বড় ছেলে হরিদার মুদিখানা। আমরা বাঁধানো বচ্ছরকার 'প্রবাসী', 'ভারতবর্ষ' দিয়ে যাই—আর নিয়ে আসি তালমিছরি, বাংলাগোলা, রাঙাজবা, জাভার বড়দানা চিনি। হরিদা দাঁড়িপাল্লার কাঁটার দিকে চোখ রেখে বলে, আজও তোদের বাবা ফিরলো না! কোন বিপদ-আপদ হলো না তো?

বিপদ কাকে বলে জানতাম না। আপদ কথাটার মানে কি, তাই-ই জানতাম না। দু'ভাই তাকিয়ে আছি দেখে হরিদা বলল, এই ধর নৌকোডুবি—বলা তো যায় না—ওদিকক্কার নদীগুলোর আবার স্বভাব ভাল না!

হরিদার কথা আমরা গায়ে মাখিনি কোনদিন। মায়ের মুখে শুনেছি—একসময় নাকি বড়দার সঙ্গে পড়তো। পরীক্ষা দিয়ে এসে মাকেই বলতো— ঝুনুর পরীক্ষা তো ভাল হয়নি মাসীমা! দেখলাম বই খুলে টুকছে—

কেন? কোশ্চেন কঠিন হয়েছে নাকি?

না, খুব সোজা। আমি তো সব রাইট করে এলাম মাসীমা। একথা বলে মায়ের মুখ গম্ভীর দেখে হরিদা এরপর নাকি হেসে বলেছিল—না টুকে উপায় কি বলেন ঝুনুর! সারা বছর তো কিছু পড়ে নি!

রেজাল্ট বেরুলো। হরিদার প্রোগ্রেস রিপোর্টের নম্বরের ঘরে পাঁচটা গোল্লা। আর কয়েকটি ঘরে পাঁচ, সাত, নয়—এই সব নম্বর।

হরিদা বলে বেড়াতে লাগলো পারসিয়ালিটি! ঘোর পারসিয়ালিটি! স্যারেদের বাকি দিতে রাজি হইনি দোকানে—তাই তো আজ আমার এই দশা!

হরিদার বোনেরা কিন্তু পড়াশুনোয় ভাল ছিল। একবোনের নাম নাদু। নাদুদির সঙ্গে পাকা তেঁতুল, গুড়, সর্ষের তেল, লেবুপাতা আর কাঁচালংকা দিয়ে মেখে খেয়েছি। অপূর্ব তেঁতুল মাখা। দু'একসময় নাদুদির মেজোবোন চিনিদিকেও এই চটকে মাখা তেঁতুলের ভাগ দিয়েছি। চিনিদি ছিলেন খুব লম্বা। ছিপছিপে। ইন্সট্রুমেন্ট বক্স নিয়ে জ্যামিতি পড়তে যেতেন। ফনফনে চেহারা। বিকেলবেলা চাটুজ্যেদের বাগানের ভেতর দিয়ে অন্ধকারে—ঘাসে মুছে আসা পায়ে চলা পথে শর্ট-কার্ট করে বাড়ি ফিরতেন। মাথার ওপর চালতে গাছের মগডালে

তখন সাদা ফুল না বক—বোঝা যায় না—ঢলে পড়া সূর্যের আলোয় তখন লালচে। কয়েক বছর আগে নিউ থিয়েটার্স এক নম্বরে বীরেশ্বর সরকারের 'মাদার' ছবির কি একটা জয়ন্তী হচ্ছিল—কলাকুশলীরা কাননদেবীর হাত থেকে পুরস্কার নিচ্ছেন। মাইকে কি যেন বললাম খানিকক্ষণ।

তারপর চেয়ারে বসে দেখি—পাশেই ব্যস্ত নায়িকা মহুয়া বসে। আলাপ হল। কথায় কথায় বেরুলো—আশ্চর্যভাবেই বেরুলো—ও চিনিদির মেয়ে।

তাহলে তুমি নাদুদিকে চেনো নিশ্চয় ?

বাঃ, আমার মাসী! এখন রায়পুরে থাকে—তিন ছেলে—বড়টা তো ডাক্তার।

আমরা কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও আছি। নেই শুধু মহুয়া।

অবশেষে বাবার বজরা এসে ভিড়লো। গালে সাদা ভুলভুলে দাড়ি। প্রথমেই বাবার দুই খাস প্রজা—হাসিমুদ্দিন শেখ আর দবিরুদ্দিন খাঁ বজরা থেকে নেমে স্প্রিংয়ের মতই ডাঙায় উঠে এল। তাদের কাঁধে একটি করে খাসি। ঘাড়ের ওপর পেট ঠেসে বসানো একটি করে। তাদের একজোড়া করে পা এক হাতে টেনে ধরা। ডাঙায় নামতেই আমি আর টোটো তাদের ব্যা ব্যা অগ্রাহ্য করে রিক্সায় বসিয়ে সিধে বাড়ি। আমাদের দু'ভাইকে এ অবস্থায় দেখে সারা শহর জানলো—আমাদের বাবা আদায় থেকে ফিরলো।

তারপর ছ'সাতখানা রিক্সা করে নদীর ঘাট টু আমাদের বাড়ি সারাদিন ফেরি সার্ভিস চালু হল। গুড়ের কলসী, মুসুরির ডালের বস্তা, কই মাছ ভর্তি টিন, সর্ষের তেল বোঝাই জালা আর বস্তা বস্তা ধান। সবশেষে ছ'সাত রিক্সা বোঝাই দিয়ে কচ্ছপ, কালিকাঠা এল। আর এল বড় দাঁড়ার কাঁকড়া। শ'তিনেক ডিম। এর নাম আদায়।

মা জিনিস গোছাতে গোছাতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে। একবার উঠোন—একবার বারান্দা। লেবারার আমরা কয়েক ভাই। শেষের কয়েকটা ভাইয়ের তখনো নাম ঠিক হয়নি। ভীষণ ছোট। আদর্শলিপি আর হাসিখুশির পাতা তারা ছিঁড়ে ফেলে—খায়। তারাও সারাদিন আনস্কিল্‌ড্ লেবারারের মতই খাটলো। একটা তখনো বিছানায় মোতে। সারাদিন শেষে সেটা বারান্দায় ল্যাংটো হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। আমি আর টোটো তখন সদ্য আনা নারকেল ফাটিয়ে ভেতরের ফোঁপরা খাচ্ছি।

মা বলল, চিনি দিয়ে খা—ওরে চিনি দিয়ে খা—নয়তো পেট ফাঁপবে!

তখন আমাদের আরেকটা নাম-না-হওয়া ভাই—একটু ডাগর—ফাটানো ঝুনো নারকেলের জল বাটির পর বাটি খেয়ে চলেছে। তার নাকে পোঁটা। মা এক চড় কষিয়ে তার নাক ঝাড়ালো—আর প্রায় চোখ মুছতে মুছতে বলল, তোদের বাবা যদি আর ক'টা দিন আগে ফিরতো তাহলে সাত-সাতটা বছরের 'প্রবাসী' হরির

দোকানে পাঠাতে হোত না—

এই 'প্রবাসী' কেনার সময় হরিদা বলেছিল, যে বইতে সাধনা বোসের ছবি আছে—সিম্‌কির ছবি—উদয়শংকরের সিম্‌কির ছবি আছে—পাস কিনা খুঁজে খুঁজে দেখবি—পেলে সেরে দু'পয়সা বেশি পাবি।

এরই ভেতর রান্না করে মা হাসিমুদ্দিন ভাই, দবিরুদ্দিন ভাইকে খেতে দিয়েছে। সন্ধ্যে হয়-হয়। হেরিকেনের আলোয় ভাত ভাঙতে ভাঙতে দবিরুদ্দিন ভাই বলছে—ঠাইরেন, হলুদটা কম দেছেন মাছে।

তাই নাকি ?—বলেই মা উঠোনটা ছুটে পেরিয়ে রান্নাঘরে ঢুকলো। আমার ওপরের ভাই তনুদা, তার পরনের হাফপ্যান্ট আমি পরলে বুক অব্দি উঠে আসে— লম্বা লম্বা পায়ে ঘন চুল—সাদা ঝকঝকে দাঁত—সবরিকলার খোসা, এমন গায়ের রং—নতুন শেখা বিদ্যায় তখন কড়াইয়ে জল চাপিয়ে দিয়ে একটা করে ডিম ফাটাচ্ছে আর জলে ছেড়ে দিচ্ছে। দিয়েই বড় চামচে তুলে কপ্‌ করে খেয়ে ফেলছে।

মা গিয়ে তনুদার হাতের বড় চানচ কেড়ে নিল। ওরে তনু, একটু নুন দিয়ে খা—নুন দিয়ে খা—ঘিন্নাও করে না তোর ?

এতগুলো বছরের পাহাড় ডিঙিয়ে এখনো চোখ বুজলে মায়ের গলা শুনতে পাই—

ওরে চিনি দিয়ে খা—চিনি দিয়ে খা—নয়তো পেট ফাঁপবে।

একটু নুন দিয়ে খা—নুন দিয়ে খা—ঘিন্নাও করে না তোর ?

তনুদা সেই আমলে ওয়াটার পোচ বানানো শিখে, খাওয়ার সুখে না বানানোর আনন্দে অমন কপাকপ ডিম খাচ্ছিল—তা বলতে পারবো না। তবে অনেক বছর পরে প্যাসিফিকের সামনে সান ফ্রান্‌সিস্‌কোর ঊনপঞ্চাশ নম্বর পায়ারে এক রেস্তোরাঁয় বসে অমন করেই খেয়েছিলাম—অয়েস্টার। কপাকপ—ওইভাবেই খেতে হয়—ঝিনুকের ঠোঁট চেপে ফাঁক করে ভেতরের মেটুলি মত গন্ধ-গন্ধ জিনিসটা—অনেকটা ডাবের শাঁসের মত। ডেভিড কপারফিল্ড ছবিতে মিসেস পেগোটির বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে ডেভিড সম্ভবত জেলেপাড়ায় আগনেসকে ওভাবেই অয়েস্টার খেতে দেখেছিল। আগনেস ? না ডোরা ? ঠিক মনে করতে পারছি না।

কুয়োতলায় চান করতে করতে বাবা তখন কোশ্চেনের পর কোশ্চেন ফায়ার করে যাচ্ছেন।

ঝুনু চিঠি লিখেছে ?

মা বলল, হুঁ। জবাব দিয়েছি।

হরিণের বাচ্চা হবার কথা ছিল—

দুটো পাঁঠি একটা পাঁঠা হয়েছে।

তনুর একজোড়া হাফপ্যান্ট কিনেছো ?

ওই টাকায় হয়নি। একটা হাফপ্যান্ট —আর একজোড়া ইজের হলো।

হাসিমুদ্দিন ভাই আর দবিরুদ্দিন ভাই তখনো হেরিকেনের আলোয় খেয়ে চলেছে। মা ঠাইরেন, আর একটু ডাইল দ্যান।

ভাত?

দ্যান! আপত্তি কিসের?

পরে 'ক্যুয়ো ভেদিস' ছবিতে দবিরুদ্দিন ভাইকে দেখি। একটা ষাঁড়ের ঘাড় ভেঙে দিচ্ছে। দবিরুদ্দিনের পরনে তখন রোমান দাসের পোশাক। খালি-গা। পায়ে চামড়ার স্ট্র্যাপ। হাসিমুদ্দিন ভাইকে পেয়েছিলাম স্পার্টাকাস উপন্যাসে। গ্ল্যাডিয়েটরের ভূমিকায়। সে বোধহয় স্পার্টাকাসের একনম্বর সঙ্গী তখন। চিরটা কালই আমার পেটগরম বলে এইসব স্বপ্ন দেখি। স্বপ্নের সঙ্গে—চোখে দেখার সঙ্গে—ছায়াছবির আর উপন্যাসের লোকজন এভাবে মিশিয়ে মিলিয়ে দেখি। রাস্তার লোককে দেখতে পাই নভেলে। নভেলের লোককে রাস্তায়।

আদায় করে বাবা যেদিন ফিরে এল—সেদিন রাতে কিন্তু পেটগরমের দরুন কোন স্বপ্ন দেখিনি। সেদিন বেশিরাতে উঠোনে অজানা সব শব্দ হতে লাগল। বাবা শুয়ে শুয়েই বলল, এ হল তেজি জায়গার খাসি। শহুরে ছাগলদের মত মানিয়ে চলতে জানে না। ওদের কি এক ঘরেই রেখেছো?

মা বলল, হুঁ।

বনিবনা হচ্ছে না বোধহয়।

শেষে ওদের আলাদা করে দিতে মাকেই উঠতে হল। আরও বেশিরাতে। তখন আমাদের অন্ধকার উঠোনে চলছে পৃথিবীর প্রথম নৈশকালীন অজাযুদ্ধ।

বাবা যে বঙ্গোপসাগরের তীরে পৃথিবীর কি আদিম জায়গা থেকে আদায় করে ফিরছেন তা আজ বুঝি। পরদিন ঘুম ভেঙে উঠে হাসিম আর দবির তনুদাকে ছাদে দেখে অবাক। বার বার জানতে চাইল, ওখানে কি করে ওঠা যায়?

ওদের অবাক হওয়ায় আমরা অবাক।

মা বলল, কেন? মই দিয়ে উঠেছে তনু!

একতলা বাড়ির ছাদে ওঠার কোন সিঁড়ি ছিল না।

আমাদের এট্টু ওঠাবেন?

ওঠানো হল। উঠে কি হাসি সারা মুখে দু'জনের!

ওপর থেকে পৃথিবীর পুকুর, গাছপালা, মানুষ, বিড়াল, সজনে গাছ দেখতে পেয়ে আনন্দ আর ধরে না ওদের। ওখান থেকেই দবির ভাই বলল, বিকালেও এট্টু ওঠবো।

মা বলল, বেশ তো।

কিন্তু বিকেলে ওদের আর ছাদে ওঠা হল না। কেননা তার আগেই ওরা

পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্য আবিষ্কার করে বসে আছে।

বাবার বিয়ের ডিম-ডিম চেহারার একখানা পারা-ওঠা আয়না। দাদামশায় দিয়েছিলেন। সেখানায় নিজের মুখ দেখে হাসিম ভাই গম্ভীর হয়ে জানতে চাইল, ওডা কেডা ?

দবির ভাই পাশে ছিল। সে এগিয়ে এসে বলল, কই ? দেখি ?

মা বলল, বারান্দায় নিয়ে গিয়ে দ্যাখো।

আয়নাখানা বারান্দায় নিয়ে গিয়ে ওরা তো অবাক ! আয়নার পেছনে তো কেউ নেই ! তাহলে ?

তনুদা— আমি—আমরা তো আরও অবাক।

।। তিন ।।

'দেব-সাহিত্য-কুটিরে'র পূজাবার্ষিকীর গল্পে পড়েছিলাম রাঁধুনীর ছেলে ডিস্ট্রিক্‌ট্‌ ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে তার নিজের শহরের স্কুলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন করতে এসেছে। অনেকটা নিয়তি নিয়তি খেলা।

কয়েক বছরের ভেতর হরলালদা আমাদের খুব দাদা দাদা হয়ে গেল। তার মুখে বাঘের কথা শুনে শুনে বাঘগুলো আমাদের কাছে তখন নেহাৎ বিড়াল। ঠিক এই সময় হরলালদা একদিন এসে বলল—জেলা সদর থেকে ডি. এম. পরিদর্শনে আসবেন।

ক'দিন ধরে রেঞ্জার হরলালদা আমাদের নিয়েই প্যারেড করলো। প্যারেডের পর সুষমাদি কুচকাওয়াজ প্র্যাকটিসের কষ্ট কমাতে সুজি খেতে দিতে লাগলো। বিয়ের পর থেকেই দেখছি সুষমাদি আর আমাদের মত সুজি বলে না। বলে—হালুয়া। আমরা সুজি বলে ফেলে খুব লজ্জা পাই। হরলালদা একদিন সদর থেকে প্যারেডের বেল্ট, বগলস, পট্টি নিয়ে ফিরতে দেরি করল। আমরা অভ্যেসমত হরলালদার শেখানো কুচকাওয়াজ করে সুষমাদির তৈরি 'হালুয়া' খেতে বসেছি সবে—বারান্দায় পা দিয়েই হরলালদা বলল, বাঃ, এক্ষুণি মোহনভোগ খেতে বসে গেল সবাই ! আমার জন্য আর তর সইলো না !

'মোহনভোগ' শুনে দেখলাম—'হালুয়া'র সুষমাদি খুব লজ্জা পেয়েছে। আদিতে 'সুজি'র আমরা 'হালুয়া'র সুষমাদির এই লজ্জায় একদম মরে গেলাম। গলায় মোহনভোগ আটকে গেল।

ইন্সপেক্‌শনের দিন ডি. এম. যেই এল—আমরা তো অবাক। হরলালদা তার লোকজন নিয়ে হাফপ্যান্ট পরে কাঠ হয়ে দাঁড়ানো—বড় মাঠে। ডি. এম. যে আমাদের চেনা লোক। 'ব্লাউজ পিস্‌' চুরির দায়ে তাড়িয়ে দেওয়া সেই মনোরঞ্জনদা। সকালে প্যারেড ছিল। বিকেলে মনোরঞ্জনদা আমাদের

পাড়ায় এল।

গাড়ি থেকে নামতেই গাঁদাফুলের মালা নিয়ে এগিয়ে গেল যজ্ঞেশ্বর রায়। চা এল। এল সুষমাদির তৈরি মোহনভোগের প্লেট হাতে হরলালদা। হাফ প্যান্ট। লাল কেড্‌স্‌ পায়ে। সুষমাদি সামনে এল না। মনোরঞ্জনদাও বেশিক্ষণ বসলো না। মোহনভোগও খেল না।

চলে যেতেই ডাঃ যজ্ঞেশ্বর রায় আপসোস করে বললেন, তখন কি বুঝতে পেরেছি! এই-ই হয়—

তক্ষণে সারা পাড়ায় চাউর হয়ে গেছে গল্পটা। হক সাহেবের ক্যাবিনেটের মিনিস্টার কোন এক মল্লিকের জামাই এখন মনোরঞ্জনদা। যুদ্ধের দরুন কি করে যেন ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে গেছে। ইংরেজি বাংলা কথাগুলোর সব মানে বুঝতে পারিনি সেদিন। শুনে শুনে আজও মুখস্থ রয়ে গেছে।

সেদিন মনোরঞ্জনদার জুতোর ওপরের ধুলোও পিছলে যাচ্ছিল। ধুলো উড়িয়ে গাড়ি চলে যেতেই সুষমাদি বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে এল। ছোট টেবিলটায় চায়ের কাপ। না-খাওয়া মোহনভোগের প্লেট—আর মনোরঞ্জনদার ফেলে যাওয়া গাঁদার মালা। হরলালদা তখনো দাঁড়িয়ে।

কাপ প্লেট ভেতরে নিয়ে যেতে যেতে সুষমাদি হরলালদাকে ধমকে উঠলো—ফুল-প্যান্ট পরলেই পারো।

আমাদের তো হাফপ্যান্ট পরেই ডিউটি দেওয়ার নিয়ম সুষমা। হরলালদা কাচুমাচু হয়ে বলে।

শীত ফুরোতে না ফুরোতে বস্তা হাতে ব্যাপারীরা আমাদের বাড়ির উঠোনে চলে এল। কলকাতা থেকে বড়দার পোস্টকার্ড এলেই মা ব্যাপারীদের ডেকে পাঠায়।

সারাদিন ধরে ধান মাপা চলল। মা আর ব্যাপারীদের মাঝখানে ধান পাহাড় হয়ে ঠেলে উঠলো। বড়দার এম. এ. পরীক্ষার ফি আশি টাকা।

টাকা গুনে দিয়ে ব্যাপারীরা ধান নিয়ে চলে গেল। তখন মায়ের জন্য চা বসলো কাঠের উনুনে। ঘটিতে জল, চা, দুধ, চিনি—সব একসঙ্গে। বাবার বেরোবার ধুতি-জামাও ইস্ত্রি এই ঘটি দিয়েই, ভেতরে গরমজল ভরে—ঘটির মুখ গামছায় বেঁধে। তবে মেজে নেবার পর।

কাঁসার বড় গ্লাসে চা ঢেলে নিয়ে মা ভাল করে বসলো খাটে। ডান পা মুড়ে—পিঠে বালিশ। গলায় পেঁচিয়ে নিল সারা বাড়ির বারোয়ারি মাফলারটা। —এটা না পেঁচালে চা খেয়ে আরাম পাই না! নে তনু, ঝুনুর চিঠিখানা পড়ে শোনা তো!

অনেকবার পড়লাম তো।

আবার পড়। কী সুন্দর লিখেছে—'পৌঁছেছি'।

তুমি গলার মাফলারটা খোলো তো মা !

কেন ? তোদের এত আপত্তি কিসের ?

মাম্পস্ হয়েছিল টোটোর। তখন এই মাফলারটাই তো টোটোর গলায় ছিল।

তাতে কি ? টোটো তো আমারই ছেলে। তোদেরই ভাই।

তনুদা লাফিয়ে উঠলো। মাম্পস্ তোমার ছেলে নয় মা। আমাদের ভাই নয়। মাফলারটা খোলো তো এবারে।

না। যেমন আছে থাকবে। বেশি পাকামি না করে চিঠিখানা পড়ে শোনা তো।

তনুদা মাথা নিচু করে পোস্টকার্ডে তাকালো। আমি মায়ের দিকে তাকালাম। সারাটা দিন মায়ের খুব পরিশ্রম গেছে। কলকাতার কোন রাস্তার নাম তাঁর নামে হলে লেখা থাকতো কিরণকুমারী দেব্যা রোড। খোদ হিমালয় বসে আছে খাটে। খোদ হুণ সর্দার আটিলা গলায় মাফলার পেঁচিয়ে লিপটনের ডাস্ট চায়ের সরবৎ খাচ্ছে বিছানায় বসে। প্রচুর দুধ চিনি দিয়ে।

তখন তনুদা পড়ে যাচ্ছে বড়দার চিঠি—

মা, আমি নিরাপদে কলকাতায় পৌঁছেছি।—তনুদাকে আবার থামালো মা।

দেখলি—দেখলি ? কি সুন্দর লিখেছে 'পৌঁছেছি'—আমরা লিখি—নিরাপদে কলিকাতায় পৌঁছিয়া এই চিঠি লিখিতেছি। নে—পড়ে যা—

পড়বো কি ! তুমিই তো বার বার বাধা দিচ্ছ !

পড়ে যা—

তনুদা পড়ে যেতে লাগল—"এবার কলকাতায় শীত পড়েইনি বলা যায়। স্টারে শিশিরবাবুর 'ষোড়শী' চলছে। কিন্তু দেখার উপায় নেই। বারো তারিখের ভেতর ফি জমা দিয়ে পড়তে বসে যাবো। আর তো ক'মাস পরেই ফাইনাল—পাশ দিয়ে চাকরিতে বসলে তোমার আর কষ্ট থাকবে না মা।"

আমার আবার কষ্ট কিসের রে ! বলতে বলতে মায়ের চোখে দুই দানা জল এসে দাঁড়াল।

এসব কথা যে-কোন বাঙালীর রামায়ণের আদিকাণ্ডে থাকে। আমাদেরও ছিল। বড়দার পোস্টকার্ড, বড়দার গলায় রেডিওতে পর পর তিনখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত, কলকাতা থেকে ফিরে ধুতি পাঞ্জাবি পরে বড়দার বেড়াতে বেরোনো সবই অভিনব। কাছে গিয়ে খুঁতে খুঁজে খুঁজে দেখলে সবই খারাপ লাগে। কিন্তু ক'জন পারে তার আশপাশকে দীর্ঘদিন বিস্মিত, মুগ্ধ করে রাখতে ?

পরীক্ষা দিয়ে ফিরে বড়দা মাকে নিয়ে উল্লাসিনী সিনেমায় 'প্রতিশ্রুতি' দেখতে গেল। সঙ্গী—আমি আর টোটো। চন্দ্রাবতীর ঘর থেকে ছবি বিশ্বাস বেরিয়ে

এলেন। সিঁড়িতে এক সুন্দর যুবকের সঙ্গে দেখা। ছবি বিশ্বাস তাকে থামালেন।

এই জায়গায় বড়দা মাকে বলল, অসিতবরণ। রেডিওতে তবলা বাজান। গানও করেন সুন্দর। ছবির শেষে ভারতী দেবী মালা হাতে এগিয়ে এল। নামগুলো পরে ছবি দেখে দেখে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল।

ক'দিন দেখছি-- বড়দা দাড়ি কামায় না। ধুতি ফেরতা দিয়ে পরে। পায়ে স্যান্ডেল। পাঞ্জাবির ওপরে কোমরে ধুতির খুঁট ফিরিয়ে বাঁধা।

মা বলে, ও ঝুনু—চান করে আয়—খেতে বসবি।

যাই—বলেও বড়দা চান করতে যায় না। একদিন সুরমাদি এল সন্ধ্যেবেলা। গম্ভীর মুখ। মাকে প্রণাম করল। মা বলল, শুনেছি—তোর তো বিয়ে ঠিক!

সুরমাদি দাঁড়াল না। বড়দা ডানদিকের ঘরটায় ইজিচেয়ারে শুয়ে একা গান গাইছিল। সন্ধ্যেবেলার হেরিকেন ধরানো হয়নি। ছাগলরা ফিরে এসে উঠোনে চাঁদের আলোয় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মা এবার ওদের ঘরে তুলবে।

সুরমাদি সে ঘরে ঢুকতেই বড়দা গান থামিয়ে উঠে দাঁড়াল।

সুরমাদি খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। খানিকক্ষণ কোন কথা নেই। তারপর সুরমাদি বড়দার মুখে চোখ তুলে তাকালো।—তুমি কিছু করবে না?

বড়দ মাথা নামালো।

একটা কিছু কর।

আমার তো রেজাল্টও বেরোয়নি।

ওঃ! বলেই সুরমাদি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল।

বড়দা থামালো, কবে?

ঘর থেকে বারান্দায় এসে সিঁড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি অন্ধকার রাস্তায় নেমে গেল সুরমাদি।—সে জেনে তোমার কি!—কথা কটা প্রায় রাস্তা থেকেই ছুঁড়ে দিল। তারপর সন্ধ্যের অন্ধকার তাকে মুছে ফেলল।

বড়দা সেই অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে। ছাগল তুলে দিয়ে খানিক বাদে মা এসে বলল, সুরমা কোথায়?

চলে গেল।

চলে গেল? পায়েস করেছিলাম—একটু খেতে দিতাম, চলে গেল!

তারিখ দিয়ে মাস মনে রাখার কথা নয়। তবে বর্ষাকাল। সুরমাদির বিয়ের দিন রাত থেকেই বৃষ্টি। পরদিন ঝোড়ো হাওয়ার ভেতর নদীপথে সুরমাদিকে নিয়ে তার বর নৌকোয় চলে গেল—তেরখেদার দিকে।

মা বলল, এইসময় নৌকোয় গেল!

বেশি তো রাস্তা নয় মা। ঘণ্টা কয়েকের পথ।

ঘোড়ার গাড়িতে যেতে পারত।

ওপারে গাড়ি যায় না।

পরদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি—বাতাস ঠাণ্ডা। দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এসে অবাক। চারদিক সাদা হয়ে গেছে। সারারাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে। চারুবাবুদের বাসন মাজার পুকুরটা ভাসো-ভাসো। তখনও আকাশ ঢেলে চলেছে নাগাড়ে।

দুপুরনাগাদ বড়দা বলল, আমি কলকাতা যাবো বিকেলের ট্রেনে।

এখন যাবি কি? এই বৃষ্টিতে?

গাড়ি তো বন্ধ থাকবে না। আমার কাজ আছে কলকাতায়। রেজাল্টের খোঁজ নেব।

খোঁজ নিবি কি, বেরোলে একবারে জানতে পারবি। এই বৃষ্টিতে আমি তোমায় বেরোতে দেব না।

রাতে সবাই খেতে বসলাম—হেরিকেনের কাচে এসে বাদুলে পোকা লাফিয়ে পড়ছে। মা খিচুড়ি দিতে দিতে বলল, এই বর্ষায় সুরমা নৌকোয় শ্বশুরবাড়ি গেল!

বড়দা বলল, বৃষ্টি জোর নামলো তো কাল সেই রাত একটায়। তার আগে কখন শ্বশুরবাড়ি পেঁৗছে গেছে সুরমা।

হাত থামিয়ে মা বড়দার দিকে তাকালো, তুই অত রাতে জেগে বৃষ্টির ফোঁটা গুনছিলি?

নাঃ। ঘুম ভেঙে জেগে দেখি—টেবিল-ক্লকে রাত একটা কত। তখনই তো বৃষ্টিটা চেপে এল।

পরদিন তার পরের দিনও বৃষ্টি থামলো না। ট্রেন বন্ধ। স্টিমার বন্ধ। বাজার বন্ধ। জমিদার চারুবাবুর পুকুর ভেসে গেল।

রান্নাঘরের পাশেই বাবার বানানো বড় একটা চৌবাচ্চায় আদায়ের কচ্ছপগুলো থাকে। দরকারমত একটা করে তুলে এনে কাটা হয়। তিনদিন ধরে একটানা বৃষ্টিতে ওদিকে কারও নজর যায়নি। ছাগলরাও বেরোতে পারেনি। ওরা ঘরে বসে বসে ভাতের ফ্যান, পান্তা খেয়ে কাটাচ্ছে। তাদের নিয়েই মা বেশি ব্যস্ত। আমাদের উঠোনও সাদা। খবর ভৈরবের জল উঠে ডাকবাংলার মোড় অব্দি এসেছে।

মা ভিজতে ভিজতে রান্নাঘরে গিয়েছিল। ফেরার পথে চৌবাচ্চায় উঁকি দিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, সব ক'টা পালিয়েছে—

বাবা উঠোনে নেমে পড়ল। সব? গোটা চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটা তো ছিল—

মা বলল—একটাও নেই বোধহয়। চৌবাচ্চাও সাদা।

বিকেলের দিকে দুটো খবর একসঙ্গে রটলো। ভৈরবের জল উথলে হাসপাতাল মাঠে ঢুকেছে। আর আমাদের কচ্ছপগুলো ভেসে বেরিয়ে পড়েছে। কেউ আর

ডুবে যাওয়া রাস্তায় পা দিতে সাহস পাচ্ছে না। যদি কামড়ায়!

সারা জীবনের বিকেলবেলাগুলো সকালবেলাগুলো আলাদা করে মনে থাকে না। আকাশের পাখি আকাশ দিয়ে উড়ে চলে যায়। মাটির মানুষ পৃথিবী দিয়ে হেঁটে চলে যায়। শুধু বাতাস আর সময় এদের সবার গায়ে ময়াম হয়ে লেগে থাকে। নয়তো কেউ কারও খবর রাখে না। এর ভেতর একটা দুটো সকাল কি বিকেল আলাদা হয়ে জীবনের মনে একখাবলা হয়ে জেগে থাকে।

এখানে শহর হবার আগে ভৈরব ছিল। ছিল আকাশ। বাতাস। এরা থেকেই যায়। আমরা আসি যাই। পড়ে থাকে কয়েকখানা বাঁধানো ফটো—গড়িয়ে পড়া কিছু স্নেহ—দেওয়ালে ঘুঁটে আর সিঁদুরের দাগ—বাড়ি পালটানোর সময় খাঁ-খাঁ ঘরে যা পড়ে থাকে।

এই তো পৃথিবীর ইতিহাস। এর ভেতর একদিন পিচগলা রোদে আমি আর টোটো গাছের ছায়া খুঁজে খুঁজে স্কুলে যাচ্ছি। হঠাৎ গুলির আওয়াজ। তখনো বোমাবাজির রেওয়াজ হয়নি। একটার আওয়াজে আরেকটা গুলিয়ে যায়নি।

টোটোকে নিয়ে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে এর ওর আগান-বাগান ভেঙ্গে স্কুলের দিকে এগোচ্ছি। আবার গুলির আওয়াজ। তারপর দেখি লোকজন ছুটছে। কিনা—মিলিটারির এক সাহেব ক্ষেপে গিয়ে রাস্তায় কুকুর দেখলেই গুলি করে সাবাড় করছে।

স্কুলে পোঁছাতেই ভ্রিলস্যার ছাত্রদের জন্যে নিরাপদে বাড়ি ফেরার একটা গাইড লাইন দিলেন। কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়ে যাওয়া চলবে না। কোন্ কোন্ মোড় বিপজ্জনক। কোন্ কোন্ পথে মিলিটারি জিপ ঢুকতে পারবে না। কোন্ গলি, কোন্ বাগান, কোন্ পুকুরপাড় সেফ্—তাও বলে দিলেন। ক্লাসেই শোনা গেল—সাহেবটা আমেরিকান এয়ারফোর্সের। কেউ বলল—না না, ডুবোজাহাজের কমান্ডার।

তখন সবই সবাই বিশ্বাস করে। সন্ধ্যে হলেই ব্ল্যাকআউট। সাইকেল, নৌকা মিলিটারি সিজ করে নিয়েছে। রাতের ট্রেনে মিলিটারি যায়। দিনের বেলা সার্কিট হাউসের সামনে খেলার বড় মাঠে অস্ট্রেলিয়ান সোলজাররা বালুচ রেজিমেন্টের কাফ্রি হাবসিদের সঙ্গে বল খেলে, গোলপোস্টে ভিজে জামা শুকোতে দেয়।

ভ্রিলস্যার নাকি ফার্স্ট ওয়ার্লড ওয়ারে ছিলেন। তাঁর গাইডলাইন ধরেই আমরা দু'ভাই বিকেল-বিকেল বাড়ি ফিরলাম।

সর্বনাশ! আমাদের বাড়ির সামনেই মিলিটারির একটা জিপ দাঁড়িয়ে। মা মন দিয়ে সেলাইকলে কি সেলাই করছে। আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে চেয়ারে বসা এক মিলিটারি সাহেবের সঙ্গে হেসে হেসে কথাও বলছে বাংলায়। কী ব্যাপার!

জিপের সামনে রাইফেল কাঁধে দুই আমেরিকান সোলজার। আমরা রাস্তা থেকে সাহেবের পিঠ, মাথার কার্নিশ টুপি শুধু দেখতে পাচ্ছি। সাহেব মায়ের

দিকে তাকিয়ে।

কি ব্যাপার? মায়ের সামনে মিলিটারি?

সেলাইকল চালাতে চালাতে মা রাস্তায় আমাদের দেখতে পেল।—আয় টোটো। এদিকে আয় পানু। প্রণাম কর।

আমরা ভয়ে ভয়ে এগিয়ে দেখি—মিলিটারির সেই সাহেব বাংলায় হাসছে।

তোদের বড়মামা।

॥ চার ॥

আমরা ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করতেই দেখি—রাস্তায় জিপগাড়ির সামনে দাঁড়ানো দুই আমেরিকান সোলজার খুব মন দিয়ে আমাদের প্রণাম ঠোকা দেখলো।

বড়মামা বলল, এখুনি তোদের দুই ভাইয়ের ভাইটালিটি টেস্ট করবো। যা বারান্দার ওখানে দাঁড়িয়ে প্যান্টের বোতাম খুলে পেচ্ছাপ কর তো। কারটা রাস্তা অব্দি যায় দেখবো—

এ আর এমন কি! এ কাজ আমরা প্রায়ই করে থাকি। এটা বোধহয় মিলিটারির কোন ব্যাপার। বারান্দার নিচে ঘাসে ঢাকা জমি। তারপর রাস্তা। একে বড়মামা—তায় মিলিটারি। জিপ দেখে সারা পাড়ার দরজা জানলা বন্ধ। কিন্তু প্রত্যেক জানলার ফাঁকে কয়েক জোড়া চোখ তাকিয়ে আছে—তা আমরা জানি।

আমরা দু'জনই ঘাস পেরিয়ে রাস্তা ছুঁতে পারলাম। বড়মামা চেঁচিয়ে বলল, সাবাস! এই তো চাই। তোদের কিডনি ভাল। ভাইটালিটি আছে—

সন্ধ্যের দিকে বড়মামার মিলিটারির জিপ ধোঁয়া উড়িয়ে বেরিয়ে গেল।

জীবনের অনেক জিনিস দেখি কখন নভেলের পাতায় উঠে এসেছে। আবার নভেলের পাতা থেকে কত জিনিস যে জীবনে গড়িয়ে পড়ে। লক্ষ্য করে দেখলে অবাক হতে হয়। পুরো ব্যাপারটাই নভেল? না জীবন? এক এক সময় সব গুলিয়ে যায়। জীবনকে মনে হয় নভেল। নভেলকে জীবন।

মহাযুদ্ধের ভেতর একদিন সকালবেলা একখানা ডাকোটা বিমান আমাদের শহরের বড় মাঠে নামবে বলে চক্কর দিচ্ছিল। যেদিকেই নামতে যায়—সেদিকেই হই হই করে লোক ছুটে যায়। দেখবে বলে। ডাকোটা কিছুতেই নামতে পারে না। নামলেই মানুষের মাথায় পড়বে।

সেই ভিড়ের ভেতর বড়মামা জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। সঙ্গে মাইক্রোফোন। তাতে মুহুর্মুহু বড়মামার গলা—ওদিকে যেও না। প্লেন নামবে। প্লেন নামবে—ইউ রাসকেল!

ভিড়ের মাথার ওপর ডাকোটার গর্জন। সেই সঙ্গে মাইকে বড়মামা। সে এক

এলোপাথাড়ি দৌড়োদৌড়ি। আমরা যখন বড়মাঠে—ডাকোটা তখন রেল স্টেশনের মাথার ওপর দিয়ে ছোঁ দিয়ে নামলো বলে। কিন্তু নামতে পারে না। মুখ ঘুরিয়ে নিতে হয়। যেখানেই ডাকোটা সেখানেই মানুষের মাথা।

শেষে সেই ডাকোটা গিয়ে পড়ল ভৈরব নদীর বুকে। পাইলট লাফিয়ে পড়ে জলে ভেসে উঠলো। ডাকোটা বিশাল বিশাল ঢেউ তুলে বুড়বুড়ি কেটে ডুবে গেল।

পরদিন সারা শহরে মিলিটারির পাহারায় মিউনিসিপ্যালিটি ঢেঁড়া দিল। উপযুক্ত পুরস্কারের আশায় সারা জেলার ডুবুরিরা এসে হাজির হতে লাগল। তাদের দেখতে আমরাও ভিড় করছি কাছারি মাঠে।

কোর্টকাছারি সব জায়গাতেই লাল রংয়ের হয়। সেই কাছারির বারান্দায় বড়মামা ডুবুরিদের একত্র করলো। তারা কেউ বেঢপ লম্বা। কেউ ভীষণ বেঁটে। কোনজন বা সিড়িঙ্গে। একজন বেশ ধ্যাড়েঙ্গা। কারও টাক—কারও বা বাবরি। সঙ্গে সেই পরিমাণ দাড়ি।

শুনলাম—এরা কেউ কেউ সুন্দরবন ছাড়িয়ে সমুদ্রপারের লোক। ওরা তো বড়মামাকে দেখেই সর্ষের তেল চাইতে লাগল। সারা গায়ে মেখে ভৈরবে ডুব দেবে।

বড় স্টিমার থেকে দড়ি নামিয়ে দেওয়া হল জলে। দড়ির ডগা ধরে এক এক ডুবুরি লম্বা ডুব দেয়। ভুস করে ভেসে উঠে বলে—নদীর বুকে উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছে—একটুর জন্যে ফসকে গেল।

নদীর ঘাট লোকে লোকারণ্য। সেই ভিড়ের ভেতর বড়মামা স্টিমারের ডেকে নেমে গিয়ে বলল, জোয়ার এলে দূরে ভেসে যাবে না তো?

এক ডুবুরি বলল, উড়োজাহাজ বলে কথা! অত ভারি জিনিস ভাসে না সাহেব।

বড়মামা কোন জবাব দিল না। একপাল ডুবুরি নিয়ে ক'দিন খুব বৈঠক করতে হয়েছে তাকে। বড় বড় কাছির এক ডগা ধরে ডুবুরি নদীর পেটে নেমে গেছে। অন্য ডগা টেনে ঘাটের ওপর রাস্তায় নিয়ে লরির লেজে বাঁধতে হয়েছে।

সকাল থেকে দুপুর অব্দি ডুবুরিদের ডুবোডুবি চললো। পড়ন্ত বেলায় ডোবা ডাকোটায় কাছি, লোহার শেকল বাঁধা হল। পরদিন বিকেলে ছ'খানা লরি মিলে হেঁচড়ে ডাকোটাকে টেনে তুললো। ডাকোটার নাক কাদায় মাখামাখি। অতবড় একটা যান্ত্রিক জন্তু অসহায় অবস্থায় ডানাভাঙ্গা দশায় পিচরাস্তায়। ছিল উড়োজাহাজ। ডুবোজাহাজ হয়েই যেন জল থেকে উঠে এল।

কী আমাদের বাড়ি! আর কোথায় এই ডাঙ্গায় তোলা উড়োজাহাজ। আমেরিকান কারিগররা এসে ডাকোটাকে কেটেকুটে ভাগ ভাগ করে ফেলল। তারপর ইঞ্জিনটা বের করে নিয়ে বড় লরিতে তুললো। তুলেই ওরা চলে গেল।

পড়ে থাকল ডাকোটার গায়ের খোসা। আমরা অনেকদিন পর্যন্ত গত সনের কমলার খোসার মত ওগুলোকে দেখতাম—তাকিয়ে থাকতাম। ওড়া, ভাসা, ডোবা—সবকিছুরই স্মৃতি লেগেছিল ওইসব খোসায়।

ভাগ্যিস ছোটবেলাটা পড়েছিল মহাযুদ্ধের ভেতর। এখনকার ক'জনের ভাগ্যে বা পড়ে। সবই যেন এক্সপেরিমেন্টাল ছোট গল্পের মত ঘটে যাচ্ছিল তাই। যা কখনো হয় না—যুদ্ধে, ভূমিকম্পে, জলস্তম্ভে তো তা-ই হয়ে যায়। অবলীলায়।

আমরা ছিলাম দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানের রূপকথার জগতে। অন্তত এখনকার চোখে তাকালে তো তাই মনে হবে। মহাযুদ্ধ এসে আমাদের তুলে নিয়ে গিয়ে এক অকল্পনীয় সব ব্যাপারের ভেতর টুপ করে ফেলে দিল। এখন যেমন ঘটনাই ঘটে না—তখন শুধু ঘটনার ভেতরই আমরা থাকতাম। নয়তো টালির বারান্দা, ঢ্যাড়সের দানা ছড়ানো উঠোন থেকে আমরা কী করে গিয়ে সাহেবদের স্টিমার-পার্টিতে পড়ি?

বড়মামা বদলি হল লাকসামে। মিলিটারি এয়ারফোর্সে। সেই সুবাদে মাঝনদীতে স্টিমার-পার্টি। একদিন শীতের দুপুরে দুই মার্কিন সোলজার এসে জিপ থেকে নেমে মায়ের হাতে বড়মামার চিঠি দিল। তুলো ফাঁসা পাউডার পাফে পাউডার মুখে বুলিয়ে মা দাঁতপড়া চিরুনি চালালো মাথায়। তারপর টোটো আর আমাকে নিয়ে জিপে গিয়ে বসলো। জিপ ছুটলো নদীর ঘাটে। বাড়ির বারোয়ারি মাফলারটা মা ঘোমটার ওপর কষে পেঁচিয়ে নিয়েছে। বাতাস মায়ের কানের বাছেও ঘেষতে পারছে না। তার দু'পাশে আমি আর টোটো।

নদীর ঘাটে এখন কোন স্টিমার নেই। মাঝনদীতে একটা বড় লঞ্চ ভাসছে। তার দোতলা থেকে—বড়মামাই মনে হল—আমাদের দেখে হাত তুলে নাড়লো। আমরা একটা স্পিডবোটে করে টলমল করতে করতে লঞ্চের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। স্পিডবোটের লেজে ভাঙা ঢেউয়ের ডগায় কোন মাছখোর পাখি চক্কর দিল।

মায়ের পাশে পাশে আমরা লঞ্চের দোতলায় উঠে এসেছি। এলাহি কান্ড। ডেকজুড়ে লম্বা টেবিলে নানান খাবার সাজানো। নোঙর তোলার দিকটায় কয়েকজন বাজনদার অবিরাম বাজিয়ে চলেছে। লম্বা বাঁশী, বিগড্রাম, ছোটড্রাম, ঝাঁঝর, কর্নেট, কন্ডাল। আর ছড়িয়ে ছিটিয়ে একপাল সাহেব। তাদের হাতে হাতে গ্লাস। গ্লাসে গ্লাসে নানা রঙের জল।

মাকে দেখেই বড়মামা সবাইকে ইংরাজিতে কি বলল। তার মানে—আমার বোন এসেছে।

সঙ্গে সঙ্গে লালমুখো এক সাহেব মায়ের ডান হাতখানা ধরে ডু ডু করে কী বলল। মাও সঙ্গে সঙ্গে হাত ছাড়িয়ে আঁচলের ভেতর নিয়ে নিল। বড়মামা তা দেখে মন-মরা কেমন হাসলো। নদীর দিকে তাকিয়ে।

কত বক্তৃতা। কত গান-বাজনা। তারপর একসময়—খাওয়াদাওয়া শুরু

হয়ে গেল। আমি আর টোটো এই সময়টার অপেক্ষায় ছিলাম যেন। যে যার খাবার প্লেটে বেছে বেছে তুলে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছে। কেউবা এক টেরে বসে খেতে লাগলো।

আমি আর টোটো প্লেট নেবার ঝামেলায় গেলাম না। লম্বা টেবিলে সাজানো খাবারদাবার আমাদের মুখ-সই-সই। টোটো এক সাহেবের হাঁটুর পাশ দিয়ে ঠিক মুরগির ঠ্যাঙের বারকোশে পৌঁছে গেল। আমি ততক্ষণে মাছভাজায় পৌঁছে গেছি। পাশেই কিসমিস-বাদাম-ভরা কেক। টোটোর আর আমার হাত আর মুখ সমানে চলছিল। আমরা তো প্লেট বা কাঁটাচামচের ঝামেলায় যাইনি। সাহেবরা আমাদের সঙ্গে পারবে কেন?

আমি আর টোটো বেশ এগোচ্ছিলাম। বাধ সাধলো স্বয়ং বড়মামা। দেখলাম -তার চোখের ইশারায় হাবিলদার মত দুই জাঁদরেল গোঁফওয়ালা এগিয়ে এল আমাদের দিকে। কোন কথা না বলে আমাদের শক্ত করে ধরলো তারা।

তারপর আবার স্পীডবোট। স্টিমার ঘাট। জিপ। বাড়ি। মাকে সন্ধেবেলা বড়মামা নিজেই পেৌঁছে দিতে এসে আমাদের ভাল করে দেখল। দেখে বলল, তোরা কী জিনিস রে!

আমরা যে কী জিনিস তা আমাদের জানার কথা নয়। তবে আমরা খেতে পারতাম—যতক্ষণ না দম বন্ধ হয়ে আসে। ছুটতে পারতাম। ঘুমোতে পারতাম চোখ ভরে। এসবে কেউ আমাদের ট্রেনিং দেয়নি।

জমিদার চারুবাবুর বাড়ি ভাড়া করে আমরা থাকতাম। তিনি পুকুরে দামী মাছ ছাড়তেন। অতি গরমে সুখী মাছেদের ছায়া চাই। চারুবাবু তিন-চারটে কলার ভেলা ভাসিয়ে দিতেন পুকুরে। আমরা সেগুলো ধরে চানের সময় ভাসতাম। অন্য সময় মাছের দল সেই সব ভেলার নিচে রেস্ট নিত।

পুকুরটা যেন সারা পাড়ার দশাশ্বমেধের ঘাট। একেবারে সকালে পুজোআচ্চা সন্ধ্যা-আহ্নিকের ভিড়। বেলা ন'টা দশটায় স্কুল কলেজ কাছারির ভিড়। বিশেষ করে যারা বি. এ. পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের চান করার স্টাইলই আলাদা। তারা চান করে পা ধুয়ে সাবধানে ঘাটে রাখা স্যান্ডেলে পা গলাতো। পাছে ময়লা লাগে পায়ে। মুখের চেহারা অন্যমনস্ক। হাতে সোপকেস। ধুঁধুলের খোসা।

অনেক বেলায় চান করতে নামতেন পাড়ার হরিমোহন পেশকার। নেমেই ভেলা ধরে ভাসতেন। মুখে জলের ফোয়ারা তুলতেন। তাঁর কাছাকাছি সাঁতরাতো আমাদের বড়বৌদি। পাড়াতুতো এক অদ্ভুত খোলামেলা সোসাইটি ছিল। পৃথিবীর কোথায় কোথায় যুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কোথায় জাপানীরা বোমা ফেলছে। তাতে এই দুজনের কোন ভ্রূক্ষেপ ছিল না। একজন ভাসতেন। শ্বশুরপ্রতিম। অন্যজন সাঁতরাতো। পুত্রবধূর মত।

এরও বছর দশেক আগে বড়মামা ত্যাজ্যপুত্র হল। ব্যাপার খুব সিম্পল। দাদামশায় ছেলের জন্যে টাকা রাখবেন বলে মেয়েদের বিয়ের নামে গৌরীদান করে যাচ্ছিলেন। এক এক মেয়ের বিয়ে একশো টাকায় কমপ্লিট। খুঁজে খুঁজে দোজবরে মেয়ে দিচ্ছিলেন। সোনার ভরি দশ টাকা। এইভাবে চারটি মেয়ে পার করার পর বড়মামা বেঁকে বসলো। অথচ তারই জন্যে দাদামশায় টাকা জমাচ্ছিলেন।

গৃহদেবতার সামনে বড়মামা প্যান্টের বোতাম খুলে যা করার করলেন। পঞ্চম বোনের বিয়ে ঠিক করলো ইঞ্জিনীয়ার দেখে। রাগে দাদামশায় পুত্রকে করলেন ত্যাজ্যপুত্র।

বড়মামা পিছোবার মানুষ নয়। সে তার বাবাকে খরচ করিয়ে দিয়ে ভাল ভাল ভগ্নীপতি আনাতে লাগলো। এরই মাঝে দাদামশায় সপ্তম মেয়ের বিয়ের সময় বড়মামাকে ফাঁকি দিলেন। তাঁর নিজের স্টাইলে সস্তায় রুগ্ন জামাই আনলেন। জামাই এতই রুগ্ন যে তাকে বিয়ের আগে মেডিকেল সার্টিফিকেট দেখাতে বলা হল। সে দাদামশাইকে মেডিকেল সার্টিফিকেট দেখিয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসল। পরে বেরুলো—জামাইয়ের রাজরোগ। আসলে দাদামশাইয়ের ভেতর একই সঙ্গে পাণ্ডিত্য আর নিষ্ঠুরতা, শঠতা আর প্রজ্ঞা খেলা করতো। এই খেলার প্রতিভাই ছিলেন দাদামশায়।

প্রথম মহাযুদ্ধ এসে কীভাবে সমাজের গায়ে ঘা দিয়েছিল—তা আমার দেখার কথা নয়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এসে সবকিছু যে ধসিয়ে দিচ্ছিল তা বুঝতে সে দনকার আমার মত এই বালকেরও কোন অসুবিধে হয়নি।

সবাই কোন-না-কোন চাকরি পেয়ে যাচ্ছিল। তবু সংসারগুলো ভেসে যাচ্ছিল। জানাশুনো বাড়িতেই কেউ ঠিকাদার—কেউ দালাল হয়ে গেল। কেউ অর্ডার সাপ্লায়ার। কত জিনিস যে যুদ্ধে লাগতো। হাঁসমুরগি, কলামুলো থেকে শুরু করে আলকাতরা, এমন কি পুরনো দেওয়াল।

সেসব ভেঙ্গে ইট চলে যেত রাস্তা বানাতে।

সেই সময় একদিন দুপুরে স্কুল থেকে ফিরে দেখি সাইকেল সারাইয়ের দোকানদার বিজয় মোদকের বাড়ি ঘিরে সোলজাররা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। লাউমাচার নিচে। ছেঁচতলায়। অটোমেশিন হাতে। দূরে একটা ওয়েপন ক্যারিয়ার। খালি।

গুরুজনেরা আমাদের বাড়ির ভেতর আটকে রাখলো। সারা পাড়ায় চাপা গরম। আসলে তখন কানেকটিকাট কিংবা ওহাইওর যুবা মার্কিন সৈনিকরা বিজয় মোদকের অল্পবয়সী বউকে পালা করে লাইন দিয়ে রেপ করেছিল। এসব দিব্যি অনায়াসে হয়ে যাচ্ছিল। কেউ যে ঘুরে দাঁড়িয়ে কিছু বলবে—তেমন কেউ ছিল না। যেমন আর কি একসময় মহাভারতে হয়ে গেছে।

শহরে সাইক্লোন, জলবসন্তের মত হই হই করে খবরটা রটলো। বিজয় মোদকের বাড়িতে ক'দিন কেউ গেল না। তারপর সব স্বাভাবিক হয়ে গেল। সেবারে ভাসানের দিন দুর্গাবরণে বিজয় মোদকের বউও দিব্যি থালায় করে সন্দেশ নিয়ে সবার সঙ্গে এল। দুর্গাকে মিষ্টিমুখ করিয়ে তার কানে কানে কী বলে সে অন্য মা-মাসীদের সঙ্গে বাড়ি চলে গেল। তখন তো কথায় কথায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত বসতো না। আমরাও আট আনা ঘণ্টায় বিজয় মোদকের দোকান থেকে সাইকেল ভাড়া নিয়ে চালানো শিখতে যেতে লাগলাম। যেন কিছুই হয়নি। পরে বিজয়দার ছেলেকে কলকাতায় রেশনের দোকান করতে দেখেছি। বড্ড সাদা। সাহেবদের মত। চোখে রোদ সয় না একদম। দোকানঘরের ভেতরেও সে রোদ-চশমা পরে বসে মাপামাপি দেখতো।

কিন্তু শেফালীর মায়ের ব্যাপারটা অত সহজে চাপা পড়ল না। আমাদের বাড়ির পেছনদিককার আমবাগানে খেলতে গিয়ে আমরা একদিন শেফালীকে আবিষ্কার করলাম। একটা পোড়ো একতলা বাড়ি সারিয়ে নিয়ে সেখানে শেফালী আর তার মা উঠেছে। কোনো পুরুষ লোক নেই বাড়িতে। শেফালীর মা সব সময় দামী দামী জামাকাপড় পরে থাকে।

পরে শুনলাম, গভীর রাতে শেফালীদের বাড়ি চারুবাবু যান। তার মানে চারুবাবু রেখেছেন শেফালীর মাকে। চারুবাবু এসে কী করেন? শেফালীর বাবা কোথায়? ওদের কেমন করে চলে? চারুবাবু যখন আসে তখন তো শেফালী ঘুমে কাদা। এইসব ভাবনাই আমরা ভাবতাম। গুরুজনেরা আরও বেশি ভাবতো। শেফালীর সঙ্গে খেলা আমাদের বন্ধ হয়ে গেল। একটা মেয়েকে বয়কট করে আমাদের ভীষণ খারাপ লেগেছিল। কিছুটা বুঝি। বেশিটাই বুঝি না। এই অবস্থায় শেফালীর মা শেফালীকে নিয়ে কোথায় চলে গেল।

বিতাং দিয়ে সন তারিখ সামলে মা বেশ গল্প করতো। তাতে তার নিজের কথাও থাকতো। আশপাশের মানুষের কথাও থাকতো। মা বিয়ের পর বড় হওয়ার জন্যে কয়েকবছর দাদামশায়ের কাছে ছিল। বাবা যেবার তাকে নিতে এল—সেবারের বিষয়টি মা খুব রসিয়ে বলতো। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার যুবক আমাদের মাকে নিতে আসবার সময় তার হাতে ছিল ফুল আঁকা একটি টিনের তোরঙ্গ। বাবা নাকি বাড়িতে ঢুকে মাকে চিনতে পারেনি। বলেছিল—যাও বলোগে—সেজো জামাই এসেছে—। এই সামান্য সেন্টেন্সটায় আমি ফেলে আসা সময়কে দেখতে পাই। যে কাল আর কোনদিন আসবে না—তখনকার ভাষা, তখনকার নির্দেশ।

অল্প বয়সে প্রথম মৃত্যুকে দেখি চারুবাবুর বাড়িতে। তাদের মহাল থেকে অনেক কাঁকড়া এসেছিল। চারুবাবুর বড় বাড়িতে বোন-ভগ্নীপতিরা ছেলেপিলে নিয়ে থাকতো। এক ভাগনে মানে চারুবাবুর—আমাদের খেলার সঙ্গী ছিল।

তার মা কাঁকড়া খেয়ে কলেরায় মারা গেল। তারপর চারুবাবুর বোনেরা মরতে লাগল। কলেরায়। কয়েকদিন ধরে।

সারা পাড়া নিঃঝুম। এই সেজো বোন মারা যাচ্ছে। গেল। ন'বোন বমি করছে। মরবে। এই মরে গেল। সে সহ্য করা যায় না। কয়েকদিন মৃত্যু আমাদের পাড়ায় তাঁবু ফেলেছিল। সন্ধ্যে হলে হরিবোল। ভোররাতে শ্মশানযাত্রীরা হরি-ধ্বনি দিয়ে ফিরে আসতো। সে রাত যেন আর শেষ হয় না। হবার নয়। মৃত্যুকে এভাবে ক'দিন ধরে থানা গেড়ে বসে থাকতে আর কখনো দেখিনি। যদিও জানি —মৃত্যু আমাদের পাশেই সবসময় ওৎ পেতে বসে আছে।

বাড়ি ঢুকলো সোনামুচি—কাকীমা, একটা বড় রুই আবার ভেসে উঠেছে।

মা বলল, মরা?

না, এখনো বেঁচে আছে। বলেই সোনামুচি যেমন এসেছিল—তেমনি নিচে রাস্তায় নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমি আর টোটো ফলো করি সোনামুচিকে।

অন্ধকারে সোনামুচি পুকুরের ঘাটে নামলো। সঙ্গে আমি আর টোটো। চারুবাবুদের সামনের পুকুরে। পেছনের পুকুর থেকে বাছাই মাছ তুলে এখানে ফেলা হয়। ফেলে বড় করা হয়। ফি-বছর এই সময়টায় কিছু মাছ মরে ভেসে ওঠে।

সোনামুচি হাঁটুজলে নেমে দুহাতে একটা বড় মাছ অন্ধকারে জড়িয়ে ধরল। ধরেই সোনামুচি ঘাটের চাতালে উঠে এল। পুকুরের আশপাশের বাড়িগুলোয় হেরিকেনের আলো। পেছন পেছন চাতালে উঠে আমি আর টোটো লাফাই। জোড়াপায়ে। কালো হয়ে আসা বিরাট একটা রুই। প্রায় জ্যান্ত। সোনামুচি লাফালাফি দেখে আমাদের ধমকালো—শব্দ করিস না। দেখে ফেলবে—

তারপর আমরা মাছটা নিয়ে খিড়কি দিয়ে উঠোনে ঢুকি। মা হেরিকেন সামনে রেখে কুটতে বসলো। কুটতে কুটতেই বলল, মাছ বেশি হয়ে গেছে জল আন্দাজে। আরও মরবে নির্মল—

সোনামুচির আসল নাম নির্মল। নদীর ওপার থেকে অনেকদিন আগে আমাদের বাড়িতে আসেন। বড়দা তখন স্কুলে। বড়দাকে পড়াতে এসে আমাদের বাড়ি থেকে যান। বড়দা মেজদা তাকে মাস্টার মশায় ডাকে। দাদা কথা বলতে শিখে নির্মল ডাকতে গিয়ে ডাকলো মুমভল। কি করে জানি না—নতুন কথা বলতে শিখে আমি ডাকলাম—সোনামুচি। আমার দেখাদেখি টোটোও তাই ডাকে। তারপরে উমা আর টাপু ডাকে—নিনি।

সেই নির্মল ওরফে মাস্টারমশাই ওরফে মুমভল ওরফে সোনামুচি ওরফে নিনি মাকে বলল, বেশি করে হলুদ দিয়ে রাঁধেন যেন কাকীমা। পোকা হয়ে গেছে—

তোমার মাথা! দেখছো জ্যান্ত মাছ! এই তো খাবি খাচ্ছিল।

টাপু মাছ খেতে পারে না বেছে। মা বেছে দিচ্ছিল। আমি আর টোটো মাছের পর মাছ উড়িয়ে দিচ্ছি। উমা কিছু পিনিধানি খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। বাবা কোর্ট থেকে ফেরেনি। বড়দা কলকাতায়। মেজদা ঢাকায়। দাদা ভাড়ায় খেলতে গেছে দৌলতপুরে।

অন্ধকার আকাশ দিয়ে এরোপ্লেন উড়ে যাচ্ছে গোঁ গোঁ করে। তাদের দেখা যায় না। নিচে শহরের লাইটপোস্টের ডুমে ঠুলি পরানো। সারা শহরের সাইকেলে পুলিশ নম্বর লাগিয়ে দিয়েছে। দিনের বেলায় মিলিটারি হাট থেকে কুমড়ো কিনে ফেরে। কারও কাঁধে রাইফেল। কারও হাতে লাউ। তার ভেতর হেরিকেনের সামান্য আলোয় আমি আর টোটো মাছভাজার পর মাছভাজা উড়িয়ে দিচ্ছি। রান্নাঘরে আমাদের ঘিরে আলোটুকুর বাইরেই গোল হয়ে চারদিক অন্ধকার। এ যেন কোন গুহার ভেতর আমরা আলো জ্বালিয়ে বসে আনন্দ করে খাচ্ছি।

পরদিন সকালে কড়কড়ে রোদে বসে বাবা নতুন রংকরা ফিনাইলের খালি টিন শুকোচ্ছিল। আমি আর টোটো ছোট ছোট কাগজে আঠা মাখিয়ে বাবার হাতে তুলে দিচ্ছিলাম। এক একটা কাগজে দাদা এক এক জিনিসের নাম লিখে রেখেছে। যেমন—মুসুরির ডাইল, শুকনা লঙ্কা—এই সব আর কি। বাবা সেই কাগজগুলো টিন বুঝে সেঁটে দিচ্ছিল।

এই টিনগুলোয় মা সম্বচ্ছরের ভাঁড়ার রাখে। এছাড়া বাবা খাটের নিচে বালি বিছিয়ে সস্তার দিনে আলু কিনে তার ওপর রেখে দিতেন। বাবার সংসার করা আর আমাদের জ্যামিতির বারোর উপপাদ্য একই রকম লাগতো। বেশ আটঘাট বেঁধে এগোনো। সারাদিন পরে বাবা যখন শুয়ে পড়তো—আমার তো মনে হত—বাবা মশারির ভেতর শুয়ে শুয়ে বিড়বিড় করে বলছে—ইহাই উপপাদ্য বিষয়! ইহাই উপপাদ্য বিষয়!

কয়েকটা টিনে কাগজের টুকরো সেঁটে দেওয়ার পর জমিদার চারুবাবু এসে হাজির। বাবা তো তটস্থ হয়ে উঠে দাঁড়ালো। বসুন বসুন—

না, বসতে আসেনি। মাঝিবেড়ের নতুন পুকুরে এবারই প্রথম মাছ হল। খুব বাড়ে। তাই ক'টা এনেছি। যাও নৃসিংহ—ভেতরে দিয়ে এসো।

মা তো অবাক! কোনদিন গাছের একটা ফল পাঠায় না—আজ একেবারে মাছ!

সোনামুচি বলল, আমাদের হয়তো কাল সন্ধ্যেবেলা মাছ চুরি করতে দেখেছে—

তাহলে তো নির্মল আমাদের বাড়ি বয়ে এসে গালাগাল করতো।

করেনি—কারণ কাকিমা আপনার ভাই যে এখন সারা জেলায় মিলিটারির বড় কর্তা। সেটা ভুলে যান কেন?

চারুবাবু চলে যেতেই বাবা ভেতরে এসে বলল, ওগো—তোমার ভাইকে একটু বলতে পারবে—চারুবাবুর তিন-তিনটে বাড়ি মিলিটারি রিকুইজিশন করেছে—অন্তত দু'খানা বাড়ি যদি মিলিটারির দখল থেকে রক্ষা পায়—

মা বলল, তাই নাকি! আমাদের ভাড়া বাকি পড়ায় কী অপমানটাই করে চারুবাবু—তা মনে আছে তোমার?

আহ্, চেঁচিয়া না! এখনো অনেক মাসের ভাড়া দেওয়া হয়নি। বড় কুটুম্বকে বলে যদি একটা উপকার করা যায় চারুবাবুর—

পৃথিবীটা এই সময় ঘটনার ঘনঘটায় টইটম্বুর। মামা মিলিটারি বলেই অনেকে আমাদের কাছে জানতে চায়—এ যুদ্ধে ইংরেজ জিতবে কিনা? সোলজার কত? কামান কত আছে? এইসব কোশ্চেন শুনে আমি তো চুপ করে থাকি। আমাদের জানার কথাও নয়। আমাদের চুপ করে থাকতে দেখে অন্যরা ভাবে—আমরা জানি, কিন্তু বলছি না। এ এক মস্ত ফ্যাসাদ।

ঠিক এসময় সারা শহরে রটে গেল—আমাদের বড়মামা জাপানীদের একজন বাঙালী স্পাইকে ধরে ফেলেছে। স্টিমারঘাটে। সারা শহর তো এই গুজবে ফেটে যাওয়ার যোগাড়। স্পাইয়ের গালে রবীন্দ্রনাথের মত দাড়ি।

দু'তিনদিন পরে বড়মামা নিজেই সেই স্পাইকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির, ডাকো মতিলালকে—

মতিলাল মানে আমাদের বাবা। বাবা সামনে আসতেই বড়মামা—দ্যাখো তো লোকটাকে চিনতে পারো কিনা। ও বলছে—ও নাকি তোমার আগের বিয়ের সুবাদে তোমারই শালা। তোমার খোঁজ নিতে এসে শহরে ঢুকেই মিলিটারির জালে ধরা পড়েছে—

বাবা বলল, সে তো অনেকদিন আগের কথা। আমার তো কিছুই মনে নেই—

হাতকড়া লাগানো লোকটি বাবার এ কথায় একদম কেঁদে ফেলল। চোখের জলে দাড়ি ভেসে যাচ্ছে। টাকমাথা ঘেমে যাচ্ছে। বুড়ো, রোগা, জাপানী স্পাই কাঁদতে কাঁদতেই বলল, সে কি মতিলাল! তুমি না চিনতে পারলে আমায় ওরা গুলি করে মেরে ফেলবে যে -

বাবার এপক্ষের শালা চেঁচিয়ে ধমকালো, চুপ করো। তোমার মত স্পাইকে নদীর জলে চুবিয়ে মারা হবে। গুলির দাম নেই? আমার ভগ্নীপতির শালা সাজবার চেষ্টা? মজা দেখাচ্ছি। জেনেশুনে একেবারে তৈরি হয়ে এসেছে!

লোকটা আরও জোরে কেঁদে উঠে বলল, আমি সৌরভিনীর সেজদা মতিলাল—

মা উঠে গিয়ে এক গ্লাস জল এনে দিল বুড়োকে, খেয়ে নিন তো।

জল তো জল—সেই জলই গোগ্রাসে গিলে ফেলে খালি গ্লাসটা জাপানী

স্পাই মায়ের হাতে তুলে দিল। দিয়ে আমাদের দেখিয়ে মাকে বলল, ওরা তো আমারও ভাগ্নে হতে পারতো ! সবই কপাল।

এতক্ষণে বাবা তার আগের বিয়ের শালাকে সনাক্ত করতে পারলো, ওই তো আপনার বাঁ কানের লতি নেই এতক্ষণ চুল-দাড়িতে ঢাকা ছিল বলে দেখতে পাইনি সেজদা—

আমাদের আগের পক্ষের মামা যেন কূলে উঠে এল, ডাকাতরা কেটে নিয়ে যায়—ভাগ্যিস তুমি চিনতে পারলে মতিলাল। নয়তো মিলিটারি—

বাবা অপ্রস্তুত গলায় বড়মামাকে দেখিয়ে বলল, ইনি মিলিটারি—আবার আমার এ পক্ষের বড় কুটুম্বও বটেন—

বড়মামা তার জাপানী স্পাইকে মুক্তি দিয়ে জড়িয়ে ধরলো। আমাদের আগের পক্ষের মামা বলল, দেখুন তো, বিভ্রান্তি থেকে কি এই নিগ্রহ !

মা ওঁকে দেখিয়ে আমাদের বলল, প্রণাম কর। তোমাদের আরেক মামা—

আমরা ঢিপ ঢিপ করে প্রণাম করলাম। কিন্তু আমাদের আগের পক্ষের মামার কান্না আর থামতেই চায় না। তখনো জানি না—ডাকাতরা কেন কান কেটে নিয়ে যায়। কোন্ অবস্থায় তারা কান কাটে। কেটে নেওয়া কান তাদের কোন্ কাজে লাগে।

জীবনের কোন্ জায়গাটা যে মহৎ ঘটনার জন্যে জায়গা ছেড়ে দেয়—কিংবা কোন্ জায়গাটা যে সম্ভাবনাময় তা আগের থেকে আগাম বোঝার উপায় নেই কোন। মহাভারতে কেউ সাইকেল চালায়নি। সেখানে সব রথের চাকা। কিন্তু প্রেম বোধহয় সর্বযুগে একই সাইকেলে ঘোরে-ফেরে।

নতুন হেডস্যার এলেন বোলপুর থেকে। হেডস্যারের কোয়ার্টার স্কুল মাঠের ভেতরেই। বারান্দায় বসে স্যার খাতা দেখেন। ঘরে বসে অ্যানুয়ালের কোশ্চেন তৈরি করেন। হেডস্যারের বউ বারান্দায় আচারের বয়ম শুকোতে দেন। স্যারের তিন মেয়ে অরগান বাজিয়ে গান গায়। ইংরিজি কবিতা রিসাইটেশন্ করে সন্ধ্যেবেলা। মেজো জন—রেণু আচার খায় বেশ স্টাইলে। ডান হাতের তালুতে আচার রেখে বাঁ হাতের একটা আঙুল ইংরিজি এস হরফের কায়দায় সেই আচারে ডুবিয়ে টাকরায় ঠেকায়। সে এক দেখার দৃশ্য। না-জানি আচার খাওয়ার এই কায়দা কোন্ শহর থেকে শিখে এসেছে !

শুনলাম, এই রেণুর সঙ্গে আমাদের ওপরের ক্লাসের পল্টুদার খুব প্রেম। নদীর ঘাটে ওদের দু'জনকে সন্ধ্যে-সন্ধ্যে দেখাও গেছে নাকি। পল্টুদা স্কুলটিমের ফুটবলে সেন্টার ফরোয়ার্ড। ইংলিশ লেটার রাইটিংয়ে হেডুর হাতেই দশে সাত পেয়েছে। স্কুল-স্পোর্টসে লংজাম্প লাফায় উনিশ ফুট। পল্টুদা না হলে কার গলায় মালা দেবে রেণু ?

আমি ফুটবলে লাইনসম্যান। স্পোর্টসে গো অ্যাজ ইউ লাইকে বাদাম ভাজাওয়ালা সাজলে সবাই বলে পাগল সেজেছি। পাগল সাজলে বলে ফেরিওয়ালা। জানুয়ারির মাঝামাঝি থার্ড চান্সে ক্লাস প্রোমোশন পাই। উইথ ওয়ার্নিং। তাছাড়া হাঁটু আর কনুইতে একরকমের পাঁচড়া থাকে—যা কিনা হাত পা ভাঁজ করলেই ফেটে গিয়ে কাঁচা হয়ে যায়—কখনো শুকোয় না।

এই রকম আমি'র পক্ষে রেণুর দিকে হাত বাড়ানো মানে চাঁদে হাত বাড়ানো।

তবু আমি মনে মনে স্থির করলাম—আমি রেণুর প্রেমে পড়েছি। যদিও রেণুর সঙ্গে আমি কোনদিন কথা বলিনি। রেণুও আলাদা করে আমার দিকে তাকায়নি কখনো।

প্রেমে তো পড়েছি। কিন্তু না জানি খেলা—না পারি পড়া। তাছাড়া চেহারাটি তখন গো অ্যাজ ইউ লাইকের না-পাগল না-ক্যানভাসার কায়দার। পোশাক বলতে দাদার সাইজের ইজের—যার ইলাসটিক আমার বুকে উঠে আসে। গায়ে সেলাইকলে ঢাকনা পরাবার মার্কিন কাপড়ের নিমা। জুতো, সাবান কিংবা নারকেল তেল তখনো আমরা ব্যবহার করিনি। গায়ে সবসময় ঘাস, কলাগাছ আর সর্ষে তেলের গন্ধ। কেননা সবসময় ঘাসে গড়াগড়ি খাই, কলাগাছের ভেলায় পুকুরে ভাসি। বাবার আদায় থেকে আনা সর্ষের তেল পাইনট করে মাখি।

তা আমার দিকে তাকাবে কেন রেণু! একই ক্লাস আমাদের। ও পড়ে গার্লস স্কুলে। আমি তাকাই। তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হয়—ফুল? না প্রজাপতি?

আসলে ওর গায়ের ফ্রকে আঁকা লতাপাতার ডিজাইনকে মনে হোত—ওরই গায়ের কোন জিনিস। কাপড়ে আঁকা নয়। ওর গায়ে ফুটে উঠেছে যেন গাছ-পালার এক আশ্চর্য বাগান।

কিন্তু কথা আর বলা হয় না। আমি নিজেও তখন তাকাবার মত জিনিস নয়। পল্টুদা দিব্যি গোল দেয়। লংজাম্প দেয়। প্রমোশন পায়। আবার সঞ্চয়িতা থেকে রিসাইট করে। একদিন পাড়ার কলেরগানে গান শুনলাম—জীবনে যাবে তুমি দাওনি মালা—

গানটা আমার নিত্যসঙ্গী হল। গলায় তুলে নিলাম। নির্জন জায়গা পেলেই একা একা গাই।

কেন গাই জানি না। এখনো পরম আনন্দের ভেতর অন্যমনস্ক আমার গলায় এ গান চলে আসে। যেন ওটা কোন গভীর আনন্দের গান! প্রেমই বা কি! ব্যর্থতাই বা কি!! কোনোটাই আমার সে বয়সে বোঝার কথা নয়।

বরং আন্দাজ করার বয়স। সেই আন্দাজেই বুঝতাম—পল্টুদা গোল করে—লংজাম্প দিয়ে, চিউইংগাম চিবিয়ে সবসময় সে হাসি হাসি মুখে ভেসে বেড়ায়—তার কারণ রেণু যে তার একার। আগুনে হাত পুড়ে যায়। হাত-পা না দাপালে জলে তলিয়ে যেতে হয়। এসব বলে দেওয়ার কোন দরকার পড়ে না।

যেমন জানি মানুষের আদি উল্লাস প্রায় নরহত্যা থেকেই উঠে এসেছিল। পাখি গাইতে পারে না। পারে শুধু কয়েক রকমের শব্দ করতে। গাইতে পারে মানুষ। প্রহর বুঝে সে গায়। আবার এই মানুষেরই শৈশব সবচেয়ে বেশিদিনের। পাঁচ-পাঁচটা বছর। অন্য কোন প্রাণীর শৈশব এত বেশিদিনের নয়। সেইজন্য মানুষ পাঁচ বছর মায়ের তাঁবে থেকে নারীর সামনে হীনমন্যতায় ভোগে। সেটা কাটিয়ে উঠতে সে তাই আত্মসমর্পণ করে—কিংবা অহেতুক দাপায়।

প্রেমে সাইকেলের যে একটা ভূমিকা আছে তা পল্টুদাকে দেখে বুঝতে পারি। যখন তখন পল্টুদা সাইকেলে পাঁইপাঁই ছুটতো। এঁকেবেঁকে। যেন ওর জীবনের সব আনন্দ দুই চাকার স্পোকের সঙ্গে ঘুরছে।

সন্ধ্যের দিকে রেণু তার এক বান্ধবীকে নিয়ে অন্ধবার পিচরাস্তা ধরে ফরেস্ট অফিসটা পাক খেয়ে বাড়ি ফিরে আসতো। তখন সারা শহরে সবে সন্ধ্যে নামতো। পিচরাস্তার গায়েই পুরু ঘাসে ঢাকা জমি মাঠ।

সন্ধ্যে-সন্ধ্যে বিজয় মোদকের দোকান থেকে একখানা সাইকেল ভাড়া করে সিটে বসলাম। রেণুরা যেই ফরেস্ট অফিসের বাঁকটায় বাঁক নেবে—সেই জায়গায় সাইকেলে কাৎ হয়ে মোড় ঘোরার সময় ইংরাজিতে বললাম, আই লাভ ইউ—

পরিণাম?

পপাত! চাকা স্কিড্ করে আমি সাইকেলসুদ্ধ মাটিতে। বান্ধবীকে নিয়ে যেন হাসির কাচের গ্লাস ভেঙে তার টুকরোগুলো মাঠে ছড়িয়ে দিয়ে রেণু চলে গেল। অন্ধকারে সেদিন আমায় চিনতে পারেনি রেণু।

রেণুর সঙ্গে কথা বলতে না পেরে এই সময়টায় আমি গাছপালার নির্জন নিঃশ্বাস শুনতে শিখি। এখন আমার কাছে একটা টেবিল কিংবা ঘটিও জ্যান্ত জিনিস। আমার ঘরে গেস্ট থাকলে এদের সঙ্গে টেবিলচেয়ারকেও হিসেবে ধরি। ওদেরও একটা অবয়ব, অস্তিত্ব, ঘনত্ব আছে। ইচ্ছে করে—ওদের জন্যে চা দিতে বলি।

পুকুরে একরকমের ডানকুনি মাছ হয় গরমকালে। তারা আসে। আবার উঠে যায়। আমরা ক'ভাই ডানকুনি মাছের মতই বাড়ছি। কোন পরোয়া নেই। কটা থাকলো—কটা গেল—কেউ খোঁজও করে না। আমাদের সবচেয়ে ছোট ভাই টাপু সবার ছোট বলে ওর জন্যে আলাদা কোন বিশেষ যত্ন ছিল না। ও ফড়িং ধরে হা-হা করে হাসতো। হাত কেটে ফেলে যন্ত্রণায় কাঁদতো না। অন্যরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওর যে আঙুল ব্যান্ডেজ করছে—সেটাই ও মন দিয়ে দেখতো। যেন এটা দেখার জন্যেই টাপু হাত কেটেছে।

এই টাপুকে একদিন উমা পুকুরঘাটে ডেকে নিয়ে গেল। বিকেলের দিকে কেউ পুকুরে থাকে না। টাপু লাফাতে লাফাতে গিয়ে বলল, কিরে দিদি? উমা বলল, কাছে আয়।

টাপু কাছে যেতেই উমা তাকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে দিল। টাপু ডুবে যাচ্ছে। উমা হাত ধুয়ে দিব্যি মাঠে খেলতে চলে গেল!

টাপুর আঙুলের ডগা তখন শুধু দেখা যাচ্ছে। ঘাটের কাছে কাজের লোক মধু ছিল। সে ঝাঁপ দিয়ে টাপুকে তুলে আনলো। নয়তো টাপু সেবার মরে ভেসে উঠতো। জলে ডুবে যাওয়া জিনিসটা যে কি উমা তা জানতো না।

আরেকবার তো উমা দেশলাইকাঠি জেলে টাপুকে ডাকলো, আয় ছোটভাই—কাছে আয়। টাপু কাছে যেতেই উমা টাপুর চোখের পিছি পুড়িয়ে দেয়। চোখও পুড়ে যেতে পারতো। আসলে উমা আগুন কি জিনিস তাই জানতো না। টাপু তো জানতোই না। ঠিক এই সময়টায় ভৈরবে ডুব দিতে গিয়ে মৃত্যুকে চিনি। খানিক বাতাসের জন্য সে কি অসহ্য খাবি খাওয়া!

সাঁতার শিখেছিলাম বোধহয় পাঁচ-ছ'বছর বয়সেই। ভৈরব যে একটা নদী তা তাকে পাত্তাই দিতাম না কোনদিন। তার বুকে স্টিমার ভাসে। ইলিশের নৌকো জাল ফেলে। শুশুক ভুস্ করে ওঠে। পাটবোঝাই বজরা এসে থাক দিয়ে ভিড়তে ভিড়তে শেষ নৌকোটা মাঝনদীতে পৌঁছে যায়। তাদের বিশাল বিশাল নোঙর গলুইয়ের নিচেই গুটিয়ে ঝোলানো থাকে।

একদিন স্কুলে যাবার আগে নাইতে নেমে আর উঠি না। পাড়ে দেখি দাদা দাঁড়িয়ে ডাকছে—উঠে আয়। আজ তোর পিঠে হাতের সুখ করবো।

দাদার হাত মানে ডাণ্ডা।

দিলাম ডুব। এক ডুবে দূরে গিয়ে ভেসে উঠবো। ডুবসাঁতারে নিজের দমের উপর খুব বিশ্বাস। মাথার ওপর শ্যাওলা মাখানো বড় বড় বজরার খোল বা তলপেট। শান্ত, স্থির। যতই ভেসে ওঠার চেষ্টা করি—মাথা গিয়ে ঠেকে এই তলপেটে। দম ফুরিয়ে এসেছে, কিন্তু ভেসে ওঠার জায়গা পাই না! বুক ছিঁড়ে যাচ্ছে অল্প একটু বাতাসের জন্যে। যতবারই ভেসে উঠতে যাই—ততবারই বজরার তলায় গিয়ে ঠক করে মাথা ঠেকে।

বাবা গো! এ কি সর্বনাশ! এলোপাথাড়ি ভেসে উঠতে চাইছি আর মাথা গিয়ে ঠেকছে বজরার নিচে। পা দু'খানা বেঁকে যাচ্ছে। আর জল কাটতে পারছি না।

যখন সব আশা ছেড়ে দিয়েছি—তখন দেখি বিশাল এক বঁড়শির পাশ দিয়ে চোখসুদ্ধ আমার মাথাটা ওপরের বাতাসে ভেসে উঠলো। ওটা বড়শি ছিল না, বিরাট এক নোঙরের একটা আঙটা। আর একটু দেরি হলে আমি নির্ঘাৎ ভারি হয়ে তলিয়ে যেতাম।

এই সময় অপমানকেও একটু একটু করে চিনতে শিখি। বই মলাট দিচ্ছি। রিডিং দিয়ে মুখস্থ করছি। রুটিন করে পড়ি। তবুও খারাপ নম্বর পাই।

কেন বুঝি না। খেলার মাঠের চেয়ে জ্যামিতির বই বড় হয়ে গেল। পরীক্ষায় নম্বর ভাল না হলে সবাই বলে খারাপ রেজাল্ট। আস্তে আস্তে লাস্ট বেঞ্চে চলে যাচ্ছি। রেণুও সুন্দর। পড়ার বইগুলোও সুন্দর হয়ে গেল। কেননা তাদের মানে বুঝি না।

অথচ ক্লাসের ফার্স্টবেঞ্চগুলো তখন পারসিং করছে। নমিনেটিভ অ্যাবসলিউট আর জিরান্ডিয়াল ইনফিনিটের ভেতর পার্থক্যটা অনেকেই স্যারকে ফটাফট বলে দিচ্ছে। আমি পারছি না। অ্যানুয়াল পরীক্ষাও ধাঁ ধাঁ করে এগিয়ে আসছে।

এমন সময় সেন্ট জোসেফ স্কুল থেকে কুমুদবন্ধুবাবু নামে একজন টিচার আমাদের স্কুলে চলে এলেন। তিনি একদিন সন্ধ্যার আধো অন্ধকারে স্কুল মাঠেই আমায় ফাঁকায় ফাঁকায় বললেন, ফার্স্ট হতে চাস?

চমকে গেলাম—কি বলছেন স্যার? ফার্স্ট চান্সে যদি পাশ করতে পারি!

সে তো পারবিই। ফার্স্ট হবি কিনা ঠিক কর আগে—

আনন্দে কেঁপে উঠলাম, সে কি সম্ভব স্যার?

অসম্ভব কিসের! হলেই হয়! বলেই কুমুদ স্যার হাঁটতে লাগলেন। আমি পিছু নিলাম। স্যার হাঁটতে হাঁটতে স্কুলমাঠ পার হয়ে পুলিশ লাইনের সামনে পিচরাস্তায় উঠলেন। রিক্সা-সাইকেল দাঁড় করিয়ে তাতে উঠে বসবেন—এমন সময় বললেন, শ'দুই টাকা যোগাড় কর। যেখানে কোশ্চেন ছাপা হয়—সেখানকার কম্পোজিটরদের দিতে হবে। নয়তো কোশ্চেন লিক হবে কি করে?

দুশো টাকা? কোথায় ছাপা হয় স্যার?

সমুদ্রে—

কি রকম করে?

বাঃ! যেমন করে ছাপা হয় সেই ভাবে। ভাসমান জাহাজের ভেতর প্রেস বসানো থাকে।

আপনি সেখানে যাবেন কি করে স্যার?

আমার শালা ছুটিতে এসেছে। সেই তো ওখানকার হেড কম্পোজিটর। কাল সন্ধ্যের লঞ্চে চলে যাবে। পারিস তো দ্যাখ না। বেশি না তো। মোটে দুশো।

দুশো পারবো না স্যার। তার চেয়ে পড়াশুনো যাতে মুখস্থ থাকে এমন একটা পথ বাৎলে দিন স্যার। যা পড়ি সব ভুলে যাই।

ও, তোর বেভ্ভুল রোগ হয়েছে।

কী রোগ স্যার?

বেবাক ভুলে যাওয়ার রোগ। শর্টে বেভ্ভুল। তা দশ টাকা নিয়ে আসিস। এক পুরিয়া খাইয়ে দেব। খাবার পর দেখবি সব মনে পড়ে যাচ্ছে।

কিসের পুরিয়া?

মুক্তাভস্ম। মুক্তাভস্মের পুরিয়া খেয়ে দেখেছিস কখনো?

না স্যার।

দশ টাকা নিয়ে কাল ব্রাহ্মমুহূর্তে চলে আয়।

সন্ধ্যেবেলা সারা শহরে ব্ল্যাকআউটের ঠুলি। সবাই পড়াশুনো করছে। আমি বেভ্ভুল রোগের রুগী। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি। কোত্থেকে দশ টাকা পাওয়া যায়। পেলে এক পুরিয়া মুক্তাভস্ম জুটবে। শহরের রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরে আসছি আর ভাবছি, কাল ব্রাহ্মমুহূর্তের আগে দশ টাকা কোথায় পাই? বাড়ির কাছাকাছি এসে মনে হল—ব্রাহ্মমুহূর্তটা ঠিক কোন সময়? বিকেলে স্কুল-ছুটির পর? না—সকালে স্কুল বসবার ঠিক আগে? ব্রাহ্মমুহূর্তটাই তো জানা হয়নি।

ঠিক এইভাবে কত জিনিসই যে জানা হয়নি। একদিন সুষমাদি হাসতে হাসতে বলেছিল, জানিস খোকন, একটা কথাই তোকে বলা হয়নি।

সেই না-বলা কথাটা আজও জানা হয়নি। এমনি অনেক কিছু জানার পড়ে আছে। গ্লোবের গায়ে আঁকা দ্রাঘিমাংশগুলো গ্লোবের টাকে যেখানটায় গিয়ে মেশে—সেখানটায় ঠিক কতটা শীত? ঘিলুর স্মৃতিশক্তির ক্ষমতা ঠিক কতটা? এরকম কত কি! এইভাবেই জীবনের নানান জায়গায় ঘুপচিতে কত অজানা পড়ে আছে। কেউ কেন খারাপ ব্যবহার করে—তা তো অনেক সময়েই রহস্য হয়ে পড়ে থাকে—শেষ পর্যন্ত জানা হয় না। কারণ এসব তো জিজ্ঞাসা করা যায় না। এইভাবেই আমার আর এক পুরিয়া মুক্তাভস্ম খাওয়া হয়নি।

বাড়ির সামনে এই সময় ভবেশবাবু নামে এক ভদ্রলোক থাকতেন। তিনি আগে ভদ্রলোক ছিলেন। যুদ্ধের দরুন ঠিকাদার হয়ে শেষে অভদ্রলোক হয়ে পড়েন। ততটা—কিংবা কতটা অভদ্র—তা আমি জানতাম না। বুঝতামও না। ফতুয়া গায়ে ধুতিপরা মানুষটি পঞ্চাশ-বাহান্ন হতে পারে। দিনের বেলায় বারান্দায় বসে আমাদের সঙ্গে—আমার আর টোটোর সঙ্গে ভাল ভাল কথা বলতো। কিন্তু সন্ধ্যের পর ভবেশবাবু বেচাল হয়ে পড়তো। তখন আমাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে আবছা ধোঁয়াটে কথাবার্তা বলতো।

লোকটার কোন বউ ছিল না। ছিল দুই ভাগ্নে। তারা অসুরের মত খাটতো। তাদের বউয়েরা খুব সুন্দরী ছিল। তারা খুব সুন্দর সন্ধ্যের চা খেতো। আমি খুব অল্প বয়স থেকেই নারীর শাড়ির পাড়ের রূপ, পায়ের আলতার আভাস, কলাগাছের মাঝের পাতার রোদ শুষে নেওয়ার মতই নিজের ভেতরে শুষে নিতাম। ওদের বা নারী বলি কেন! ওঁরা ছিলেন—আমার মা, বউদি, দিদি, কাকীমা—আর অজানা পথচলতি শাড়িপরা কিছু মানবী। নিজেদের খেলার সাথী—যারা কিশোরী হয়ে শাড়ি ধরলো—তারাও সেই সঙ্গে ওদের চোখের আলো, বেণীর দাপট. খোলাচুলের ভেতরকার নিশীথ কী করে যে মনের ভেতরে রূপের স্বাদ যোগায় তা বুঝতে পারি না।

কোন স্কুল-কলেজে নারীর র‌ূপের আস্বাদ নিয়ে কোন সিলেবাস নেই। আছে কতকগ‌ুলো চৌবাচ্চার অংক, ভাষা ভুলে যাওয়ার ব্যাকরণ। নারীর জন্যেই বোধহয় আমাদের জীবনটাই কলেজ। এমন কোশ্চেন পরীক্ষায় থাকতে পারতো—জীবনে কোন্ নারীকে দেখে তোমার ব‌ুক কাঁপে? উদাহরণ সমেত ঝরঝরে বাংলায় লেখো।

কাউকে চোখে ভাল লাগলে—মনে ভাল লাগলে—স‌ুন্দর লাগলে সংস্কার বশে আমরা ভেবে এসেছি—না-জানি কি গভীর পাপ—না-জানি কত যোজন গর্হিত। কেউ তো বলে দেয়নি—এটাই স্বাভাবিক। নারীর র‌ূপ চোখে ধরলে আর তা হৃদয়ঙ্গমের ক্লাস থাকলে পাড়ার মোড়ে বসে ছেলেছোকরারা টিটকিরি দিত না। এটা ব‌ুঝতেই সময় চলে গেল। এখন—এখন কেন? তাও তো বিশ্ পঁচিশ বছর হল প‌ুর‌ুষের হাসিতে, পেশীতে, স্বপ্নে আমি রং-রস দেখতে পাই। ব‌ুঝতে পারি। আমার শরীরে চলে যায়।

তো ভবেশবাব‌ু বড়দার চোখে পড়লো। বড়দা কলকাতা থেকে ক'দিনের জন্যে এসেছিল। এসেই বলল, বাঁশ কাটতে হবে। মেজদা ঢাকায়। আমি, টোটো, তন‌ুদা, বড়দা কয়েকখানা তল্লা বাঁশ কেটে লম্বা টুকরো করলাম। বড়দার অর্ডারে। বেশ হাতে ধরা যায়। সন্ধ্যেবেলা ভবেশবাব‌ু বারান্দায় বসে আবছাভাবে কথাবার্তা শ‌ুর‌ু করেছিল সবে। আমাদের বাড়ির দিকে তাকিয়ে।

আকাশের চাঁদ ব্ল্যাক-আউট মানে নি। মানে নি ভৈরব আর র‌ূপসার ব‌ুকের ওপরকার বাতাস। সারা শহরটার গায়ের ওপর দিয়ে মোলায়েম করে বয়ে যাচ্ছিল। ঘরে ঘরে গেরস্থ। লাল কেরোসিনের প্রায়ান্ধ হেরিকেন। পথে পথে এ. আর. পি. মিলিটারি। জেলখানায় নির্জন রাতে 'বন্দেমাতরম্'। শতাব্দীর বয়স ৪২/৪৩ মোটে। দারোগা মানেই দৈত্য বা দ‌ুর্ব‌ৃত্ত। স্বাধীন শ‌ুধ‌ু চাঁদের আলো, নদীর বাতাস আর যার যার নিজের মনের স্বপ্ন।

ভবেশবাব‌ু বেচাল হতেই বড়দা তাকে বাঁশ হাতে তেড়ে গেল। পেছন পেছন তন‌ুদা, আমি। টোটো আর টাপ‌ুও খানিকটা। বড়দা চেঁচাচ্ছে—তবে রে! রোজ রাতে মশারিতে টর্চ ফেলা? দেখাচ্ছি মজা।

ভবেশবাব‌ুর কাছা খ‌ুলে গেছে। ধর্মসভা, কবরখানা রোড, ডাকবাংলোর মোড় দিয়ে লোকটা দৌড়োচ্ছে। আর পেছন পেছন আমরা চার ভাই। মাঝে মাঝে বড়দার গলা—তবে রে! আর কোনদিন মশারিতে টর্চের ফোকাস মারবি?

মা আমাদের নিয়ে মশারির ভেতর শ‌ুয়ে থাকতেন।

না, কক্ষনো না।—দৌড়োচ্ছে ভবেশ আর ফিরে বলছে, কক্ষনো না। কক্ষনো—

ততক্ষণে ভবেশবাব‌ুর সান্ধ্য মদের নেশা ছ‌ুটে গেছে।

কেন যে এই বাঁশ নিয়ে ক'ভাই মিলে তেড়ে যাওয়া—তা সেদিন জানতাম না।

ভবেশবাবুকে ভবভোলাই লাগতো। মশারিতে টর্চ ফেলা—কার মশারিতে? সে সব কথা বড় হয়ে মাথার ভেতর নেড়েচেড়ে বুঝতে পেরেছি—যুদ্ধ এসে সবকিছু ঢিলেঢালা করে দেওয়ার শুরু। আকাশে জাপানী প্লেন। নিচে ফুলস্কেপ কাগজের দিস্তে এক লাফে পাঁচ আনা।

সারা পাড়ায় যেখানে যত মাথা ধরে ওঠা পিসতুতো ভাই, মাসতুতো দাদা, খুড়তুতো ভাই, জ্যাঠতুতো দাদা ছিল—যারা কিনা বাড়িতে বকাঝকা খেয়ে টিউশনি খুঁজতে বেরোতো আর সিরাজদৌল্লা'য় নির্মলেন্দু লাহিড়ির ডায়লগ—জীবনে অনেক নারী চেয়েছি লুৎফা—পেয়েছি অনেক—বলতে বলতে ফিরে আসতো—তারা ঝেঁটিয়ে সবাই যুদ্ধে চলে গেল—তা বছর দুই তিন হল।

জ্যাঠতুতো দাদা কানাইদা, বাবার বন্ধু ভাগ্যধরবাবুর গেঞ্জির কলে সুতোর লাটাই চালাতো। সেই কানুদা মেসোপটেমিয়ায় গিয়ে মন্টগোমেরির এইটথ্ আর্মিতে জয়েন করলো। যাবার সময় কান ঝোলা কলার লাগানো ওভারকোট গায়ে ছবি তুলে গেল আমাদের সঙ্গে। কানুদা এইটথ্ আর্মির সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে রোমে গিয়ে থেমেছিল। মুসোলিনি যেদিন সাবাড় হল—সেদিনও কানুদা রোমে। অকুপেশন আর্মির গোলন্দাজ হিসেবে কানুদা রোমের শহরতলীর এক ইটালিয়ান গেরস্থবাড়িতে মাস চারেক ছিল। ফিরে কানুদা আমাদের ইটালিয়ান ভাষায় বলেছিল—ভোই কামেস্তাতে বেনারিপোসে।

অনেককাল পরে সানফ্রান্সিসকোর এক হোটেল থেকে দুপুরবেলা নিউইয়র্কের প্লেন ধরতে যাচ্ছি। ট্যাকসির জানলায় বসে দেখি—দোকানের গায়ে সাইনবোর্ডে লেখা—বেনারিপোসে অ্যাভেনু। দালি সিটি।

সেই কানুদা যুদ্ধ থেকে ফিরে ফোর্ট উইলিয়মে হাবিলদার ক্লার্কের চাকরি করে রিটায়ার করেন। সবসময় নেভিকাট সিগারেট খেতেন। একটার পর একটা।

অত সিগারেট খাও কেন? জানতে চাওয়াতে কানুদা বলেছিল, গোলন্দাজ ছিলাম তো, কান নষ্ট হয়ে গেছে আওয়াজে। তাই সিগারেট খেয়ে কানের তালা খুলি।

যারা যুদ্ধে যেতে পারেনি তারা ম্যালেরিয়ায় ভুগে অতিরিক্ত মেফাক্রিন বড়ি খেয়ে পাগল হয়ে গেল। এদের অনেকেই ব্ল্যাকআউটের রাতে চারুবাবুদের পুকুরে দাপিয়ে সাঁতার কাটতো। তাদের আত্মীয়রা হ্যারিকেন হাতে ঘাটে দাঁড়িয়ে। চান করে যদি পাগলের মাথা ঠাণ্ডা হয়।

পিসতুতো দাদা লাটুদা কনেস্টবল হয়ে বাঁচি চলে গেল। অক্রুরদার চেহারা সুন্দর ছিল। স্টারে হল গেটকিপার। ভুলুদা মিলিটারির মোটর ভেহিকেলের সঙ্গে সিঙ্গাপুরে চলে যায়। সিঙ্গাপুরের পতনের পর ভুলুদা ফিরে এল। একটুর জন্যে আই. এন. এ.এর হাতে পড়েনি। ফিরে এসে ট্রাংক খুললো। কোটি কোটি টাকার কারেন্সি নোট বেরিয়ে এল ট্রাংক থেকে। সবই জাপানী। তার কিছুদিন

পরেই যুদ্ধফেরৎ এইসব একশো টাকার নোট বাজারে এক আনায় পাওয়া যেতে লাগল।

এইসময় পোস্ট অফিসের ছাদে, করোনেশান হলের ছাদে সাইরেন বসলো। কুমুদ স্যারকে মুক্তাভস্মের পুরিয়ার জন্য দশ টাকা দিতে পারি নি—তাতে কি! আশা ছাড়িনি। পড়া মনে রাখার জন্যে দরকারী স্মৃতিশক্তি ফিরে না পাই—লিক করা কোশ্চেন তো যোগাড় করতে পারি। ছোটো নৌকো ছেড়ে বড় নৌকোর দিকে বড় আশায় ঝাঁপ দিয়েছি।

দুশো টাকা যোগাড় হলেই কোশ্চেন হাতে এসে যাবে।

তাই প্রথমেই সন্ধ্যেবেলা বড় বড় অফিসের বারান্দায় গিয়ে হাজির হতে লাগলাম। যেমন জজ-কোর্টের বারান্দা, জেলাস্কুলের বারান্দা, দৌলতপুর কলেজের সায়ান্স থিয়েটারের বারান্দা। যেখানে যত ড্রুম ঝোলে সব পেড়ে ফেলি। খদ্দের অনুকূল মিস্ত্রির মুদিখানার হরিদা। ড্রুম পিছু চার আনা। এভাবে এগারো টাকা অব্দি এগিয়ে বুঝলাম—কোনদিনই দুশো টাকায় পেঁছতে পারবো না।

ফুলস্কেপ কাগজ, ছাতা, মার্কিন কাপড়, কেরোসিন, চাল, চিনি, ধুতি, পাঁউরুটি—সবই রেশনে চলে আসায় সবই প্রায় উধাও হয়ে গেল। পাঁউরুটির বদলে আমরা ডিউস্লিপ পাচ্ছিলাম। এর সঙ্গে সঙ্গেই ইংরাজির নোটবইয়েরও ডিউস্লিপ চালু হয়ে গেল।

সেবারে দুর্গাপুজোয় প্রথম দেখলাম—এক এক দেবীর—এক এক দেবের এক এক চালি। এর আগে মা দুর্গা এক চালিতেই সব ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে মণ্ডপে দাঁড়াতেন। আর দেখলাম—ছোট একটা কলেরগান ইলেকট্রিক তার দিয়ে জুড়ে মাইক্রোফোন নামে একটা বাক্সের ভেতর গলিয়ে দিলে সে গান বহুদূর অব্দি শোনা যায়! পুজোর পরেই হাতে-লেখা পোস্টারে লেখা দেখলাম—যত্নসহকারে বাড়ি গিয়া রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখাই।

এতদিন যেন এই সঙ্গীত যে যার বাড়িতে গাইতো। তা এবারে রবীন্দ্রসঙ্গীত হয়ে সবার সামনে শেখার জিনিস হয়ে উঠে এল। এর আগে এভাবে দেখিনি। যেমন এসেছিল—ওই একই সময়ে—মাইনের সঙ্গে ডি. এ.। আর বড় হয়ে অনেক পরে পিছিয়ে গিয়ে হিসেব করে দেখেছি—ঠিক ওই সময়টাতেই এসেছিল আরেকটা নতুন জিনিস—পাবলিক রিলেশন—বাংলায় যার নাম জনসংযোগ। সিধে ভাষায় —আমড়াগাছি। অনেকটা আর কি—দাদা, আমি হাটে এয়েছি! দাদা হাটে নিয়ে যেতে চায়নি। লুকিয়ে হাটে এসে দাদার সামনে পড়ে গিয়ে চক্ষুলজ্জায় বলে বসা—দাদা—আমি হাটে এয়েছি!

রেণু সন্ধ্যেবেলা নদীর দিকে জেলখানার ঘাটে বেড়াতে যায়। পাশ দিয়ে বাই বাই করে সাইকেল চালিয়ে চলে যাই। কিছু বলতে পারি না। ক্লাসে

পড়াশ্নোর লবডংকা দশা। কুমুদ স্যারের দুশো টাকাও যোগাড় করা যায় নি। ক্লাস আলো করে বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থাকি। হাফপ্যান্টের বাইরে পা দুটো লিকলিক করে। স্পোর্টসে নেই। ফুটবলে নেই।

একটানা তিনদিন বৃষ্টির ভেতর কাপড় কাচার বড় কড়াইতে ডাল রান্না হয়। ভাতের সঙ্গে সেই ডাল আর বড়া ভাজা। বড়মামা বদলি হয়ে যাওয়ায় চারু-বাবুরা আর আমাদের পোঁছে না।

স্কুলে ঢোকার মুখে একদিন দেখি হায়দার আলি, সয়েদুল ইসলাম, আসফাকুল, আনোয়ারদা—সবাই আলাদা লাইন করে স্কুলে ঢুকছে। কি ব্যাপার? ওরা বলল, আমরা তো পরশু থেকে মুসলিম লিগ হয়ে গেছি।

একটা বাংলা খবরের কাগজ আসতে লাগল কলকাতা থেকে। তাতে দন্ত্য স-এর জায়গায় সর্বত্র ছ বসানো। মুসলিম লিগের বাংলাও আলাদা।

এতদিনের ক্লাসফ্রেন্ডরা সবাই আলাদা লাইন করে স্কুলে ঢুকতে লাগল।

বর্ষার পর শীত এল। রান্নাঘরের পেছনে খিড়কির দরজায় বেশি রাতে ধাক্কা। মা দরজা খুললো। বাইরে আদাড়ে ছাইগাদায় শুধু অন্ধ হুলো বেড়াল অভিমানে ছাই মেখে পড়ে আছে। যদি আজ রাতে মৃত্যু আসে। সে গেরস্থর লাথি-ঝাঁটা অনাদরের সমালোচনা না করে আদাড় বেছে নিয়েছে। মাথার ওপর হিম আকাশ আর অন্ধকার।

এই অবস্থায় কাপড়ে মাথা মুখ ঢেকে একজন আধবুড়ো দাঁড়িয়ে। হাতে ফাটাচটা কলাইথালা। কোনক্রমে ঠোঁট খুলে বলল, মা ঠাইরেন—দুটো ভাত—

বাবা তখনো কোর্টের কাগজ দেখছিল। চোখে চশমা। গলায় কম্ফর্টার। সেটা মাথায় পেঁচিয়ে বাবা বেরিয়ে এল। হাতে হ্যারিকেন। কী নাম তোমার?

জী?

কী নাম?

আবদুল খালেক—

তাহলে নাজিমুদ্দিন সাহেবের কাছে যাও—

মা তাকে যেতে দিল না। শেষে শুধু মায়েরই বোধহয় খাওয়া বাকি ছিল। থালায় বেড়ে রাখা ভাত মা তার কলাইথালায় ঢেলে দিল।

বাবা গজগজ করতে করতে ভেতরে চলে এল। তখন তো জানি না বর্ণহিন্দু বাবার বড় দুই ছেলে চাকরির পরীক্ষায় পাশ দিয়েও চাকরি পায়নি। কারণ কোটা প্রথা। ভাল নম্বর তুলেও চাকরির বাজারে বড়দা মেজদা বেকার। কতকাল আর বাবা গন্ধমাদন বইবে।

দন্ত্যস ছ হয়ে যাচ্ছিল। স্কুলে আলাদা লাইন! চাকরিতে কোটা। খেলার মাঠের জনসভায় নারায়ে তকদির। জেলখানার পাঁচিলের ওপাশে বন্দেমাতরম। সিঙ্গাপুর অফিস থেকে ভুলু দাদা ফিরে আসছে। সন্ধ্যের দিকে জাপানকে

রুখতে হবে—শ্লোগান দিতে দিতে ছোট্ট মিছিল মিলিয়ে যায়। একদিন তো সন্ধ্যে বেলা ধর্মসভার কাছাকাছি ডাকবাংলোর মোড়ে পার্টি অফিসের সামনের বারান্দা বালতি বালতি জল দিয়ে ধোয়া হচ্ছে। রক্তের দাগ তবু থেকে গেল। পরে শুনলাম—তেভাগার জন্যে পুলিশের গুলিতে এফোঁড় ওফোঁড় দুই ডেডবডি আনা হয়েছিল।

কংগ্রেস, মুসলিম লিগ, ফরোয়ার্ড ব্লক শুনেছি। এবার শুনলাম—তেভাগা।

সেসময় ভুলুদা দেশপ্রেমের একটা গল্প বলেছিল। ভুলুদা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মোটর মেকানিক ছিল। সিঙ্গাপুরে আর্মি লরি খারাপ হলে তার নিচে শুয়ে পড়ে সেসব সারাতো। রোজই ভুলুদারা দেখতো—ওরা যখন শুয়ে পড়ে লরি সারায়—তখন একদল ইংরেজ টমি ওদের সামনে ল্যাংটা হয়ে দল বেঁধে চান করতে যায়। যেন ভুলুদারা মানুষই নয়। দেখুকগে।

ভুলুদা সবাইকে নিয়ে মিটিং করলো। এর একটা বিহিত করতেই হবে। একদিন টমিরা অমন ল্যাংটা হয়ে চান করতে যাচ্ছে, ভুলুদারা সবাই লরির তলা থেকে বেরিয়ে এল। সবার হাতে রেঞ্জ। গায়ে কিছু নেই।

তার পরদিন থেকে গোরাদের সেই নাঙ্গা মিছিল বন্ধ হয়ে গেল। ইন্ডিয়ার প্রেস্টিজ বাঁচলো।

॥ পাঁচ ॥

বি-এস-এ ছাড়াও অনেক বিদেশী সাইকেল চলতো। ইংরিজিতে এম. এ. পাশ দিয়ে বড়দা হাফপ্যান্ট পরে কানুনগোর ট্রেনিংয়ে চলে গেল। ফিরে এল রাজ-হুইট-ওয়ার্থ সাইকেলে চেপে। নতুন সাইকেল। মাসে ন' টাকার কিস্তিতে কিনেছে বড়দা।

চারুবাবু একশো মাসের বাড়ি ভাড়া পায়। বড়দার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। নগদ পণ নিয়ে বাবা ভাড়া আপ টু ডেট করে ফেলল। চোদ্দটা হ্যাজাকের আলোয় বড়দাব বউভাত হচ্ছে। আমরা ক'দিন হল জীবনের প্রথম সাবান মাখছি। মাথায় জবাকুসুম। ঘাড়ে পাউডার। দাঁতে জীবনের প্রথম পেস্ট। আমাদের আর চেনাই যায় না। ভাড়া পরিষ্কার করে দেওয়ায় চারুবাবুর মিস্ত্রি এসে নতুন বউয়ের জন্যে বাড়িতে চানের ঘর বানিয়ে দিয়ে গেল।

সব ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু বউভাতের দু'দিন আগে তনুদা, আমার, টোটোর, উমার আর টাপুর একই সঙ্গে চোখ উঠলো।

বউভাতের দিন সন্ধ্যেবেলা আমরা ক'ভাই হ্যাজাকের আলো ঘিরে রামধনু দেখছি। লোকজন খেতে বসেছে। এমন সময় একটা হই-চই শুনলাম।

ইংরাজি ছায়াছবিতে জাহাজডুবির সময় কাৎ হয়ে যাওয়া ডেকের দৃশ্য দেখেছি। স্বপ্নের ভেতর অনেক সময় দুঃস্বপ্ন দেখেছি। লাস্ট ডেজ অব

পম্পেইয়ের বঙ্গানুবাদ পড়েছি। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যায় বৌভাতের উৎসবে যা ঘটে গেল তার সঙ্গে অন্য কিছুরই তুলনা চলে না।

নেমন্তন্ন খেতে আসা আমাদের বন্ধুবান্ধবদের বাবা-মা ছেলেপিলে নিয়ে না খেয়েই উঠে যাচ্ছে। গোলমালে একটা কথাই কানে এল বার বার।

বেশ্যা ! বেশ্যা !!

হ্যাজাকের আলোয় দেখি প্রায় জনা তিরিশ চল্লিশ অন্যরকম চেহারার মেয়ে খেতে বসেছে। আর মনুদির বাবা তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা বলছে। মেয়েরা কেউ কেউ পালটা ফোড়ন কাটছে।

একটু দূরে বাবাকে মা বকাঝকা করছে, কে বলেছিল সরোজবাবুর ওপর নেমন্তন্ন করার ভার দিতে ?

বাবা কাচুমাচু। দারোগা মানুষ সরোজবাবু যদি নিজে থেকে নেমন্তন্ন করার ভার নেয়—

তাই বলে তুমি রাজি হবে ?—বলতে বলতে মা ফিরে যাওয়া মানুষজনের পথ আটকালো।

মনুদির বাবা সরোজবাবু দিনে জবরদস্ত দারোগা—সন্ধ্যে হলেই ভিজে গামছা। রাত ন'টা নাগাদ সাইকেল-রিক্‌শায় বাড়ি ফিরতেন। পাদানিতে তিন চারটি খালি বোতল। রিস্কাওয়ালাকে খুব সাবধানে চালাতে হত। স্লো মোশন পিকচারের মত। ঝাঁকুনিতে কোন বোতল টলে পড়ে গেলেই রিস্কা থামিয়ে সে বোতলটা দাঁড় করিয়ে দিতে হত।

পরে বুঝেছি—নেমন্তন্ন কার্ড বিলির ভার পেয়ে সরোজবাবু কোন সন্ধ্যে-বেলার ঝোঁকে তার নর্ম-সহচরীদেরও নেমন্তন্ন করে বসেছিলেন।

পয়লা ব্যাচে সেই মেয়েরা নেমন্তন্ন খেয়ে বড় বৌদির মুখ দেখে, একটি দুটি করে কাঁচাটাকা দিয়ে পান মুখে তবে বিদায় নিল। চোখ ওঠায় পুরো ঘটনাটাই আমার আর টোটোর চোখে হ্যাজাকের আলোয় নিশ্চয় টেকনিকলার লেগেছিল।

বৌভাতের পরদিন সকালে বাবার কোটের পকেট থেকে একটি আধুলি সরাই। সেই প্রথম পকেট মারি। অনেক পরে বাসে না ট্রেনে লেখা দেখছিলাম—বিঅয়ার অব দি পিক পকেট। তখন আর তারপর যতবারই ওই ক'টা কথা পাবলিক জায়গায় লেখা দেখেছি—ততবারই চমকে উঠেছি। আরে, আমিও তো পকেটমার !

অবশ্য বাবার পকেট মেরে সেই আট আনা আমার ভোগ করা হয়নি। বিকেলের ভেতর জ্বর এল। টানা এগারোদিন বিছানায়। রেমিশনের বহু পরে আধুলিটার কথা মনে পড়ে। তখন সেটা কোথায় ? কেউ জানে না। বিছানায় ? না মাথায় জল ধারানীর সময় মা পেয়ে তুলে রেখেছিল ? হয়তো আটশো বছর পরে ২৭৮৬ সালে মাটি খুঁড়ে আধুলিটাকে পেয়ে তখনকার মিউজিয়মে রেখে দেওয়া হবে। বালক পিকপকেটদের হাতেখড়ির ঐতিহাসিক মুদ্রার নিদর্শন।

সেই আমার প্রথম —সেই আমি শেষ পকেট মারি।

কিন্তু বেশি বয়সে আমাকে যে কত ডটপেন সরাতে হয়েছে তার হিসেব নেই। আমার নিজের ডটপেন কখনো আমার কথা শোনে না। আঙুলের শাসনও মানে না। কেনার সময় দিব্যি লেখে। দোকান থেকে বাড়ি আনার পর হয় শুকিয়ে যাবে—নয় লেখার সময় ঘষে নিয়ে লিখতে হবে। ফলে সুর কেটে যায়। তাই আমি কাউকে ডটপেনে স্বচ্ছন্দ সুন্দর লিখতে দেখলে জুলজুল করে সেই ডট-পেনটার দিকে তাকিয়ে থাকি। কখন ডটপেনটা আমার হবে—আমার আঙুলে এসে শাসন মেনে লেখার সময় কাগজের ওপর স্বচ্ছন্দ হবে। ফলে আমি গরীব-বড়লোক, খ্যাত-অখ্যাত, গায়ক-লেখক, যুবক-বৃদ্ধ—বহুলোকের ডটপেন—তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে—কথায় কথায় অন্যমনস্ক করে দিয়ে সেই সব স্বচ্ছন্দ ডটপেন সরিয়ে ফেলেছি।

সেইসব স্বচ্ছন্দ ডটপেন আমার হাতে এসে খোঁড়া হয়ে যায়। কেন যে যায় বুঝি না। এ আমার কপাল। যাকে ভক্তি করি—ভালবাসি—তার সঙ্গেই আমার সবচেয়ে আগে রাগারাগি হয়ে যায়। যে কাজ খুব মন দিয়ে করি—সেটাই নিন্দা কুড়োয়। যেটায় অবহেলা থাকে—তার ভাগ্যে জোটে ভূয়সী প্রশংসা। আনন্দ করবো বলে সবাইকে একত্র করলাম—পরিণামে নিরানন্দ বিষাদ। এ আমি গোড়া থেকেই দেখে আসছি। গেলাম এক জায়গায়—খোলামেলায় বাস করবো বলে। সেখানে গিয়ে কিনতে শুরু করলাম জমি—চাষ করলাম বড় করে। লেখা মাথায় উঠলো। আসতে শুরু করলো টাকা।

কিছুতেই লিখবো না বলে ফিরে এলাম কলকাতায়। হুড়মুড় করে লেখা আসতে লাগলো কলমে। ভাল হবো বলে এগিয়েছি—ফিরে এসেছি গোলমাল করে। সায়েস্তা করবো বলে ঝাঁপ দিয়ে ফিরে এসেছি গলা-জড়াজড়ি করে।

আসলে জীবনটা কি একটা পেন্সিল? তার শিস ছুঁচলো করে কেটেই যাবো শুধু?

না জীবন ঘাসের ওপর বিছিয়ে দেওয়া শুকোতে দেওয়া কাপড়?

মানুষের একটা ইতিহাস আছে। ধারাবাহিক ইতিহাস। তার নাম সভ্যতা।

পৃথিবীরও একটা ইতিহাস আছে। তার নাম গলন্ত দশা থেকে ধীরে ধীরে জুড়িয়ে আসার ভূতত্ত্ব। মহাকাশ। নক্ষত্র। আলোকবর্ষ। সৌরসংশয়ের প্রবল টান ভালবাসা। সে এক অচিন টান।

এই দুই ইতিহাসের বুনোটে তৈরি সময় যেন সেই নদী—সে নদী বয়ে যায়—কিন্তু বয়ে যাওয়ার তত্ত্বতাবাসে সে উদাসীন। খোঁজও রাখে না। নিরাসক্ত। তার কোন কোন জলধারা অন্ধ খাঁড়িতে বন্দী। কোন ধারা মোহনাও ভাসায়।

এই সময়ের জমিতে কোন একটি মানুষের জন্ম, জীবনযাপন, মৃত্যু ফুটিয়ে তুলতে পারলেই তা চিরায়তের নদীতে স্নান করে ওঠে। সমসাময়িক বস্তুপুঞ্জের

স্থূল করস্পর্শ তাকে ম্লান করতে পারে না। কালের দাগও তাতে পড়ে না। তাই মনে হয় আমিও কোন নিরাসক্ত উদাসীন নিমগ্ন নদীতে ভেসে-পড়া খড়কুটো। নয়তো এমন হবে কেন?

মনহীন, উদ্দেশ্যশূন্য, কার্যকারণ-বিচ্ছিন্ন অকারণ পুলকের বুদ্বুদ হয়েই ভাসছি তো ভাসছি। তাহলে কি বড় সাইজের কারও কৌতুকের হাসির ঝরনার কিনারায় ছিটকে যাওয়া আশ্চর্য চিহ্নমাত্র আমি?

হতে গেলাম মস্তান—হয়ে এলাম প্রেমিক। হতে গেলাম প্রেমিক—হলাম নভেলিস্ট। অবশ্য আদৌ যদি হয়ে থাকি।

পকেটে যার শৈশব নেই—প্রতিভার নদীতে সে যেন সাঁতরাতে না নামে। আমার যে একটা শৈশব ছিল—আবিষ্কার অপমান দিয়ে তৈরি শৈশব—অবশ্য অপমানও একরকমের আবিষ্কার বৈকি—রীতিমত শৈশবের মালিক হয়েও আমি প্রতিভার নদী পাইনি! পেয়েছিলাম বহতা জীবন নামে একটি নিমগ্ন নদী, ছুটে চলা, ঢলে পড়া একটি স্মৃতিভ্রংশ নদী যেন। তাই আজও কোন কিছুকেই আমার পাপ বা পুণ্য, শ্লীল বা অশ্লীল, সমর্থন-যোগ্য বা আপত্তিকর বলে মনে হয় না। কেননা সবটাই তো জীবন।

এতকালের মুসলমান বন্ধুরা মুসলিম লিগ হয়ে গেল। চাকরির বাজারে বর্ণহিন্দু বড়ভাইদের হেনস্থার একশেষ। বাবা কাকাদের মুখে শোনা যায়—জাতীয় কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটি নাকি বিরাট ভুল করেছেন বাংলার বাঙালীর ভাগ্য নিয়ে। আঃ, যদি দেশবন্ধু বেঁচে থাকতেন!

ওসব আবছা-আবছা শোনা। কিন্তু বাতাসে যে অবিশ্বাস তা টের পেতে কোন বয়স লাগে না! তা বুঝতে কোন বিদ্যা লাগে না! বারোয়ারী পুকুরের স্নানের ঘাটে, স্কুলে বেঞ্চি বেছে আলাদা বসায়—সবাই কেমন ভাগ হয়ে যাচ্ছিল।

এরই ভেতর বাবার কুলগুরু এসে হাজির একদিন সকালে! তাঁর বাবা আমাদের ঠাকুর্দার গুরু ছিলেন। তা কুলগুরু বারান্দায় পাতা চেয়ারে বসতেই বাবা তাঁর ডান পায়ের বুড়ো আঙুল জিভ দিয়ে ছুঁলেন। মেঝেতে বসে। দেখাদেখি মাও তাই করলো।

জিনিসটা আমাদের কারও বিশেষ ভাল লাগলো না। কুলগুরুর শরীরটা মজবুত। মাথায় কম চুল। হাতপায়ের নখ ভাল করে কাটা। খালি গা। উড়ুনি দিয়ে ঢাকা! এসেছেন সেই দেশের বাড়ি থেকে। তিন-তিনটে নদী পেরিয়ে। গলার স্বরটি মিষ্টি। আমায় ডেকে বললেন, রিক্সা থেকে নামার সময় দেখলাম—গরম গরম সিঙাড়া ভাজছে, যাও তো বাবা—দুটো ঘটনা কিনে নিয়ে এসো--

আমি ভড়কে গেলাম। ঘটনা তো কোনদিন কিনিনি জীবনে। আমতা আমতা করছি।

তাই দেখে বাবার কুলগুরু বললেন, কিনে নিয়ে এসো দুটো ঘটনা। চায়ের সঙ্গে খাবো।

চা দিয়ে ঘটনা খাবে ? বলে কি লোকটা ?

তখনো দাঁড়িয়ে আছি দেখে কুলগুরু নিজেই বললেন, কাঁচা সিঙাড়াগুলো গরম তেলে ফেলে দিয়ে ভেজে তুলছে। এটা কি কোন ঘটনা নয় ? তাড়াতাড়ি দু'টি ঘটনা নিয়ে এস। চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

এইভাবেই তিনি আমায় ঘটনা চেনার রাস্তা শিখিয়ে দিলেন। পরে—অনেক পরে নাইট ডিউটিতে নিউজ ডিপার্টমেন্টে গভীর রাতে যখন মিনিটে মিনিটে কেনেডির গুলিবিদ্ধ হওয়ার খবর আসছিল টেলিপ্রিন্টারে তখন ডালাস শহরের ঘটনাগুলো পর পর আলাদা করে দেখতে পারছিলাম।

সেই ভোরবেলায় কুলগুরু ঘটনা দিয়ে চা খেয়ে একখানা খেরোর খাতা খুলে বসলেন—এদিকে এসো। এই দ্যাখো—আকবরের সময় তোমাদের পূর্বপুরুষের নাম ছিল—দ্যাখো তো—কী লেখা আছে ?

আমি আর টোটো সেই খাতার ওপর ঝুঁকে পড়লাম। চন্দ্রনাথ--

দ্যাখো তো, আওরঙ্গজেবের সময় কে তোমাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন ?

পরিষ্কার লেখা আছে দেখলাম—মুকুন্দরাম। বললাম—এ হাতের লেখা কার ?

কুলগুরু বললেন, কেন ? আমার তখনকার পূর্বপুরুষরা লিখে রেখে গেছেন।

এই খাতাও তখনকার ?

তা না তো কি ? প্রায় ধমকে উঠলেন কুলগুরু।—আমরা আর তোমরা পাঁচশো বছর হয়ে গেল একসঙ্গে আছি। যাও আরো দুটো ঘটনা কিনে নিয়ে এসো। আর হ্যাঁ—তোমাদের মাকে আরেক কাপ চা দিতে বল।

হয়তো সেই বাবরের আমল থেকেই আমাদের পূর্বপুরুষরা ওঁর পূর্বপুরুষদের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে গুরুশিষ্যাগিরি করে আসছেন। ব্যাপারটা সেই বয়সে এতই ঐতিহাসিক লাগলো—তখুনি ছুটে পাড়ার মোড় থেকে একজোড়া ঘটনা কিনে আনলাম।

ভক্তিও বেড়ে গেল। আমারও বাবার মতই জিভের ডগা দিয়ে কুলগুরুর ডান পায়ের বুড়ো আঙুল চাটার ইচ্ছে হচ্ছিল। বলেন কি গুরুদেব ? সাক্ষাৎ আকবর বাদশা—সাক্ষাৎ সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় আমাদের মহা মহা ঠাকুর্দাদের সঙ্গে ওঁর মহা মহা ঠাকুর্দার পাশাপাশি থেকে কুলগুরুত্ব করেছেন ?

দুপুরে খাবার পাতে মায়ের রান্না নানা রকমের ঘটনা সাপটে সাবাড় করে কুলগুরু লম্বা ঘুম দিলেন। সন্ধ্যের মুখে ঘুম থেকে উঠে লালচোখে কুলগুরু জানতে চাইলেন—

মতিলাল,এখান থেকে বেবওয়ে বাইন কতদূরে ?

আমি আর টোটো তো শুনে অবাক। এ আবার কি রকমের ঘটনা ? টোটো স্কুলে তখন ভূগোলে ঢুকে গেছে। সে চাপা গলায় বলল, কোন জলজ প্রাণী নিশ্চয়। সেরকমই শোনাচ্ছে—

বাবা বলল, কাছেই গুরুদেব। আপনি যে স্টিমারঘাটায় নেমেছেন—সেখান থেকে অল্প একটু রাস্তা।

তাহলে আমার একখানা টিকিট কেটে দাও। আমি একটু কলিকাতা বন্দরে যাবো।

সে আর এমন কি কথা। টিকিট কেটে রাখবো'খন।

ভেতরে গিয়ে মাকে টোটো এই জলজ প্রাণীর কথা বলতে মা জানালো, গুরুদেব র আর ল উচ্চারণ করেন না। তার বদলে ব বলেন। কোন জলজ প্রাণী নয় রে, ওটা হবে রেলওয়ে লাইন।

কেন মা ? রেলওয়ে লাইন বলতে অসুবিধে কিসের ?

র আর ল দিয়ে ওঁর ইস্টদেবতার নাম। তাই বাইরে কথাবার্তায় র আর ল উনি বলেন না।

আমি বললাম, করলে কি হয় মা ?

ওঁর কুলগুরুর বারণ আছে।

ওঁরও কুলগুরু ? তিনি আবার কে মা ?

জানি না—যা। আমার এখন কাজের পাহাড়। যা পড়তে বোসগে—

আরও পাক্কা তিনটে দিন কুলগুরু চারবেলা খাবার পাতে ঘটনার ঘনঘটা ঘটিয়ে তবে বেবওয়ে বাইন দিয়ে কবিকাতা বন্দরে বওনা হয়ে গেলেন। আমি আর টোটো কুলগুরুর মোটঘাট রেলস্টেশনে গিয়ে কামরায় তুলে দিয়ে এলাম।

অনেক পরে সংস্কৃত ছন্দ পড়তে গিয়ে অবয়ব কথাটার সংস্কৃত উচ্চারণ শুনেছিলাম—অয়অয়। তখনই কুলগুরুর কথা মনে পড়েছিল।

সারাজীবনে তিনি কত ঘটনা খেয়ে হজম করেছেন, কিন্তু দেশবিভাগের ঘনঘটায় তিনি নিজেই হজম হয়ে চিরকালের মত কোথায় হারিয়ে গেলেন। আর কোনদিন তিনি আসেননি। তাঁর কোন বংশধর এসে আমাদের কাছে কুলগুরুত্ব দাবিও করেনি।

দেশবিভাগ এসে রূপকথাকে খানখান করে ভেঙে দিল। এমনিতেই কণ্ঠমণি জেগে উঠছিল —গলার স্বর ভেঙে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। রেণু সমেত তিন মেয়ে নিয়ে হেডস্যার মালদহ বদলি হয়ে গেলেন। সুষমাদি, টগরদি, মনুদি, সুরমাদি কবেই তাদের শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। আমাদের খেলার সঙ্গিনীরাও আর আমাদের সঙ্গে খেলে না। হাসি, পকা, পুতুল, আগমনীরা ফ্রক ছেড়ে সদ্য শাড়ি পরে সবসময় ফিকফিক করে হাসে। যেন আমাদের চেয়ে কী একটা জিনিস

বেশি জানে।

যুদ্ধ এসে আমাদের শৈশব গোগ্রাসে গিলে খায়। বাতাসে নারায়ে তাকদির। বাতাসে পার্টিশানের গন্ধ। বাতাসে অবিশ্বাসের তাত। কবে নাকি আমাদের পূর্বপুরুষরা অবিচার করেছিলেন—তার কড়ি গুনতে গিয়ে এ দেশটাই নাকি আমাদের থাকবে না।

তখনো যুদ্ধ শেষ হয়নি, ইংরেজ টিউনিশিয়া ফিরে পেল। আমরা স্কুলমাঠে রাজা ষষ্ঠ জর্জের আনন্দে সামিল হয়ে ফ্রিতে বালুসাই খেলাম। সুদূর আমেরিকার চার সোলজার চোত্মাসের দুপুরে চারটি লোকাল বেশ্যা নিয়ে শহরের মাঝখানে বিরাট তারের পুকুরে সুইমিং কম্পিটিশন চালালো একদিন। প্রায় সন্ধ্যে অব্দি। আটজনেরই পরনে সুইমিং ট্রাংক। শহরের চার-পাঁচটি স্কুল ছুটি হয়ে গেছে। ছুটির পর স্টুডেন্টরা পুকুর ঘিরে সেই সুইমিংয়ের দর্শক।

এই সময়টাতেই আমরা শৈশব থেকে একলাফে কৈশোরের শেষাশেষি পৌঁছে যাই। একেবারে কন্ডেন্সড্ কোর্স। নেতাজীর ছবি রেল প্ল্যাটফর্মে বিক্রি হচ্ছে। উকিলের কোর্ট গায়ে নেহরু-কাটজু। লালকেল্লায় আই-এন-এ'র মামলা।

ঠিক এই সময়টার কাছাকাছি একদিন বর্ষার সকালবেলায় রাস্তার মোড়ে দেখলাম ঝমঝম বৃষ্টির ভেতর অতি সুপুরুষ এক ভদ্রলোক খালিগায়ে গামছা পরে শহরের মেইন রোড দিয়ে পাড়ায় ঢুকছেন। ডানহাতে ছাতা। বাঁহাতে একখানা বই। পড়তে পড়তে হেঁটে আসছেন। বৃষ্টি, গরু বা রাস্তার লোকে তাঁর কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। এই সত্তর মত হবেন।

মা বারান্দা থেকে তাকে দেখেই বললেন, এগিয়ে গিয়ে নিয়ে আয়। ঠাকুর-জামাই আসছেন।

আমাদের পিসেমশায়। তিনি এসে বসলেন। রাজকীয় চেহারা। রাজকীয় কণ্ঠস্বর। এসেই মায়ের সঙ্গে ঠাট্টার কথাবার্তা বললেন। চা খেলেন। বাবার খোঁজ করলেন। তারপর বললেন, কলকাতায় শিষ্যবাড়ি গিয়েছিলেন। হেঁটে ফিরছেন।

তিনি রেলে বড় একটা চড়তেন না। একশো দেড়শো মাইল অবলীলায় হাঁটতেন। আমাদের নাম জেনে নিয়ে নিজের নাম বললেন—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিকেলের দিকেই আরও জোর বর্ষার ভেতর তিনি ওই বেশেই বেরিয়ে গেলেন। যাবেন তিনটি নদী পেরিয়ে পৈতৃক গ্রাম ভোগিরহাটে। নদী নিশ্চয় হেঁটে পেরোবেন না। সাঁতরেই পেরোবেন বোধহয়। যে রেলে চড়ে না—সে কি আর নৌকোয় চড়বে!

এই সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় কোনদিন পাকিস্তান হিন্দুস্থান স্বীকার করেননি। তিনি বলতেন ভারতবর্ষ। তাঁর কথায় পরে আসছি।

আগে তাঁর দাদার কথা বলি। তিনি ছিলেন আমাদের বড় পিসেমশায়। তাঁকে কোনদিন দেখিনি। তাঁর কথা শুনেছি মাত্র। ও'রা দু'ভাই মিলে আমাদের

চার পিসিকে বিয়ে করেন। একসঙ্গে বা একবারেও নয়। একজন পিসি মারা গেলে ওরা তার পরের বোনকে বিয়ে করতেন। ফলে এক পিসির আগের পক্ষের ছেলে—মানে তার মরে যাওয়া দিদিরই ছেলে তার চেয়ে বড় ছিল। আমাদের সেই অতিবড় পিসতুতো দাদার সঙ্গে—গঙ্গাচরণদা—আমি ঠিক পার্টিশানের আগে শহরের রেলস্টেশনে একদিন বিকেলে গিয়েছিলাম। তিনি চোখে কিছু দেখতে পেতেন না। মাইনাস দশ পাওয়ার চশমায়। কোনদিন বিয়ে করেননি। আমার মা গঙ্গাচরণদাকে আপনি বলতো।

গঙ্গাচরণদার তখন বয়স হয়ে গেছে। বিয়ে করেননি। পড়াশুনো করা হয়নি। মা বাপ নেই। চোখে কম দেখেন। শান্ত স্বভাবের মানুষ। গাঁয়ে থাকেন। দেশ ভাগ হয়ে যাবে। কোথায় যাবেন? কি করবেন? ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। কাদের সঙ্গে যাবেন? বা কাদের সঙ্গে থাকবেন? তা তিনি জানেন না। তাঁর একদম নিজের বলতে পৃথিবীতে তখন কেউ নেই।

এই গঙ্গাচরণদার বাবা—আমাদের বড় পিসেমশায় খুব ডাকাবুকো ছিলেন। বাঘ এসে গোহাল থেকে গরু নিয়ে যায় শুনে তিনি কালো গাইয়ের পাশে শীতের রাতে কালো কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে ছিলেন। মাঝরাতে বাঘ আসতেই ঘরের ভেতর আমাদের পিসিমা ভয় পেয়ে বলেছিলেন—আজ বাঘের বড় বিপদ—

বাইরে অন্ধকার থেকে একবার শুধু একটা গর্জন আর কিছু ধস্তাধস্তির আওয়াজ পাওয়া যায়। অল্প সময়ের জন্যে। তারপর সব চুপচাপ।

সকাল হলে গাঁয়ের লোকজন এল। পিসিমা দোর খুললেন। গোহালের বাইরে থেকে বড় পিসেমশায়কে ডাকাডাকি করতে তিনি ঘুমচোখে উঠে এলেন। গায়ে কম্বল পেচানো। জড়ানো জায়গাটা কিছু ফোলা।

বাঘ? এসেছিল?

হুঁ।

কোথায়?

পিসেমশাই কম্বল তুললেন খানিকটা। লোকজন পিছিয়ে গেল।

একজোড়া গামছায় সামনের পা দুটো উল্টে বাঁধা বাঘ—প্রায় শ্বাসরুদ্ধ। বাঘের চোখ লাল হয়ে উঠেছে। মুখের ভেতরেও গামছার অনেকটা গুঁজে দেওয়া। বেচারা সারারাত না পেরেছে চ্যাচাতে—না পেরেছে ঘুমোতে। তাছাড়া সামনের পা দুখানা মাথার ওপর দিয়ে উলটে নিয়ে গিয়ে জম্পেস করে বাঁধায় ও আর বোধহয় কোনদিন হাঁটতেই পারবে না।

সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট কাছাকাছি তাঁবু ফেলেছিলেন।

ওই অবস্থাতেই বড় পিসেমশায় তাঁবুতে গেলেন। হুজুরে অভিযোগ জানাতে। তিনটে বাছুর হাবিশ করেছে বাঘ!

সাহেব বলল, আসামী কোঠায়?

বড়পিসেমশায় কম্বলের ঘোমটা তুলে সাহেবকে এক পলকের জন্যে আসামীর মুখ দেখালেন। দেখিয়েই আবার কম্বল নামিয়ে দিলেন। বাঘ তখন বড় পিসেমশায়ের মরণ আলিঙ্গনের ভেতর গোঁ গোঁ করছে।

মায়েরও এসব দেখার কথা নয়। সে আমাদের ঠাকুরমার মুখে শুনেছিল। ঠাকুরমা নাকি বড় জামাইয়ের এ কাহিনী বলতে বলতে গর্বে ফেটে পড়তেন।

ঠাকুরমার সাত মেয়ের পর গত শতাব্দীর শেষদিকে বাবা পৃথিবীতে আসেন। তার মানে বড় পিসেমশায়ের এসব কীর্তিকলাপের সময় হয়তো দুর্গেশনন্দিনী বেরোচ্ছে কিংবা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ সদ্যোজাত শিশু। ওইসব সময়েই জঙ্গল কেটে রেললাইন নাগপুর অব্দি যাচ্ছিল। বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় আমায় বলেছিলেন, হুগলী থেকে রেললাইন বসাবার সময় যখন মাটি ফেলা হয়—তখন তিনি নেহাৎ বালক—দ্বারভাঙ্গার পাণ্ডুলে বাবার সঙ্গে যাচ্ছেন।

মনে হয় ঠাকুরমার বড় জামাই তাঁর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। তখন অনেক সময় তাই-ই হোত।

সাহেব খুশি হয়ে বড় পিসেমশায়কে চৌকিদার করে দেন। তিনি দুবেলা গরমভাতে ঘি খেতেন। অল্প বয়সে মারা যান।

আমাদের অনেক বন্ধুরই বাবা বংশে প্রথম চাকরিজীবী। যে-কোন বাঙালীর গা একটু চুলকোলেই দেখা যাবে—খুব জোর চার কি পাঁচপুরুষ আগে তারা মনে হয় হেলে চাষা ছিল—না হয় নুনের গোলায় জল ছাঁকতো। কিংবা ওরকম কিছু একটা করতো। চাকরির ইতিহাসের বয়স তো বেশি নয়।

তবে বাঙালীই বোধহয় সবচেয়ে আগে টের পায়—কোন চাকরিই বিশুদ্ধ নয়।

নয়তো সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত মানুষজন তো সেসময় তার আগেও অনেকে ছিলেন যারা কোনদিন চাকরির কাছে যাননি। ওঁরা হয় যাত্রা করতেন, না হয় কথকতা করতেন, কিংবা তীর্থ।

সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় মনু পরাশর থেকে বড়জোর শঙ্করাচার্য অব্দি নামতেন। থাকতেন তার ওপাশেই। গাঢ় কণ্ঠস্বর। তেজি স্মৃতিশক্তি। সুশ্রী আনন। চ্যাটালো বুক। এমন লোক আমার দুই পিসিমাকে পরে-পর বিয়ে করেই ফুরিয়ে যাবার মানুষ নন।

তাঁর অনেক শিষ্যা ছিলেন। শিষ্যারা ওঁকে সেবা করতেন। উনি কথকতা করতেন। শিষ্যের চেয়ে শিষ্যাই ছিল ওঁর বেশি। তারা কেউ ওঁকে দিতেন শীতের কম্বল, কেউ দিতেন দুধ খাওয়ার গরু।

তখন ওপারে যাওয়ার পাসপোর্ট চালু হয়ে গেছে। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় এক শিষ্যার কাছ থেকে গরু উপহার পেয়ে কলকাতা থেকে গরুর সঙ্গে পায়ে হেঁটে ভোগীরহাট চলেছে। পাসপোর্ট ভিসা কিছুই নেই তাঁর। গরুরও ওসব নেই। তিনি ভারতবর্ষের ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন। বৈশাখের

দুপুরে গরু তাঁকে দড়িসুদ্ধ ছেঁচড়ে টেনে একটা শুকনো পুকুরে নামালো।

সারাদিন হাঁটাহাঁটির পরিশ্রম ছিল। গরু এবং তাঁর জলতেষ্টাও পেয়েছিল। পুকুরটা শুকিয়ে একদম খটখটে।

গরু হিড়হিড় করে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুকনো পুকুরে নামালো। মাথার ওপর শুধু সূর্য। কোন ছায়া নেই। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকবার পেচ্ছাপ করে ওখানেই পড়ে গেলেন। গাঁয়ের মানুষ একটা অচেনা গাই আর পরিচয়হীন লাশ পায় সন্ধ্যেবেলা। গলায় পৈতে দেখে বোঝে ব্রাহ্মণ। তিনদিন পরে আমরা কলকাতার ফ্ল্যাটে বসে খবর পাই। তখন আত্মীয়স্বজন হারিয়ে যাবার সময়— তখন আত্মীয়স্বজন না-চেনার সময়।

এইসব ডাকাবুকো, সুপুরুষ, পণ্ডিত জীবনের ঘোরে-চলা-মানুষ নিজেরা জাননে না কি করছেন—আবার অন্যেরা কি করছেন তাও জানেন না। বুঝিবা কোন নিমগ্ন নদী। প্রাণশক্তির এই বিপুল উথলে পড়াও জীবনেরই আরেক রহস্য। এসবের কেউ হিসেবে রাখার নেই। এই সব জীবনের কোন কৈফিয়ৎ নেই।

ধীরেন লস্কর স্যার বদলি হবেন।

বড় কড়া টিচার। তাঁর হাতে ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে যে তিরিশ পাবে—সে ফাইনালে নির্ঘাৎ পঞ্চাশ পাবে।

সেই স্যারের ফেয়ারওয়েল। চাঁদা উঠলো সাতাশ টাকা। দাড়ি কামানোর আয়না? অক্সফোর্ড কনসাইজ ডিক্সনারি? কী উপহার দেওয়া যায় স্যারকে?

ক্লাস একমত হতে না পারায় উপহার কেনার ভার পড়লো আমার আর শরতের ওপর। শরৎ এখন পশ্চিমবঙ্গের পুলিশের বড়কর্তার স্টেনো কাম কনফিডেনসিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট। ও জানে কলকাতায় কার কোথায় ঘা। ও কি এসব কথা এখন স্বীকার করবে?

তবু বলি।

আমরা দু'জনে ধীরেন স্যারের জন্যে উপহার কিনতে বেরোলাম। স্কুল থেকে এজন্যে স্পেশাল ছুটি স্যাংশন করা হল। সেকেন্ড পিরিয়ডে বেরিয়ে টিফিন পিরিয়ডের ভিতর ফিরতে হবে।

মনোহারী দোকানে—যাকে স্টেশনারি দোকান বলে—গিয়ে আমি আর শরৎ তো ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলাম। কোনটা ফেলে কোনটা কিনবো! স্যারকে ডিক্সনারি দেওয়ার চেয়ে রোজকার ব্যবহারে লাগে এমন জিনিসই দেবার ইচ্ছে আমাদের।

কিন্তু কোন জিনিসই ঠিক করতে পারি না। সেভিং শেট? না জামা শুকোতে দেবার স্ট্যান্ড?

শেষে শরৎ বলল, চল স্টেশনের দিকে যাই। ওদিকে অনেক নতুন দোকান

হয়েছে। অনেক নতুন নতুন জিনিস থাকে ওখানে।

শীতের দুপুর। রেলের মাঠে গরু। বাঁহাতে ফেরিঘাট রোডের মুখে অনেকগুলো মনোহারি দোকান যুদ্ধের ভেতর গজিয়ে উঠেছে। তারই একটায় ঢুকে আমি আর শরৎ দরদাম করছি। আমি বা শরৎ—কারও কনুইয়ের ধাক্কায় একজনের হাতের কাচের জিনিস পড়ে ভেঙে গেল।

ফিরে দেখি—আমাদের চেয়ে বড় একটি মেয়ে কড়া করে আমাদের দিকে তাকিয়ে—ভাঙলে তো! এখন দাম দেবে কে?

দোকানী রাগী গলায় বলল, তুমি দেখতে গিয়েছিলে, তোমার হাত থেকেই ভেঙেছে। দাও—আড়াই টাকা দাম বয়মটার।

আমি দেবো কেন? ভেঙেছে তো এই ছোঁড়া দুটো। পয়সা নিতে হয় ওদের কাছ থেকে নাও।

শরৎ আর আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। ওভাবে কাচের জিনিস নিয়ে দাঁড়ালে তো ভাঙবেই। আমরা কি আর দেখে ভেঙেছি—

লম্বা লম্বা কথা না বলে দামটা দিয়ে দাও তো।

দোকানী বিড়বিড় করে বলল, যত্ত ছোটলোক নিয়ে পড়েছি—

অ্যাই, ছোটলোক বলবে না। এই নাও তোমার পয়সা।—বলতে বলতে মেয়েটি আঁচলের গিঁট খুলে গুনেগেঁথে আড়াইটে টাকা খুচরোসমেত ঝনাৎ করে দোকানীর সামনে রাখলো। রেখে দিয়ে বলল, আমরা কলকাতার চিৎপুর থেকে এয়েচি—

জানি জানি—চিৎপুরের কোন্ জায়গা থেকে এসেছিস!

কি? বলে মেয়েটি দপদপ করতে করতে বেরিয়ে গেল।

গতিক সুবিধের মনে হল না আমাদের। দোকান থেকে না কিনেই বেরিয়ে পড়েছি। দু'তিনখানা বাড়ি না পেরোতেই একটা একতলা বাড়ির বার-খিড়কি খুলে মেয়েটি বেরিয়ে এল। এই যে এই যে—এই দুই ছোঁড়ার জন্যেই—

আমরা দৌড়তে যাবো, অমনি চার-পাঁচজন মেয়েছেলে আমাদের ঘিরে ফেলল। দুপুরবেলার ফাঁকা রাস্তা। দূরে একখানা রিকসা-সাইকেল। সেই মেয়েটি চড় তুলতেই ওদের ভেতর একজন দিদি প্যাটার্নের মেয়ে একদম মুখোমুখি এগিয়ে এল, তোমরা ভেঙেছো?

শরৎ বলল, আমার কনুইতে লেগে বয়মটা পড়ে যায়—

আমি বললাম, আমরা তো দেখে ধাক্কা দিইনি। ও আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে ছিল—

সেই মেয়েটি ধমকে উঠলো, তুমি সরো তো মনোদিদি। দু'টোই বাঁদর—

সেই মনোদিদি পালটা ধমক দিল, তুই থাম।—তারপর আমাদের দিকে নরম করে তাকিয়ে বলল, এসো বসবে।

না, আমরা চলে যাবো।

যাবেই তো, একটু জল খেয়ে যাও। চল।

সেই মেয়েটির মুখ থেকে মনোদিদি আমাদের কেড়ে নিয়ে বাড়িটার ভেতর ঢুকতে ঢুকতে বলল, কলকেতার মেয়েগুলো একটু বেশি আদুরি হয়। তায় বিশেষত চিৎপুরের—

এই 'তায় বিশেষত' মোলাম টানটি চল্লিশ বছর পরেও দিব্যি তাজা হয়ে আমার কানের ভেতর শুয়ে আছে। সেই আদুরি বাঁদর মেয়েটার হাত থেকে বাঁচতে আমরা যে বেশ্যাবাড়ির ভেতর ঢুকে পড়েছি—তখনো তা বুঝতে পারিনি।

একটু পরেই মালুম হল। কেউবা খোলা দোরের সামনে মোড়ায় বসে। কেউবা জ্বরের রুগী। মাথায় জল ঢালা হচ্ছে তার—বারন্দার কিনারায় বসিয়ে। এটা এ পাড়ার অসময় নিশ্চয়। গোটা দুই ঘরের দোর বন্ধ।

এসো এসো, এই তো আমার ঘর—

না, আমরা যাই।

আটকে রাখছি না। এসো—বসেই চলে যাবে।

অগত্যা।

ভয় কৌতূহল, ইচ্ছে—সবই একসঙ্গে গুলিয়ে যাচ্ছিল। আবজানো দরজা ঠেলে ভেতরে বসতেই আমাদের চোখ চমকে উঠলো। এখন বুঝি, যুদ্ধের কোন বিদেশী সোলজার ওই ছবি ওখানে সেঁটে দিয়ে গিয়েছিল। দেওয়াল জুড়ে এক নগ্ন সুন্দরী। কিছুই হয়নি এমনভাবে ছবি থেকে আমাদের দিকে তাকিয়ে।

জলের সঙ্গে আমাদের দুখানা করে লবঙ্গলতিকা দিল। খাবো কি, গলায় আটকে যাবার দশা। মনোদিদি ততক্ষণে দোরে খিল তুলে দিল।

ও কি! আমরা যাবো!

যাবেই তো। খানিক বাদেই যাবে। একটু বসো। বলতে বলতে শরতের গায়ে দাঁড়িয়ে আঁচল সরিয়ে দিল মনোদিদি। ডান হাতখানা শরতের কাঁধে।

শরৎ দু'হাতে সরিয়ে দিতে গিয়ে একরকম জড়িয়েই ধরলো।

উঁহু, সওদা করতে ঢুকেছিলে মনোহারি দোকানে—সঙ্গে টাকা আছে তো!

আমি মরীয়া হয়ে লাফিয়ে উঠলাম। নগদ সাতাশ টাকা আছে আমাদের—

হো হো করে হেসে উঠলো মনোদিদি। না না, অত টাকা লাগবে না। তোমরা এক একজন চারটাকা করেই দিও—কনসেসন করে দিলাম।

শরতের গায়ের সার্ট নিজের হাতে খুলে দিয়েই আমার দিকে তাকাল, কই? আটটি টাকা গুনে দাও!

দিলাম।

মনোদিদি সেই টাকা গুনেগেঁথে আমারই চোখের সামনে ড্রেসিং টেবিলের দেরাজ টেনে ভেতরে রেখে দিল। আমার বুকের ভেতর তখন ঢেঁকির পাড়

পড়ছিল ! গলার ভেতরটা কাঠ। পালঙ্কে ওঠার সময় মশারি ফেলে দিয়ে শরতকে ভেতরে নিল। সেখান থেকে চেঁচিয়ে বলল, ওদিকে তাকিয়ে থাকো।

বুঝলাম, দুজনে এলে এটাই নিয়ম।

আয়নায় দেখি ওরা পাশ ফিরলো। আমি তখন দেরাজ খুলে আটটা টাকা বের করে পকেটে রাখলাম। ক্লাসের চাঁদার টাকা। না নিলে কোথা থেকে হিসাব মেলাবো ?

শরৎ হাঁসফাঁস করে নেমে এল। আমি গেলাম।

আমাকেও নেমে আসতে হল খানিক বাদে। চলে আসার সময় মনোদিদি বলল, চোত সংক্রান্তি অব্দি আছি। মন কেমন করলেই চলে আসবে কিন্তু। এখানেই পাবে আমায়—

আমরা দু'জন ভাল ছেলের মত মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বেরিয়ে এলাম। রাস্তায় পড়েই ছুট। ছুটতে ছুটতে ফাঁকা দুপুরের ভেতর রাস্তার পাশের রেলমাঠে নেমে পড়লাম।

শরৎ বলল, আট টাকা কোথায় পাবি এখন ?

আমি আদর করে বললাম, মাণ্ডু ! এই যে সেই টাকা। তোরা যখন পালঙ্কে —আমি তখন দেরাজ থেকে বের করে নিয়েছি। কনসেসন।

শরৎ আনন্দে খিকখিক করে হেসে উঠে ফাঁকা রেলমাঠটায় দৌড়তে লাগল। পেছন পেছন আমিও। হাসছি। হো-হো। খিক-খিক। নানা রকমের হাসি। আর শরৎ যেন গান গাইছে। কনসেসন ! কনসেসন !!

সেদিন হাত-আয়না, সেভিং সেট কিনে যখন স্কুলে ফিরলাম—তখন ছুটি হয়-হয়।

অনেক পরে মনে পড়তে বুঝেছি—সেই দুপুরে মনোদিদির হাত হয়তো খালি ছিল একদম। আমাদের কিলিয়ে খদ্দের পাকিয়ে নিতে হয়েছিল তাকে। নয়তো শুধুই কিশোর-বিলাসের অভিরুচি হয়েছিল তার। কিন্তু রতিবিলাসের পক্ষে আমরা তো তখন নেহাতই কচি।

পনের দিনের মাথায় মনোদিদি আমাদের রোগ দিল। আর ঠিক সেই সময়টায় এক বুড়ী মুড়িয়ালি মাকে মুড়ি মেপে দিতে দিতে বলল, দিদি, একটা কথা বলা উচিত। তোমার খোকা বোধহয় আমার মেয়ের ঘরে গিয়েছিল !

কি ?

হ্যাঁ দিদি। দুপুরবেলা আমি ভেতরবাড়িতে বসে। আমার মনো মেয়েটাকে সোলজারেরা তো রাক্ষুসী করে তুলেছে। ওর আর বাছবিচার নেই। আমি স্বচক্ষে তোমার ছেলেকে দেখেছি। আজ দশ বছর মুড়ি দিই তোমায়, আমার চিনতে ভুল হয়নি।

পানু ?

আমি ঘরের ভেতর বসে সব শুনছি। শুনে ভয়ে কাঁপছিলাম। লজ্জারও একশেষ। লুকিয়ে কোথায় যাবো?

বাইরে এলি—

বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই বুড়ী মুড়িওয়ালি বলল, হ্যাঁ—এই খোকাকেই আমি দেখেছি।—বলে মায়ের দিকে তাকালো, লাইনটা তো একদম ভাল নয় দিদি। এখন থেকেই তোমার সাবধান হওয়া দরকার। তুমি ছেলের মা—

কি বলছো? এ তো মস্ত সব্বোনাশের কথা!

আমিও তো সেই কথাই বলছি দিদি। তোমার ছেলেকে সামলাও। আমার মনোমেয়েটা এখন সাক্ষাৎ রাক্ষুসী।

রূপকথায় খুনী দান করে। দানবীর খুন করে। সেদিন আমাদের বারন্দায় যেন কোন রূপকথারই জন্ম হচ্ছিল। লাইনের মা হয়ে কে কবে তার মেয়ের লাইনের ক্ষতি করে! আমরা কিশোর ছিলাম বলেই কি? না মাকে অনেকদিন ধরে মুড়ি দিচ্ছিল বলে?

বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই বেদম এক চড় কষালো মা—এসব সত্যি?

আমার জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করেই কেঁদে উঠলো, আমার কি হবে—

এমনই একটা ব্যাপার যে মাকে সান্ত্বনা দেওয়া যায় না। জোরে বলাও যায় না ব্যাপারটা। ছনুদা বাড়ি ছিল না। টোটোকে বলা যায় না। ভাগ্যিস বড়দা মেজদা কলকাতা আর ঢাকায়। সোনামুচি বেরিয়েছে—বাড়ি ফেরেনি তখনো।

সন্ধ্যে হয়-হয়। হ্যারিকেন ধরানো হয়নি। মা কেঁদে উঠে চুপ করে বসে আছে। আমি চড় খেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে। আমার খেলাধুলোর বন্ধুরা ধুলো-পায়ে বাড়ি ফিরছে। আমি ওদের দেখতে পাচ্ছি। অথচ এগিয়ে গিয়ে কথা বলতে পারছি না। আমি যে এক দুপুরের কনসেসনে অন্যরকম হয়ে গেছি। আমি ওদের দেখতে পারছি—কিন্তু কাছে যেতে পারি না। মনোদিদির টেনে দেওয়া গণ্ডীর ভেতরে পড়ে গেছি।

রাত আটটা নাগাদ বাবা বাড়ি ফিরে সব শুনলো। তারপর হ্যারিকেন তুলে আমার মুখখানা দেখলো। দেখে একমুখ হেসে বলল, আশ্চর্য!

আমি তখন ঘরের ভেতর। মা বারান্দায়। সেখান থেকেই মার গলা ভেসে এল। বাবাকে বলছে, একবার কাশীবাবুকে ডাকতে হয়।

॥ ছয় ॥

কৈশোরও উবে যাচ্ছিল—আমিও একটু একটু করে লাস্ট বেঞ্চের দিকে পিছিয়ে যাচ্ছিলাম। রীতিমত রুটিন করে পড়ি। ঘণ্টা মিনিট কিছুই অপচয়ের উপায় নেই। রুটিনের বজ্র আঁটুনির ভেতর ব্যাকরণ থেকে ভুগোল—লেটার রাইটিং

থেকে অ্যালজেব্রা—সবই রেলের টাইমটেবলের মত সাজিয়ে নিতাম—

ভোর ৫ টা ১৫ মিঃ কবিতা মুখস্থ। ইংলিশ।

৫ টা ৩০ মিঃ আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য বিজয়—কিংবা দাহিরের ভারত আক্রমণ।

৬ টা ৩০ মিঃ সাইমালটেনিয়াস ইকোয়েশন।

৭ টা ৩০ মিঃ প্রাকৃতিক ভুগোল। এশিয়ার নদীগুলির অববাহিকা।

৮ টা ৩০ মিঃ জলখাবার।

৮ টা ৪৫ মিঃ বাংলা রচনা।

৯ টা ৪৫ মিঃ মিস্টার মিকোবারের চরিত্র এম. সেন হইতে মুখস্থকরণ।

এই ভাবেই রাত ১১ টা ১৫ মিঃ পর্যন্ত পড়াশুনোর নিশ্ছিদ্র আয়োজন। এর ভেতর খাওয়া-দাওয়া, স্নান, দাঁতমাজা, বাথরুম ইত্যাদির কারও ভাগেই পাঁচ মিনিটের বেশি বরাদ্দ করতে পারিনি। তবু গোল্লা। তবু একশোতে সাতাশ। রাতে ঘুমের জন্যে রেখেছি সাড়ে এগারোটা থেকে ভোর পাঁচটা—সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা মত।

লাস্ট বেঞ্চের বিভূতি হুই, মনোজ ঘোষ ওরা আমায় লুফে নিল। আয় পানু আয়—

রুটিনে ঘণ্টা মিনিটের এদিক ওদিক হয়ে যেত। তখন নিজেকেই নিজে ২০ মিনিট পর্যন্ত অ্যালাউন্স দিতাম।

কিন্তু লাস্ট বেঞ্চে আসার পরে মনের ভেতরকার বিষাদভূমিতে দাঁড়িয়ে নানা রকমের গোলমাল পাকিয়ে তুলতাম।

এখন মনে হয়—পৃথিবীর চারদিককার সহস্র বিকাশের চল্লিশ দরজার উনচল্লিশ দরজারই যারা কোন হদিশ পায়নি—শুধু তাদেরই জন্যে সিলেবাস গিলে পরীক্ষার খাতায় উগরে দিয়ে অ্যানুয়ালে ভাল ছেলে হওয়া সম্ভব।

আগে বাংলা সিনেমার হিরোরা খুব ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হত। জীবনেও এদের পেয়েছি। কৃতী। কিন্তু কোন বিদ্যুৎ খেলে না। বেশির ভাগই তাই। তবে ব্যতিক্রমও আছে। এই ব্যতিক্রম আমায় বার বার বিস্মিত করেছে।

ভবিষ্যতের পেপারসেটাররা যদি এভাবে প্রশ্ন করতেন—

১। বর্ষার ভেতর থার্ড পিরিয়ডে টরিসেলির ব্যারোমিটার পড়ানোর সময় ফিজিক্স স্যারের ঘ্যানঘ্যানানি ও বোর্ডে চকখড়ির খেলাধুলা তোমার কানে কোন্ ঢিমেতালা সুর হিসাবে প্রবেশ করে? উদাহরণ সহ লিখ। ১৬

অথবা

দিল্লি মেলের আওয়াজ শুনিয়া যদি মনে হয়—গেট আউট—গেট আউট—তাহা হইলে নিম্নলিখিত আওয়াজ তিনটির কোনটি মাদ্রাজ মেইলের হইবে—চলপতি রাজলু, বোম্মানা বিশ্বনাথন, নরসিমা কোদণ্ড?

২। শীতের কুয়াশায় আমের বউলের ক্ষতি হয়। যতটা আম ফলার কথা ততটা ফলে না। যদি কুয়াশা তাড়ানো যায়—তাহা হইলে প্রচুর ফলনের আম খাইয়া আমরা কি ভাত বর্জন করিতে পারি? আম খাইবার পাঁচ প্রকার ভঙ্গী চিত্র সহকারে লিখ।

(পরীক্ষার শেষে বাছাই আম হইতে পাঁচটি আম খাইয়া ভঙ্গীগুলি দেখাও।)

এক্সটারনাল এগজামিনারের হাতে এই বাবদ ৮ নম্বর থাকিবে, ফলে প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর খেয়াল রাখা দরকার—যে ভাবেই আম খাওয়া হোক না কেন, গায়ের জামায় রস না পড়ে। ফজলীতে ততটা সাবধান হওয়ার দরকার না হইলেও ল্যাংড়া, হিমসাগরে অবশ্যই সতর্কতা প্রয়োজন।

বিভূতি হুই আত্মবিশ্বাসের অভাবে জানা কোশ্চেনের আনসারও গুলিয়ে ফেলতো। তোতলা বলে ওরাল পরীক্ষাগুলো ভণ্ডুল করে ফেলতো। কোন কোন স্যারের ক্লাসে বেঞ্চে দাঁড়ানো অবধারিত বলে ও আগেভাগে স্ট্যান্ড আপ অন দি বেঞ্চ হয়ে যেতো।

মনোজ ঘোষ হেলাফেলায় থার্ড হোত। ও-ই আমাদের ছাপার অযোগ্য অসভ্য কথাগুলো শেখায়। সঙ্গে কয়েকটা অসভ্য কাজ। যেগুলোর কোনোটা নাকি আরব দেশে চালু। সাহেবরা কেউ কেউ বেশি বয়সেও যা প্র্যাকটিস করে। নামী সব সাহেব। এমন কি ডি. এইচ্. লরেন্সও।

উঁচু ক্লাসে এসে বিভূতি হুই গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল। আরও তোতলা হয়ে যাচ্ছিল। মনোজ ঘোষ উঁচু ক্লাসে ঘুড়ি ওড়াতে লাগলো। সুতোয় কাচগুঁড়ো দিয়ে মাঞ্জা দিতে লাগলো।

দেশবিভাগ বিভূতিকে একদম হারিয়ে দিয়েছিল। মনোজকে দু'পাঁচ বছর অন্তর পেতাম। এম. বি. বি. এস পড়ছে। রেস খেলছে খুব। ফার্স্ট এম. বি. পাশ করে পড়া ছেড়ে দিল। রেস। জুয়া। চোলাই। ইংরিজিতে এম. এ. পাশ করলো। টিউটোরিয়াল খুললো। সংস্কৃত থেকে ইকনমিকস্—সব পড়াতে পারে। বিয়ে করলো। নামী ইংরাজি স্কুলে টিচার। তার হাতে পরীক্ষার জন্যে তৈরি ছাত্র—আমাদের দেশের প্রথম মহাকাশচারী।

বিভূতি হুইয়ের খবর পেলাম ওর মৃত্যুর পর। কনটেসা গাড়ির চিফ ডিজাইনার ছিল হিন্দমোটর! এদের দু'জনের সামনেই সহস্র বিকাশের চল্লিশ দরজার ঊনচল্লিশ দরজাই খোলা ছিল। সিলেবাস গিলে ওগরাতে পারেনি বলে শুধু একটি বন্ধ ছিল। তা সে দরজাটাও মনোজের কাছে খোলা ছিল। মনোজ তাতে কোনদিনই মন দেয়নি।

চল্লিশ বছরের ওপারে সন্ধ্যার সেই বারান্দা মনের ভেতর পেরিসকোপ সমেত ডুবোজাহাজের কায়দায় ভুস করে ভেসে ওঠে মাঝে মাঝে। তখনই দেখতে পাই ধোঁয়াটে চল্লিশ-বেয়াল্লিশটা বছরের ভেতরে সেই গোধুলির বারান্দাখানা কে আমূল

বসিয়ে দিয়েছে। সেখান থেকে খানিক আগে বুড়ী মুড়িওয়ালি উঠে গেছে। বাবা এইমাত্র হেরিকেন তুলে আমার মুখে তাকিয়ে একগাল হাসলো। তারপর বললো, আশ্চর্য! মা বলল, কাশীবাবুকে একবার ডাকো।

কাশীবাবু আসলে ডাক্তার। কাশী ডাক্তার। তার জুতোর গোড়ালিতে ঘোড়ার নাল লাগানো থাকতো। তিনি এল এম এফ। রামকৃষ্ণের খুব ভক্ত ছিলেন। হাঁটলে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ জুতোয়। ডাক পেয়ে বারান্দায় এসে চুপচাপ বাবার কাছে সব শুনলেন। বাবার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। তখনো তাঁর চল্লিশ হয়নি। হাট্টাকাট্টা জোয়ান ছিলেন কাশী ডাক্তার।

সব শুনে কাশী ডাক্তার আমার চুলের মুঠি ধরলেন। তারপর নাল লাগানো সেই জুতো এক পাটি পা থেকে খুলে আমার পিঠে পায়ে গদাম গদাম করে বসিয়ে দিতে লাগলেন। আমার পিঠে রক্ত। হাঁটুতে রক্ত। এক সময় ক্লান্ত হয়ে নিজেই থামলেন।

থেমে বললেন, চল—ঘরের ভেতরে চল। মাকে ডেকে বললেন, লণ্ঠনটা দেবেন তো বৌঠান। একবার ল্যাংটো করে দেখতে হয় ছেলেটাকে—

ল্যাংটা হবো কি! আমার তখন চোখে জল, নাকে জল। ঠোঁট চেপে পিটুনী সইতে গিয়ে দাঁতের চাপে ঠোঁট কেটে রক্ত। আর পিঠে পায়ে তো রক্ত ছিলোই।

ঘর বন্ধ করে ধমকে উঠলো কাশী ডাক্তার। ল্যাংটা হ বলছি! হলাম। আমি যেন কুকুর বা ছাগল। তিনি লণ্ঠন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন। নাঃ, ভাল বোঝা যাচ্ছে না।—বলেই চেঁচিয়ে মাকে ডাকলেন, বৌঠান, একটা টর্চ দেবেন?

মা জানলা দিয়ে টর্চ দিল। কয়েকবার ফোকাস মেরে গম্ভীর গলায় বললেন, যা ভেবেছি! নে—প্যান্ট পরে নে—বলতে বলতে কানের ওপর এক চড় কষালেন।

তখন কাশী ডাক্তারের ওপর আমার একটুও রাগ হয়নি। রাগ হয়েছিল মা বাবার ওপর। আমি কি তোমাদের ছেলে নই? আমি কি তোমাদের কেউ নই? তোমাদের সামনে গরু পেটানোর মত আমায় পেটাচ্ছে—আর তোমরা চুপ করে আছো?

আমারও ইচ্ছে হচ্ছিল—বাবার মুখের সামনে হেরিকেন তুলে একগাল হেসে বলি—আশ্চর্য!

কাশী ডাক্তার ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে বললেন. একটা নতুন ওষুধ বেরিয়েছে। বরফের ভেতর রাখতে হয়। পেনিসিলিন। একবার ডাঃ রায়চৌধুরীর সঙ্গে কনসাল্ট করা দরকার।

কনসাল্ট করে রক্ত পরীক্ষা, ইনজেকশান, ওয়াশ সবই চলল। আমাকে সারাদিন মশারির ভেতর আলাদা রাখা হোত।

আমার যে ঠিক কোন্ রোগটা—আমি তা আজও জানি না। গনাদা? না

শেফালিদি ? পরে, অনেক পরে, বেশ কয়েকবার আমি সব রকম টেস্ট করিয়ে ফেলেছি। আমার আর কোন অসুখ নেই। একেবারে সন্দীপনের উপন্যাসের নাম বললাম।

পরে, অনেক পরে, একবার এক বন্ধু বলেছিল—ওটা কোন রোগই নয়। একরকমের চুলকুনি। কয়েকবার ইনজেকশন নিতে হয় মোটে। তারপর সব ক্লিয়ার। আমি সিওর হয়ে তো তবে বিয়ে করলাম !

তখন ট্রিটমেন্টের ঝক্কি আমার গায়েই লাগেনি। কিন্তু মনের ভেতর দিয়ে একটা রোড রোলার চলে গেল। চিরকালের মত বিষাদ কেমন করে আমার মনের ভেতর স্থায়ী ভাব হয়ে দাঁড়াল। আজও যা কিছু হাসিঠাট্টা, স্ফূর্তির ঝিলিক ওঠে মাঝে মধ্যে তা শুধু অন্তরা। স্থায়ী পর্দা সেই বিষাদ।

পাড়ার গার্জিয়ানরা তাদের ছেলেমেয়েদের আমার সঙ্গে মিশতে বারণ করে দিল। আমি চিকিৎসার সময় মশারির ভেতর থাকি। দিনের বেলাতেও। থালাবাটি গামছা সব আলাদা। যেন ডেটিনিউ। যেন জলবসন্ত হওয়ায় আলাদা ঘরে পরীক্ষার সিট পড়েছে। আলাদা গার্ড।

সেরে যাবার পর পাশের বাড়ির বারান্দাগুলোর পাশ দিয়ে ঘুরঘুর করি। আমাকে দেখেই সব বাড়ির ছেলেমেয়েরা উঠে বাড়ির ভেতর চলে যায়।

একদিন ফুটফুটে জ্যোৎস্নার সন্ধ্যায় বাড়ির সামনের মাঠে বেপাড়ার কিছু বন্ধুর সঙ্গে খেলছি। মা ছাদ থেকে বলল, এই ম্যাগাজিনটা নিয়ে যা পানু—

ওপরে গেলাম। মাসিক বসুমতী।

মা বলল, এই প্রবন্ধটা পড়িস।

আলোয় এনে প্রবন্ধটা দেখলাম। হীনমন্যতা ও তাহার প্রতিকার। নিচে নেমে এসে না পড়েই প্রবন্ধর পাতা তিনটে ছিঁড়ে কুচিকুচি করে ফেললাম। মাস কয়েক পরে স্কুল-হস্টেলে সরস্বতী প্রতিমার ডেকরেশন করছি—দেবদারু পাতা দিয়ে। রাত ন'টা হবে। পরদিন সকালেই পুজো।

পেছন থেকে অন্ধকারে আমার নাম ভেসে উঠল, পানু !

গম্ভীর গলা। এ তো মেজদার গলা। ঢাকা থেকে মেজদা কখন এল ? সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। হস্টেল কম্পাউন্ড পেরোতেই মেজদা মারতে শুরু করলো। হস্টেল থেকে আমাদের বাড়ি ছিল তিন মাইল।

মেজদা সে-রাতে আমায় মোট তিন মাইল মারলো। রাস্তার পাশের নাবি জমি। কিল চড় খেয়ে সেখানে গড়িয়ে পড়ছি। আবার উঠে আসছি। আবার চড় খেয়ে গড়িয়ে গিয়ে নিচে পড়ছি। আবার উঠে আসছি।

মেজদা সম্ভবত মায়ের চিঠিতে সব জেনেছিল। অনেকদিন পরে বাড়ি এসে আমায় অত রাত অব্দি ফিরতে না দেখে রাগ হওয়া তার পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিল।

নয়তো মেজদা আমায় খুবই ভালবাসতো। বড়দা চাকরির জায়গা থেকে ফিরে এসে মেজদার অনেক আগেই সব শুনেছিল। বড়দা সব শুনে বলেছিল—থাক, পানুকে কেউ আর কিছু বোলো না।

তনুদা আমায় কিছু বলেনি। লা মিজারেবল্ পড়তে দিয়েছিল। তাতে একটা লাইন ছিল। গড্! উড্ নট মাই চেইন-মেটস্ লাফ্ টু সি··· কনভিক্ট নাম্বার···হেজিটেটিং টু···

তখন সত্যিই মনে হয়েছিল—আমার কিছু শৃঙ্খল-সঙ্গী আছে। তারা অদৃশ্য। তাদের মত আমিও একজন কনভিক্ট। তারা সবসময় পাশাপাশি থেকে আমার সঙ্গে সঙ্গে খারাপ কাজ করে। নয়তো কিছুদিনের ভেতর সোনা-মুচিই বা আমায় জুতোপেটা করবে কেন?

বড়দার বিয়ের অল্পদিনের ভেতর সোনামুচির বিয়ে দেয় মা। বিয়ের কয়েক-দিনের ভেতর সোনামুচির একটা আঙটি হারায়। আমি তখন দাগী হয়ে পড়েছি। চোর সন্দেহে সোনামুচি আমায় পেটালো। পায়ের পাম্পসু দিয়ে। কিন্তু যে জিনিস আমি চুরি করিনি—তা ফেরৎ দেব কি করে! এমনিতে সোনামুচি কিন্তু আমায় খুব ভালবাসত।

এরপরই আমি সত্যি সত্যি একটি খারাপ কাজ করলাম। বিড়ি বাঁধতো আজাহারদা। তার বুকপকেটে সবসময় একটা রাঙা ফাউন্টেন পেন থাকতো।

পেনটা দাও তো আজাহারদা! একটু লেখা লিখে ফেরৎ দিয়ে যাবো।

পেনটা নিয়ে গিয়েই আড়াই টাকায় বেচে দিয়ে সেই পয়সায় শৃঙ্খলসঙ্গীদের নিয়ে সাদা পাটালি খেলাম। সঙ্গে কলের জল।

সন্ধ্যেবেলা আজাহারদা কলমটা চাইতে এলো। কোত্থেকে দেবো? তখন হিসেব কষতাম এইভাবে—একটা খারাপ কাজ করলে কতক্ষণ আর মারবে! বড়জোর আধঘণ্টা। তিনমাইল মারবার মত দম ক'জনের! কুঁজো হয়ে দম বন্ধ করে পিঠে মার খেলে ব্যথাও লাগবে না। তারপর তো ফ্রি। আমি যে তখন দাগী। তাই মার খাওয়া হয়ে গেলে চোখ মুছে বাড়ির পেছনের বাঁশবাগানে—কিংবা দূরে ভৈরবের পাড়ে গিয়ে নাক ঝেড়ে খিক্ খিক্ করে হাসতাম।

ভাবখানা—খুব ঠকানো গেল যাহোক! মেরে মেরে ওদের হাতের ব্যথা করাই সার। আমার তো আর তেমন লাগেনি। মাঝখান থেকে আড়াইটা টাকাই লাভ। দিব্যি পাটালি খাওয়া গেল পেটভরে। কলের জল দিয়ে পাটালি খেতে কী যে ভাল! সঙ্গীদেরও খাওয়ানো হোল। কত মারবি মার না! কত অপমান করবি কর না! আমার তো কিছু এলো গেলো না। মাত্র বিশ-ত্রিশ মিনিটের মারামারি অথবা গালাগালি। কিংবা দুটোই সাইমালটেনিয়াসলি। যাকে বলে যুগপৎ! অনেক পরে এর দোসর একটা শব্দ পাই—যুগোপযোগী। তা আমি আসলে যুগোপযোগী ধোলাই খাচ্ছিলাম।

তখন আমার চেইন-মেটস্ ছিল বিভূতি, মনোজ, আসফাকুল, মাখম, সোয়েদুল, নৃপেন, শান্তি। ওরা আমায় লুফে নিয়েছিল। শান্তির বাবা পুলিশ হাসপাতালে ডাক্তার ছিলেন। মাতৃহীন শান্তির সৎমায়ের অনেক ছেলেমেয়ে। শান্তি বাড়িতে মার খাবার পর বাড়ি থেকেই পোর্টেবল কলেরগান এনে মাঠে বসে ৭৮ রেকর্ড বাজাতো।

ম্যাট্রিক পাশ করেই দেশভাগের ঠিক পরে শান্তি এয়ারফোর্সে রেডার মেকানিক হয়ে ঢোকে। ঠিকানা: জালাহালি ক্যাম্প বাঙ্গালোর। খাওয়া থাকা পোশাক ছাড়াও মাসে নগদ একশো আশি টাকা। ওই পোস্ট থেকে কেউ কোনদিন পরীক্ষা দিয়ে ফ্লাইং অফিসার হতে পারে না। খুবই অসম্ভব। কিন্তু শান্তি হয়েছিল।

কমিশনড্ অফিসার। কলকাতায় এলে লাইটহাউসে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যেতো আমায়—পকেট-ভর্তি টাকা। তখনই নাকি ফ্লাইং অ্যালাউন্স নিয়ে মাসে তের-চোদ্দশো টাকা পেতো শান্তি। এই সময় গমের সের পাঁচ আনা। কাটা পোনার সের দু'টাকা। চালের মণ আঠারো টাকা। আমি বিভিন্ন পরীক্ষায় চাকরির জন্যে বসে যাচ্ছি—আর ফেল করছি।

এয়ারফোর্সে জেট প্লেন চালু হল। রিপাবলিক ডে-তে দিল্লীর মার্চপাস্টে শান্তি জেট চালিয়ে রাষ্ট্রপতির মাথার ওপর নেমে আবার মেঘের ভেতর উঠে গেল। কাগজে নাম দেখলাম আমরা কলকাতায় বসে।

একদিন আমি আর মনোজ টালা পার্কে বসে চিনেবাদামের খোসা ভাঙছি—আর মতলব ভাঁজছি কোথায় পয়সা পাওয়া যায়—এসপ্ল্যানেডে যাবো বাসে টিকিট না কেটে—কিন্তু অনাদিতে অন্তত দুটো মোগলাই খাবো। সন্ধ্যের ভেতর জ্যোৎস্না বেরিয়ে পড়েছে। হঠাৎ খেয়াল হল—পার্কের ভেতর টিউবয়েলের কাছে একটা লোক খুব ঘন ঘন সিগারেট ধরাচ্ছে!

কিরকম সন্দেহ হল। এত ঘন ঘন তো কেউ সিগারেট ধরায় না! একটা সিগারেটেই একটা দেশলাই খতম করে দিচ্ছে? আশ্চর্য! দু'জনে কাছে গিয়ে দেখি —সাদা ট্রাউজারের ভেতর সাদা শার্ট গুঁজে একটা লোক মাথা নিচু করে কেবল সিগারেট ধরাচ্ছে—আর জ্বলন্ত সিগারেটটা আগুনসুদ্ধু বাঁহাতের কবজিতে চেপে ধরে নিভিয়ে ফেলছে। আবার আগুন ধরাচ্ছে সিগারেটে—আবার কবজিতে আগুনটা চেপে ধরবে বলে।

পাগল নাকি! আমরা দু'জন একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম। মনোজ লোকটার হাত থেকে দেশলাই সিগারেট কেড়ে নিতেই সে রাগে আমাদের দিকে তাকিয়েই ছুটে তেড়ে এল।

শান্তি? তুই?

থতমত খেয়ে শান্তি দাঁড়িয়ে পড়ল—তোরা? এখানে? এখন?

আমরাও তো তাই ভাবছি—তুই ? এখানে ?

সেদিন আমরা তিনজন পার্কের ভেতর থেকে যখন রাস্তায় বেরোলাম—লাস্ট বাস চলে গেছে অনেকক্ষণ। অনাদির মোগলাই একবারও মনে পড়েনি আমাদের।

শান্তি শুধু বলেছিল—আর কোনদিন আমায় প্লেন চালাতে দেওয়া হবে না। ভাবতে পারিস ?

তাই বলে নিজের হাতে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিবি ?

শান্তি পিস স্টেশনে থাকার সময় এক এয়ার ভাইস মার্শালের বউয়ের সঙ্গে তিন-চারদিন টেনিস খেলেছিল। মহিলা ওকে খুবই স্নেহ করতেন। ব্যাপারটায় ভাইস মার্শালের চোখ টাটায়। ঠিক এই সময় একটা নতুন ধরনের প্লেন চালাতে গিয়ে শান্তি যন্ত্রপাতির ব্যাপারে আপত্তি বা সন্দেহ জানায়। ডাইভ মারার পরই উঁচুতে ওঠার সময় প্লেনটার যতটা তীব্রগতিতে ওঠার কথা—তা উঠছে না। শান্তির সন্দেহ—অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে।

বাঙালী ভাইস মার্শালটি বলল, তোমার আপত্তি লিখে দাও।

সরল বিশ্বাসে শান্তি লিখে দিল। সঙ্গে সঙ্গে শান্তির কোর্ট মার্শাল। বরখাস্ত। অপরাধঃ বিদ্রোহ। সশস্ত্র বাহিনীতে মুখে যা-ই বল তাতে যায় আসে না, কিন্তু একা যদি কিছু লিখে আপত্তি কর তো সেটা চরম বিদ্রোহ। ক'জন মিলে ওকথা লিখলে কিন্তু বিদ্রোহ নয়।

এত কষ্ট করে কমিশন পাওয়া শান্তির সামনে জগৎ অন্ধকার হয়ে যায়। সেই শান্তি বেকার হয়ে কলকাতায় ফিরে হাতে সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে চলেছে।

আমরা বললাম, চল ময়দানে গিয়ে ফুচকা খাবি। মন শান্ত হবে খেয়ে। সঙ্গে তেঁতুলের জল দেয়।

এছাড়া আমরা আর কি বলতে পারি ! মনোজ তখন ফার্স্ট এম বি বি এস পাশ করে টকসিসিটি, অ্যানাটমির বই বেচে দিয়ে রেস খেলছে। কলকাতা তো আছেই—বোম্বাই বাঙ্গালোরও বাদ যায় না। আমি তখন পুলিশের সার্জেন্ট থেকে অ্যাসিস্টান্ট সাব ইন্সপেক্টর অব একসাইজ—সব চাকরিতে পরীক্ষা দিচ্ছি। ইন্টারভিউ দিচ্ছি। একটাও গাঁথছে না।

সেই শান্তির ছবি দেখলাম সেদিন—স্টেটসম্যানে। কোন এক বিরাট ব্যাটারি কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারদের অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ের বক্তৃতার সঙ্গে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে শান্তির ছবি। ফুলো ফুলো গাল। যেন এই মাত্র জ্বলন্ত সিগারেটের ছ্যাকায় সারা মুখে ফোসকা উঠে ফোলা ফোলা।

শতাব্দী তখনো এমন ফুরিয়ে আসেনি। গোটা দুই মহাযুদ্ধ, কয়েকটা ঘূর্ণিঝড়, একটা করে ভূমিকম্প আর দুর্ভিক্ষ অভিজ্ঞতার ঝুলিতে ভরে শতাব্দী বেশ এগোচ্ছিল। পাকা আমটির মত সময়ের মগডালে মধ্যবিত্ত যৌথ পরিবার ঝুলছিল। কে জানতো দেশবিভাগের একটা ঢিল ছিটকে এসে লাগতেই সে

আমটিও টুক করে খসে পড়বে !

বড়দা মেজদা চাকরিতে ঢুকে পড়ায় আমাদের বাড়িটা তখন সবে ঝলমল করে উঠছে একটু। গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি। মালকোঁচা দিয়ে ধুতি পরে কালো পাম্পসু পায়ে বড়দা তার সাইকেল চালাতো। মাথায় কোঁকড়া চুল। টিকালো নাক। আমাদের ভাই বলেই মনে হত না। যেন অন্য কোন জায়গা থেকে বেড়াতে এসেছে বড়দা—এত সুন্দর। জ্যোৎস্নারাতে বড়দা বড়বউদি হারমোনিয়াম বাজিয়ে ডুয়েট গাইত। জগন্ময়ের গান—সাতটি বছর পরে। শ্রোতা আমি, টোটা, উমা, টাপু, মা। আশপাশের বাড়ির মেয়েরা।

পৃথিবী কী নিদারুণ স্পিডে পালটে যাচ্ছে। ইংরেজরা চলে যায়-যায়। বাবার বিশ্বাস হল না। বড়বউদির বাবাকে বলল, বেয়াই, আমার কেমন অবিশ্বাস হয়। ওরা সুন্দরবনে গিয়ে ওৎ পেতে বসে থাকবে।

একদিন ছুটির দুপুরে বড়দার বন্ধু নণ্টুদা এল। একটা দরজার খানিকটা ভেজিয়ে দিয়ে বড়দা হারমোনিয়াম আর বড়বউদিকে নিয়ে মাদুরে বসলো। নণ্টুদা তবলায়। নাগে তেটে তাগে ধিন। বড়বৌদি বেলো করে গাইছে। বাবা বাইরের বারান্দায় তেলের বাটি থেকে সর্ষের তেল নিয়ে মাখতে মাখতে বলল, যত্ত দুশ্চরিত্তিরের কাণ্ড !

মা ধমকে উঠলো, বল কি তুমি ? নতুন বিয়ে করেছে—একটু হাউস আহ্লাদ থাকবে না ?

নণ্টুটা তবলায় পাউডার ঢেলে চাটি দিচ্ছে তখন। আর মাঝে মাঝে সেই পাউডার খানিকটা নিজের ঘাড়েও মেখে নিচ্ছে। বড়বউদির গানের গলা ভারি সুন্দর। জানলা দিয়ে সে গান পাড়ার গাছপালার ভেতর দিয়ে যতীন সিংঘির মাঠের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে।

শরতের সঙ্গে একদুপুরে মনোদিদি আমায় অপমান, লজ্জা, গঞ্জনা, ধোলাইয়ের কুম্ভীপাকে ফেলে দিয়েছিল। আমাকে দেখে পাড়াপড়শী গার্জিয়ানদের সাবধান হয়ে যাওয়ার ভঙ্গীটা আমি যে আজও ভুলতে পারি না।

তাই স্থায়ী বিষাদ গায়ে মেখে আমি যখন নদীর পাড়ে, নির্জন রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি—আর ফাউনটেনপেন চেয়ে নিয়ে বেচে দিচ্ছি—চেইনমেটসদের নিয়ে এক-একটা খারাপ কাজের পর বিপদ কেটে গেলে খিক্ খিক্ করে হাসছি—তখন বড়দা বড়বউদির গান, ভনুদার রিসাইটেশন প্র্যাকটিস আমায় অন্য পৃথিবীতে নিয়ে যেতে লাগলো—যেখানে শোনার আনন্দে আমি বাকি পাঁচজনের সঙ্গে একই লাইনে পড়ি। আমাকে মশারি টানিয়ে তার ভেতর আলাদা রাখা হয় না।

মেজদা ছুটিতে এসে বাঁশ কেটে উঠানে বাঁশের বেঞ্চ বানাতো। এই বানিয়ে তোলার আনন্দে আমি মেজদার হাতে পেরেক হাতুড়ি দা এগিয়ে দিতাম। বেঞ্চ তৈরি হয়ে গেলে তাতে বসে পা দোলাতাম। যেন পার্কের বেঞ্চেই বসে আছি।

মেজদা তো একবার বাঁশের প্যারালাল বার বানালো। তাতে তনুদা আর মেজদার সে কি দোল খাওয়া! হাওয়ার ভেতর শরীরের অনেকটা উপরে উঠে আবার দুই বারের ভেতর এসে পড়ছে—আমি তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দোল খাই মনের ভেতর। আজও খাই।

উঠোনের ভেতর বেঞ্চ বানিয়ে পার্ক এনে ফেলা। প্যারালাল বার বানিয়ে জিমনাসিয়াম এনে ফেলা—এতে ছিল মেজদার ইচ্ছেপূরণ। বর্ষায় সে বেঞ্চ পচে যেতো। প্যারালাল বারের খুঁটি টলটলে হয়ে পড়ত। এক সময় মা সেগুলো রান্নার জ্বালানী করে ফেলতো।

ঘরের ভেতর হাঁটতে গিয়ে ট্রাঙ্কে গুঁতো খেতে হোত। নয়তো আলনায় কিংবা চৌকিতেও গুঁতো খেতাম। মেজদা ছুটিতে এলে চার-পাঁচদিন অন্দর সব জিনিস সরিয়ে নতুনভাবে ঘর ঠিক করতো। যাতে কিনা হাঁটাচলার সুবিধে হয়—আলো বাতাস খেলতে পারে। এইভাবে সরিয়ে নাড়িয়ে মেজদা কয়েকবারের মাথায় ঘরকে আবার শুরুর জায়গায় ফিরিয়ে আনতো। এই জিনিসটা আমি এখনো করি। মেজদার অনেক জিনিস আমার ভেতর এসে গেছে।

সেই এক দুপুরের অজানা মনোদিদি আমায় যে গাড্ডায় ফেলে দিল—তার নাম শুকনো কুয়ো—যার ভেতরে দাঁড়িয়ে আমার মাথার ওপরের গোলমত আকাশ দেখতে পাই শুধু। কিন্তু সেখানে যেতে পারি না। এই শুকনো কুয়োটায় সব অপমান গড়িয়ে এসে আমার দম বন্ধ করে দিচ্ছিল।

কোনক্রমে মাথা তুলে আমি নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম। আর সেই সময় দেখতে শিখছিলাম। তখনই খুব করুণ জিনিস দেখে তার ভেতরেই কোন জিনিসটা হাসির—তা আমি দেখে ফেলি। আমার হাসির ভেতর কোন জায়গায় করুণ গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ছে—তাও দেখতে শিখি।

মেজদা টিউশনির টাকায় মাকে এক শীতে র‍্যাপার কিনে দিল। কিনে দিল একটা স্টিলের ট্রাঙ্ক। আর নিজের জন্যে কিনলো একজোড়া স্যান্ডেল।

বড়দা ছুটিতে এসে সেই স্যান্ডেল পায়ে গলিয়ে মায়ের কাছ থেকে র‍্যাপারখানা চেয়ে বড়ুয়া স্টাইলে গায়ে জড়িয়ে আড্ডা দিতে বেরিয়ে গেল।

মেজদা রেগে বলল, দাদার বিহেবিয়ারটা একদম গাধার মত। মায়ের সেই সেন্টেন্সটা মুখস্থ হয়ে গেল। মা কথাগুলো রিপিট করে প্রায়ই হা-হা করে হাসতো। পরে র‍্যাপার বা স্যান্ডেল মেজদা-বড়দার আয়ের তুলনায় তুচ্ছ হয়ে গেল একদিন। তখনো মা এই সেন্টেন্সটা রিপিট করতো আর হাসতো।

এক একজনের এক একটা হাসি এক একটা কথা সময়ের সব লম্বা দৌড় টপকে একদম তরতাজা থেকে যায় চিরদিন। এই চিরদিন কথাটায় একটা আনন্দ আছে। আবার দুঃখও আছে। কঞ্চিতে ধুতির সুতো আটকে থাকার মতই খাঁজে একখানা হাসি কিংবা একটা কথার টুকরো আটকে থাকে। তার চারপাশ দিয়ে

গলগল করে পৃথিবী বয়ে গেছে। শুধু ওই জায়গাটায় সেই সময়টার খানিক খানিক চোরকাঁটার ধাঁচে বিঁধে আছে। এ বড় আনন্দের। এ বড় বিষাদের।

সোয়েদুল, আসফাকুল, হায়দার আলি, আনোয়ারদারা মুসলিম লিগ হয়ে গেল আচমকা। আসলে ওদের বাবারা কাকারা মুসলিম লিগ হয়ে গিয়েছিলেন। সবাই মাথায় ফেজ পরতে শুরু করে দিল। নমাজের স্রোত নামলো। কলকাতা থেকে নেতারা এসে সভা করতে লাগলেন। কবে আমাদের পূর্বপুরুষেরা কী অবিচার করেছেন ওঁদের পূর্বপুরুষদের ওপর—সেজন্যে নিজ বাসভূমে আমরা পরবাসী হয়ে উঠতে লাগলাম। তখনো জানি না—এতদিনকার নিজ বাসভূমি থেকে আমরা শীগগিরিই পাততাড়ি গুটিয়ে কলকাতা পাড়ি দেব।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গী শুধু আসরাফউদ্দিন চৌধুরী এই স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সভা করলেন। সে সভায় মুসলিম লিগ ইট মারলো। এতকাল পাশাপাশি বড় হয়েছি, কোত্থেকে এক অবিশ্বাসের মেঘ এসে হাজির। আর যুক্তিটা বড় অদ্ভুত। তুই জল ঘোলা না করিস—তোর পিতামহ প্রপিতামহ তো ঘোলা করেছে! এই যুক্তিতে আমরা আলাদা হয়ে যেতে থাকলাম। একটু একটু করে। সে যে কি কষ্টের।

গুরুজনরা বলতে থাকলেন—এখানে আর থাকা যাবে না। তার মানে—এই খেলার মাঠ, এই পুকুরঘাট, এই নদীর পাড়—এই সোয়েদুল, বজলা, ফেরদৌসদা—সবাইকে ছেড়ে চলে যেতে হবে? তা কখনো হয়?

আমাদের বন্ধু শুধু নাজিমের বাবা এর বিরুদ্ধে ছিলেন। ওঁদের বাড়ি সন্ধ্যেবেলা অরগান বাজিয়ে গান হোত। আব্দুল হাকিম কৃতী উকিল ছিলেন। হকসাহেবের সময় একবার বোধ হয় স্পীকার হন। তিনি বন্দেমাতরম গান হলে উঠে দাঁড়াতেন।

পাকিস্তান হবার পর সেজন্যে তাঁকে অনেক দাম দিতে হয়। তাঁর ছেলে আলো—ভাল নাম নাজিম মাহমুদ—আমরা নাজিম বা আলো বলে ডাকতাম, তাঁর আব্বার ট্রাডিশন আজও সমানে বয়ে চলেছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁরই উৎসাহে রবীন্দ্রসঙ্গীত মেলা বসে।

হেরিকেনের সামনে বসে ধাতুরূপ শব্দরূপ মুখস্থ করতে করতে একদিন সন্ধ্যেবেলা শুনলাম—দেশ ভাগ হবেই। আমাদের বাবা মা দেশভাগ যে হতে পারে তা কোনদিন বিশ্বাসই করেননি। সোয়েদুলের বাবা, আসফাকুলের বাবারা খুব খুশী হল। দেশভাগ পাকাপাকি ঠিক হয়ে গেছে। আমাদের বাবারা গুম মেরে গেলেন।

স্বাধীনতার দিন বিকেলেই চাঁদ উঠলো। প্রায় তখন সন্ধ্যে-সন্ধ্যে বলা যায়। আমি আর বজলা আবছা আলোয় একটা সাপ মারলাম। বজলা বড় সুন্দর দেখতে ছিল। সাহসীও খুব। রান্নার ছোট চ্যালাকাঠ দিয়েই ও সাপটাকে মারলো। আমাদের ইংরাজি র‍্যাপিড রিডারে টেলস্ ফ্রম গ্রিক ট্রাজেডিতে

অ্যাপোলোর গল্পটা ছিল। ওকে আমার অ্যাপোলো মনে হত।

মরা সাপটা পোড়াবার পর বজলা বলল, জানিস, কাল করাচিতে পাকিস্তান হয়েছে। ঢাকাতেও পাকিস্তান হয়েছে—

বাড়ি ফিরে ভেতরের ঘরে দেখি—মা গম্ভীর হয়ে বসে। ইন্ডিয়া স্বাধীন হচ্ছে আজ, অথচ মায়ের মুখে কোন হাসি নেই! স্বাধীনতা তো একটা বিরাট ব্যাপার। কেননা সবাই সব সময় এই নিয়ে কথা বলছে।

বাবা আজকাল সকাল সকাল কোর্ট থেকে ফিরে আসে। বড়দা তার কাজের জায়গায় চলে গেছে। যাবার আগে কয়েক মাস আগে মাকে বোঝাচ্ছিল—কীভাবে বড়দা সাইকেলে যাতায়াত করে ট্রেনের ভাড়াটা টি এ বিল পায়। কথাগুলো সব আবছা মনে আছে। অফিসের ক্যাম্প বসেছে গড়বেতায়। বড়দা মেদিনীপুর থেকে সাইকেলে শেষরাতে রওনা হয়। ঘণ্টা দুইয়ের ভেতর পেঁছে যায় ত্রিশ বত্রিশ মাইল রাস্তা। আবার সারাদিন কাজের পর সাইকেলে সন্ধ্যা-সন্ধ্যা মেদিনীপুর রওনা দেয়।

অনেক পরে ভেবে দেখেছি - তখনকার রেলে এই যাতায়াতে ক'টাকাই বা পাওয়া যেতো? যেজন্যে বড়দা এতটা সাইকেলে যাতায়াত করতো? তাঁর ইনজিনিয়ার ছেলেকে রোজ এয়ার কন্ডিশনড্ মোটর হায়দারাবাদ থেকে ত্রিশ মাইল দূরে সাইটে নিয়ে যায়। আবার সন্ধ্যেবেলা হায়দারাবাদে ফেরৎ দিয়ে যায়। চল্লিশ বছরের তফাতে ডিস্ট্যান্স সেই ত্রিশ বত্রিশ মাইল রয়ে গেছে। সাইকেলের জায়গায় এয়ার কন্ডিশনড্ গাড়ি।

মেজদার বেলাতেই বা কম কি?

দেশটা ভাগ হয়ে যাওয়ার কয়েকমাস আগে বাবা টেলিগ্রাম পাঠালো মেজদাকে, তাড়াতাড়ি এসো। মেজদা তখন ফরিদপুরের গাঁয়ে গাঁয়ে সরকারী রাজস্ব আদায় করে। কয়েকটা নদী পেরিয়ে মেজদা ভাঙা সাইকেলে কাদাপায়ে এসে হাজির। বাবা বলল, এখানে সই করো। এই চাকরিটা তোমার হওয়া উচিত। কালই লাস্ট ডেট। কলকাতায় গিয়ে নিজের হাতে জমা দিয়ে এসো অ্যাপলিকেশন। আমি হকসাহেবকে বলবো।

হকসাহেব সব শুনে বললেন, আমি তো আর ক্ষমতায় নাই মতিবাবু। তবু আমি বলে দেখি।

কাজটা হয়েছিল মেজদার। নিজের জোরেই ঠিক চল্লিশ বছরের তফাতে তাঁর ছেলে নিউইয়র্ক থেকে প্যারিসের কাছে চার্লস দ্যগল এয়ারপোর্টে উড়ে এল—বাবাকে রিসিভ করতে। মেজদা মেজবউদিকে আমেরিকায় নিয়ে যেতে।

বড়দার সাইকেলখানা ছিল মাসে ন'টাকার কিস্তিতে কেনা নতুন রাজ হুইট ওয়ার্থ। মেজদারখানা ছিল সেকেন্ডহ্যান্ড। ভাঙা। মেকারের নাম মুছে গেছে।

স্বাধীনতা টের পেলাম দিন পনেরোর ভেতর। মাস্টার, উকিল, ডাক্তার, পেশকার—সবাই ওপারে চলে যাচ্ছে। আমাদের ক্লাসটিচার এলেন এন ডবলু এফ পি থেকে। স্কুলের পর তিনি বাজারে যান বিকেলে। পায়ে বুট। গায়ে পাজামা পাঞ্জাবি। বাজার থেকে ফেরেন হাতে মুরগি ঝুলিয়ে।

আমরা যখন কলকাতার ট্রেনে উঠলাম—তখনো কোথাও কোন বড় রায়ট হয়নি। ট্রেনের জন্যে প্ল্যাটফর্মে বসে থাকা মানুষজনের জিনিসপত্তর বা আত্মীয়-স্বজন তুলে নিয়ে যাওয়া শুরু হয়নি তখনো। ট্রেন যায় আসে। পাসপোর্ট ভিসা তখনো তিন বছর দূরে।

আমরা যেন কলকাতায় বেড়াতে যাচ্ছি—আবার ফিরে আসবো। ফিরে এসেছিলাম। তবে পঁচিশ বছর পরে। ইন্ডিয়ান আর্মির ট্যাংকের পেছনে জিপ গাড়িতে বসে। ওয়ার নভেল ভান্দা ভাসিলিয়া ভাস্কার দি রেইনবো উপন্যাসে অ্যাডভান্স রাশিয়ান ট্যাংক যেমন ককেসাসে ফিরে এসেছিল। পিছু-হটা জার্মান আর্মিকে তাড়া করে। সেকথা অন্যসময়।

।। সাত ।।

স্বাধীনতা অব্দি শতাব্দী চলে এসেছে একচালে। তারপরে শতাব্দীর চাল অন্যরকম। বিদায় পরাধীনতা! বিদায় শৈশব!! বিদায় কৈশোর!!

দেশভাগের আগে শতাব্দীর সব জানার কথা নয় আমার। কিছুটা আমি জেনেছি। বেশির ভাগই আমি মায়ের মুখে শুনেছি। বাবা, পিসিমা, আত্মীয়-স্বজনের মুখের ছায়ায় দেখেছি। আর বাকিটা পড়েছি। কখনো পুরনো প্রবাসীর পাতায়। কখনো নীলাঙ্গুরীয়, ধাত্রীদেবতা, অপরাজিত, পল্লীসমাজ, ঘরে বাইরে-তে।

বাকিটা টু এ্যান্ড টু আন্দাজে।

ফুলতলা, যশোহর, ঝিকরগাছা, বেনাপোল, বনগ্রাম, গোবরডাঙা—সব স্টেশনেরই চেহারা ছিল এক। ইঞ্জিনের পোড়া কয়লা দিয়ে ঘেঁষের রাস্তা। দু'ধারে রেললাইন ধরে মেকানিয়া লতায় ঢাকা আধো জঙ্গল। কে ভেবেছিল ওসব জায়গায় কলেজ, ব্যাংক, হাসপাতাল হবে একদিন!

শিয়ালদহে নেমে বড়দা আমাদের চা খাওয়াতে নিয়ে গেল প্ল্যাটফর্মের স্টল-ঘরে। জাপানে হোটেলে বাথটাবের গরমজলে ধোঁয়া ওঠে না। আর শিয়ালদহে গরম চায়ে ধোঁয়া ওঠে না।

দু'টোই আমার চোখে দেখা। হোটেলের বাথটাবে পা দিতেই জাপানী গরম জলে ফোস্কা পড়ার যোগাড়। আর শেয়ালদায় চায়ের কাপে ঠোঁট ছোঁয়াতেই জিভ পুড়ে গেল। হাত থেকে ফসকে পড়ে গেল চায়ের কাপ। সঙ্গে সঙ্গে চৌচির।

নতুন দেশে এসে এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা।

তখনো উদ্বাস্তুর ঢল নামেনি এপারে। তখনো ব্লিচিং পাউডারের গন্ধ মেশানো নরক চারিয়ে দেওয়া হাওয়া শেয়ালদার প্ল্যাটফর্মে স্থায়ী বাতাস হয়ে ওঠেনি।

ভাগ্যিস মেজদা বড়দা কলকাতায় চাকরি করতো। নয়তো তাহেরপুর কিংবা কুপার্স ক্যাম্পে লাইন দিয়ে আমাদেরও সরকারী ডোল নিতে হোত।

বাবার রিটায়ারের মুখে দেশটা ভাগ হয়ে গেল। দাদাদের চাকরি হওয়ার দিকে মা তাকিয়ে ছিল। চাকরি হল। দেশটাও ভাগ হল।

মা বাবাকে যে আবার নতুন করে সংসার শুরু করতে হল।

মায়ের মুখেই শুনেছি—বাবা চাকরি পেয়ে তিন বছরের বড়দাকে নিয়ে প্রথম সংসার পেতেছিল ঢাকা সদর ঘাটের কাছাকাছি বাংলাবাজারে বাসা ভাড়া করে। তখন মায়ের পনের বছর। বাবা সাতাশ। এর তেষট্টি বছর পরে মাত্র এই তিন বছর আগে—তখন বাবা মা অনেকদিন হল নেই—ঢাকায় ঠিকানা মিলিয়ে বাংলাবাজারে সেই বাসাবাড়ি খুঁজে বের করেছিলাম। সাধারণ ছোট ছোট জানলা দরজার এক বাসাবাড়ি মাত্র। ওখানে তেষট্টি বছর আগে এক নবীন দম্পতি তাদের প্রথম সন্তানটিকে নিয়ে কত আশা কত স্বপ্ন দেখতে দেখতে প্রথম সংসার পেতেছিল। তখন কেউ জানতো কি—দেশটি স্বাধীন হয়ে যাবে—দেশটা ভাগ হয়ে যাবে একদিন!

গিয়ে দেখি বাবার সেই বাসাবাড়ি তখন এক সাইকেল রিপেয়ারিং শপ। তার উল্টোপিঠের ফুটপাথ থেকে পেছনদিককার বুড়িগঙ্গা অব্দি শুধুই বইয়ের দোকান। ঢাকার কলেজ স্ট্রীট। ওই নবীন দম্পতি কি জানতো সেদিন, একদিন তাদেরই এক ছেলে তার বই ছাপার রয়ালটি নিয়ে কথা বলতে তেষট্টি বছর পরে ওই বইপাড়াতেই ঢুকবে!

সংসার পাতার সময় সব বাসাবাড়ি ঘিরেই স্বপ্ন থাকে। আশা থাকে। তারপর সেই সব বাসাবাড়ির জানলায়-চৌকাঠে উই আসে। ভাঁড়ারঘরে ইঁদুর জন্মায়। গাঢ় বর্ষায় সেখানে ফরফর করে আরসোলা ওড়ে। সংসার বড় হয়ে একদিন ভাগ হয়ে যায়। দেশটাই ভাগ হয়ে যায়!

কলকাতায় এল সেই নবীন দম্পতি। তখন তাঁরা আর নবীন নন। আমরা অনেকে এসে গেছি। বড় হয়ে গেছি। মা বাবা তখন স্মৃতিতে ক্ষতবিক্ষত। প্রথম জীবনের নদী, উঠান, সহজ জীবন কলকাতার কঠিন পাথরে এসে আছাড় খেল। এর নাম স্বাধীনতা। এর নাম দেশভাগ।

উনষাট বছর বয়সে প্রধানমন্ত্রীর চাকরি পেয়ে জহরলাল দিল্লির খোলামেলা বড় বাড়িতে উঠে গেলেন।

চুয়ান্ন বছর বয়সে আমাদের বাবা মতিলাল রিটায়ারের মুখে মুখে কলকাতায় বাসাবাড়ির এক খুপরি ঘরে উঠে এলেন।

সেখানে একরাতে চোর এল। তারা তোরঙ্গ ট্রাংক হাতড়ে মনোমত কিছু না পেয়ে রাগের চোটে আমাদের রিফিউজি সার্টিফিকেটগুলো কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে রেখে গেল। ফলে আমরা কোনদিন উদ্বাস্তু হিসেবে কোন কিছুর জন্যেই অ্যাপ্লাই করতে পারিনি। অনেকদিন পরে লুধিয়ানার বাইরে জি. টি. রোডের ওপর কাঙ্গেনওয়াল নামে এক গাঁয়ে গিয়ে দেখি—একটি উদ্বাস্তু পরিবারের চাষ-বাসের মাঠের গায়ে তাদের নতুন বসতবাড়িটির অনেকগুলো ঘরই এয়ারকন্ডিশনড্। সামনে চাষের মাঠে ট্রাক্টর। নামের পাশে নতুন গজানো বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ, এম. এস -সি. ডিগ্রি। তাদের ফ্যামিলির আধখানাই থাকে ক্যানাডায়।

আগে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার পাতায় একটা বনেদী কাপড়ের দোকানের বিজ্ঞাপন থাকতো। দোকানটার নাম ছিল—জহরলাল পান্নালাল মতিলাল। জহরলালকে তো চিনলাম। মতিলাল তো আমাদের বাবা—আবার জহরলালের বাবাও হতে পারেন। কিন্তু এই পান্নালালটি কে?

মায়ের হিরো ছিলেন জহরলাল। আবার এই জহরলালই ছিলেন বাবার ভিলেইন। দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। কিন্তু তাতে কি যায় আসে!

স্বাধীনতার রথ ছুটছে তখন।

দেশনেতাদের তখন নতুন চাকরি। অঢেল ক্ষমতা তাঁদের। বাড়িভাড়া, বাজারখরচা, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনো নিয়ে ভাবতে হয় না একদম। ওঁরা স্বপ্ন দেখছিলেন। আমরা সেই স্বপ্নে চাপা পড়ে যাচ্ছিলাম। কারণ আমাদের বাড়িভাড়া, বাজারখরচা, গাড়িভাড়া, ডাক্তারের ভিজিটের টাকা দরকার।

ভাগ্যিস আমরা অনেক ভাই হয়েছিলাম। বিশেষ করে বড়দা মেজদা হয়েছিল। বাবা যযাতির রাস্তা নিল। জরা নয়—আমাদের নিতে হল বড়দা মেজদাকে। উইথ নো গ্রাজ।

কোন কর্তব্য করছি এই ভাবে—বা বিরক্তি মিশিয়ে বড়দা মেজদা আমাদের দেখেন নি কোনদিন। টাপু তো বড়দার ছেলের বয়সী। বরং আমরাই যেন বড়দা মেজদার ছেলে ছিলাম।

মেজদার সঙ্গে টাপু এক সর্দারজীর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেল। টেবিলে অনেকগুলো ডিমসেদ্ধ সাজানো ছিল। সাত বছরের টাপু ভাবলো—ওগুলো তাকেই দেওয়া হয়েছে। সাতটি ডিমসেদ্ধ, এক মগ চা আর খানিকটা রাই খেয়ে চলে এল টাপু।

কলকাতায় থাকার বাড়ি ঠিক করেছিল মেজদা। মাসে পঁয়ষট্টি টাকা ভাড়া শুনে মা তো আহ্লাদে এক শিশি ঢেঁড়সের বিচি নিয়ে এসেছিল এপারে আসার সময়। অত ভাড়া যখন—নিশ্চয় ঢেঁড়স বোনার মত উঠোন আছে।

মালুম হতে লাগলো—কলকাতা একটা শহর নয়—আসলে একটা দেশ, যার সব কিছু কোনদিনই দেখা হয় না।

এক একদিন এক এক দিকে যাই। কখনো ফাঁকা ট্রামে। কখনো পায়ে হেঁটে।

একদিন ট্রামে এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে এক বন্ধু বলল, উনি পঙ্কজ মল্লিক। তখন কি জানি—এর প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পরে ওই মানুষটিরই আত্মজীবনী ছাপার জন্যে আমার কাছে আসবে! এমনও হয়েছে—সারাদিন সুর করে পঙ্কজ স্টুডিওর বাইরে বাঁধানো চত্বরে বসে আছেন। আমরা নিতান্ত অর্বাচীনের মতই গিয়ে বলেছি—ওই গানটা কি করে করলেন? একটুও বিরক্ত হননি আমাদের বোকামিতে। রাস্তা দিয়ে রিক্শা-সাইকেল যাচ্ছে। পড়ন্ত বেলা। উনি গুনগুন করে সুরটা গলায় তুলেছেন।

একদিন হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে দেখি রাস্তার পাশে কিছু লোক বাঁশবন কাটছে। জায়গাটার ভেতর এখানে ওখানে কবরখানা। পুলিশের গাড়ি এল। আমাদের বাড়িতে থাকতেন কুমুদদা। তিনিও বাঁশ কাটছেন। পুলিশ গুলি চালালো। আমরা ছুটে পালালাম। পরদিন শুনলাম—দু'জন মারা গেছেন।

ক'দিনের ভেতর দেখলাম—সেখানে অনেক চালাঘর উঠেছে। এখন সেখানে দোতলা বাড়ি—হাজার পাঁচেক মানুষ থাকেন। রাজেন্দ্রপ্রসাদ কলোনী। কুমুদদা প্রেসিডেন্ট ছিলেন। মারা গেছেন। এঁদো ডোবা বুজিয়ে মানুষের পর মানুষ বসে গেছে—যে যেখানে পেরেছেন। ওঁদেরই পরেরকার মানুষ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এজিটেটর, টিচার, কাউন্সিলর। ভাষা, ইতিহাস, রাজনীতি মানুষের এই ঢল নামায় সব বদলে গেল।

এই সময়টায় কলকাতার রাস্তায় খুব মিছিল বেরোতো। পুলিশও প্রায়ই গুলি চালাতো। ডোল, কুপার্স ক্যাম্প, তাহেরপুর, মেহেরচাঁদ খান্না কথাগুলো প্রায়ই শোনা যেতো।

সুরমাদি তো একদিন সন্ধ্যেবেলা বড়দার কথায় কোন জবাব না দিয়েই অন্ধকার বারান্দা দিয়ে রাস্তায় নেমে গিয়েছিল। তারপর সেই টানা ক'দিনের বৃষ্টিতে চারদিক সাদা হয়ে গেল। বিয়ে করে সুরমাদি নদীপথে বরের সঙ্গে চলে গেল। ভেবেছিলাম আর কোনদিন দেখা হবে না।

দেখা হল ডক্টর্স লেনে। কলকাতায় এক বিশাল বাড়িতে। রিফিউজিদের ট্র্যানজিট ক্যাম্পে। দু'পাশে দুটো বাচ্চা সুরমাদির পা জড়িয়ে। আরেকটা বাচ্চা কোলে। তাকে দুধ দিতে দিতে সুরমাদি জানতে চাইল, হ্যাঁরে, তোর বড়দার বিয়ে হয়েছে?

কবে!

বউ কেমন দেখতে হয়েছে রে?

খুব সুন্দরী।

তোর দাদা কি করে?

চাকরি করে। সংসার করে। তাস পেটায় অফিসের পর।

সারা বাড়িটায় যাত্রাপার্টির রিহার্সালের মতই এলোপাথাড়ি চীৎকার। বড় বড় ট্রাংক মেঝে ঘষটে টানার আওয়াজ। অসংখ্য শিশুর কান্না। তার ভেতর সুরমাদির মুখখানা বড় মিইয়ে গেল। চোখের নিচে অন্ধকার ছায়া। সব সময় প্রেমের যে গতি সেই গতি দেখলাম। সুরমাদির কী-ই বা করার ছিল! সে একটা স্বপ্ন পুষে রেখেছিল, সেটাও ভেঙে গেল।

তখন আমাদের দেশটাই ভেঙে গেছে। আমাদের কোন ঠিকানাই নেই। শুধু ভেসে বেড়ানো। আজ এর সঙ্গে দেখা হয়—কাল ওর সঙ্গে। খুলনার সঙ্গে যশোরের। ফরিদপুরের সঙ্গে কুমিল্লার। সবাই কলকাতার রাস্তায়। আর খবরের কাগজ খুললেই প্রতিশ্রুতি। তখন বাস্তুহারা কথাটা সবে জন্মেছে। কেউ বলে রিফিউজি। কেউ বলে রেফিউজি।

ওর ভেতর সুরমাদি কোথায় চলে গেল মনেও রাখতে পারিনি।

কত বাল্যবন্ধু যে অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যবসায় নেমে পড়লো। বাতাসে পাঁউরুটির ডিউ স্লিপ উড়ছে। নামী স্বাধীনতা-যোদ্ধারা বাস্তুহারাদের নেতা হলেন কেউ—কেউ বা হারিয়ে গেলেন। ওর ভেতরেই বড়দা মেজদা আমাদের নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন। স্বাধীন দেশ। যদি পড়াশুনো করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি আমরা।

এই সময় বড়দা সরকারী জমিজমা বিভাগে ছিলেন। অনেক লোক আসতো বড়দার কাছে। এখন কলকাতার গায়ে যেসব জায়গা করপোরেশনের ভেতর শহর —কাঠা এক লাখ দেড় লাখ—তখন সেসব জায়গায় ছিল আমবাগান বাঁশবন। তাও বাস্তুহারারা জবরদখল করছিল। সেসব জায়গার মালিকরা ক্ষতিপূরণের জন্যে বড়দার কাছে কাগজপত্র নিয়ে আসতেন। এদের একজনের শ'খানেক বিঘা জায়গা—টালিগঞ্জ ট্রামডিপোর কাছে—জবরদখল হয়ে যায়। ফলে তিনি পাগল হয়ে গেলেন আমাদের চোখের সামনে। অত্যন্ত ভাল লোক ছিলেন তিনি। মুসলমান। প্রায়ই তিনি আমাদের বাড়ি আসতেন। চা খেতেন। হা-হা করে হাসতেন। তখন তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি বুকপকেট উপুড় করে দিয়ে দিতেন। যা থাকতো পাওয়া যেতো।

একদিন আমিও চাইলাম। পকেট উপুড় করে তিনি দিলেন। বড়দা কিছুই জানেন না। পেলাম একশো উনিশ টাকা। তাই দিয়ে কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম। কলেজে পড়তে পারাটাই তখন পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা। এভাবেই আমার উচ্চ-শিক্ষার দরজায় পা দেওয়া। কিন্তু ওই কাণ্ডটা না করলে ভদ্রলোক পাগল হতেন না। আমরাও খালিহাতে কলকাতায় এসে ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরতাম না।

কোন এক ক্যাম্পে একদম তিষ্ঠোতে না পেরে একদিন দুপুর রোদে আমাদের এক পিসতুতো দিদি খুঁজে আমাদের বাড়ি চলে আসেন। নিঃসন্তান বিধবা।

আমাদেরও তখন তাঁর জন্যে কিছু করার ক্ষমতা ছিল না। দিনের শেষে হতাশ হয়ে তিনি ফিরে যান। সারাদিন গরমের পর কলকাতা তখন ধুঁকছে। আজও জানি না—তিনি কোথায়।

এখন একবিংশ শতাব্দীর কথা শুনে সেই দিদির ছবি মনের ভেতর চমকে ওঠে। কত নতুন মানুষ এল। ইন্ডিয়া কত এগিয়ে গেল। পুরো দেশটাকে ব্যাঙক পেপারের মত আলোয় ধরলে জলছবির মতই সেই দিদির নিরুপায় মুখখানা ভেসে ওঠে।

বাবা কোনদিন সিনেমা দেখেননি। কিন্তু ঢাকা থেকে একখানা সিনেমা সাপ্তাহিক কলকাতার স্টলে এলে আমি বাড়ি আনতাম। বাবা আলো জ্বালিয়ে পড়তেন। শেষে দেখি বাবা কাগজটার বডি ম্যাটার পড়েন না। পড়েন জায়গা-গুলোর নাম। পটুয়াখালি, ১০ ডিসেম্বর। কক্সবাজার, ১৭ অক্টোবর।

আমার এখনো মনে হয়—দেশবিভাগটা আসলে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া কোন ট্রেন দুর্ঘটনা। রিলিফ ভ্যান আসেনি।

বজলার দাদা ফেরদৌসদা আমাদের আগেকার শহর থেকে এপারে কলকাতায় এসেছিলেন বছর তিনেক আগে। আমরা ওখান থেকে চলে আসার সময় তিনি ছিলেন লিগের ছাত্রনেতা। উৎসাহী রাজনৈতিক কর্মী।

গত তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ন্যাপ করেন। আগাগোড়াই সব জামানাতেই পুলিশের বিষনজরে। বহুবার অ্যারেস্ট হয়েছেন। দুই বিয়ে। দ্বিতীয়া হিন্দু। সেই সুবাদে কলকাতা শ্বশুরবাড়ি। এ-পক্ষের ছেলেরা স্কলার। বিদেশে বড় বড় জায়গায় গবেষণা করছে তারা।

সেই যে চলে আসি ছেলেবেলার শহর পেছনে ফেলে—তার ছবি সবসময় মনে ভাসতো। ছবিটা আসলে কাঁটার মত বিঁধে ছিল মনের ভেতর। সেই কাঁটা তুললাম ঠিক তার পঁচিশ বছর পরে। তখন পূর্ব পাকিস্তান বাঙলাদেশ হয়ে উঠছে। ভারতীয় জওয়ানদের সঙ্গে ছোটবেলার শহরে ঢুকে দেখি কিছুই চেনা যায় না। মনে হয়েছিল—শহরে ঢুকতেই রাস্তার ঘাসগুলো আমায় চিনতে পারবে। শেষে বাজারে গিয়ে ইলিশ মাছগুলোর মুখোমুখি হলাম। সেই সরু মুখ। মৃত চোখ। একটার ওপর আরেকটা গাদি দেওয়া। ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বললাম --তোমাদের ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দাকে বালকবয়সে বাবার সঙ্গে বাজারে এসে কিনে নিয়ে গিয়েছি। তিনি বেশ তেলালো ছিলেন। সেই সুবাদে তোমাদের সঙ্গে আমার কি আজকের সম্পর্ক? এবারে নিশ্চয় চিনতে পেরেছো! ইলিশরা সেদিন কেউ কোন জবাব দেয়নি।

খুঁজতে খুঁজতে ফেরদৌসদাকে পেলাম। মুসলিম লিগের এককালের ছাত্র-নেতা। শুনলাম—একাধিক বিয়ে। টেক্সটবুকের ব্যবসা। যে বউদিকে নিয়ে তখন থাকেন—শুনলাম তার ছেলেরা খুব কৃতী। পরমাণু বিজ্ঞানী।

অর্থনীতিবিদ। এই বউদি হিন্দু। মা-বাবার সঙ্গে কলকাতা পালাবেন বলে রেলস্টেশনে এসে ট্রেনের জন্যে বসেছিলেন। তখন ফেরদৌসদা তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে বিয়ে করেন। আশ্চর্যের কি! ঠিক এইভাবেই তো নানান রক্তধারা মিশে গিয়ে একটি জাতি হয়—কয়েকশো বছরে।

মেজদা গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল। বড়দা রেকলেস। আমরা ক'জন তখন পড়ি। বাবার বয়স্ক বন্ধু ভাগ্যধরবাবু অবিবাহিত। জেলখাটা মানুষ, হোসিয়ারি ব্যবসা করতেন। এক একদিন শেয়ালদা থেকে বড় কচ্ছপ হাতে ঝুলিয়ে আমাদের বাড়ি চলে আসতেন—বৌঠান, ভাল করে রাঁধেন তো!

দা, ছেনি নিয়ে কাটাকাটির পর অনেক ঝাল দিয়ে সেই রান্না নামতো কোন কোনদিন রাত বারোটায়। খেয়ে শুতে শুতে রাত প্রায় দুটো। আমরা কি গরিব ছিলাম? জানি না। আমরা কি লোভী ছিলাম? জানি না। তবে হজম হত ভাল। শুলে আজও ঘন ঘুম হয়। পড়তে ভাল লাগে। খেতে—হাসতে—ঝগড়া করতে—কিছু একটা বানিয়ে তুলতে আরও ভাল লাগে। তা শেষ পর্যন্ত হোক বা না হোক।

বড়দা অফিসের কাগজ এনে আমাদের দিয়ে ভরাট করাতো কলমের ঘরগুলো। তখন নতুন নতুন জায়গা উদ্বাস্তুরা দখল করেছে। তার ক্ষতিপূরণ। নতুন নতুন জায়গা নিয়ে সরকার এয়ারস্ট্রিপ বানাচ্ছে। তার ক্ষতিপূরণ। বহুরকমের লোক আসতো। কেউ খাবার নিয়ে—কেউ ফাউন্টেনপেন নিয়ে।

আবার কেউ কেউ আসতো ছোট হলুদ বই নিয়ে। তাই নিয়ে অঙ্ক কষতো বড়দা। রেস সেই বেলা দু'টোয়। সেজেগুজে বড়দা বেরোতো। ফিরে আসতো গম্ভীর মুখে। কোনদিন বা হাসিমুখে।

কেউ আসতো তাসের প্যাকেট হাতে। বড়দা তাদের সঙ্গে রাত কাবার করে দিত। এদেরই একজন খোকনদা, জেলে খাবার সাপ্লাই করতো। আমরা কোন কোনদিন জেলগেটের কাছে থলে হাতে গিয়েছি। খোকনদা থলে ভরে মাংস দিয়েছে। ওজন না করা। হয়তো আস্ত একখানা রাং। কিংবা শিরদাঁড়া। এতসবের ন্যায়-অন্যায় কোনদিন কেন যে আমাদের ছুঁতে পারেনি—সেটাই আশ্চর্য। বহুকাল পরে আমেরিকায় এক কৃতী ডাক্তারের সঙ্গে তার নিজের সাসেগা—১৮০ বিমানে করে তারই র‍্যানচে গিয়ে নামলাম। ছেড়ে দেওয়া হরিণ শিকার করলেন ডাক্তারবাবু। ঘোড়ার পিঠে বসে। আমি জিপগাড়িতে। সেই হরিণের দাবনা জ্বলন্ত আগুনে ঝলসানো হোল। আমরা কামড়ে কামড়ে খেলাম। অতদিন আগে জেলগেট থেকে পাওয়া খাসির আস্ত দাবনা কিন্তু আমরা পিস পিস করে কেটে রান্নার পরেই খেয়েছি। সময়ের এই ব্যবধানের দুই দুয়ারে আমি দুই রকমের জন্তুর দু'খানা দাবনা এখন পরিষ্কার দেখতে পাই।

উমা গান শিখতে শুরু করার বছর দুইয়েকের ভেতর ওর মাস্টারমশাই দু'চার

জায়গায় ওকে গান গাওয়াতে নিয়ে যেতে লাগলেন। কখনো দক্ষিণা নিয়ে গান গাইতে গিয়ে একই মোটরে উমাকেও নিয়ে যেতেন মাস্টারমশাই। সঙ্গে আমিও থেকেছি। একবার একটা ছোট মোটরে সবার সঙ্গে আমিও গাদাগাদি করে যাই। সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। দুর্গাপুর ব্রিজ সাবধানে পার হওয়ার পর সবাই স্বস্তি পেল। কেননা ওখানে নাকি গাড়ি থেকে লোক নামিয়ে জিনিসপত্র কেড়ে নেওয়া হয়। জায়গাটা বড় নির্জন ছিল।

সামনে জীবনের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা—ম্যাট্রিকুলেশন। পরীক্ষাই মনে হয় না। ট্রেনে করে কলকাতায় চলে আসা। প্রায়ই উদ্বাস্তু সমাবেশ। মিছিল, গুলি। আর ম্যাটিনি শোয়ে দিলীপকুমার নুরেজাহানের 'জুগনু'। দিলীপ-কুমারের আত্মহত্যা ভোলা যায় না।

ট্রাজেডি যে কেন এত ভাল লাগতে লাগলো জানি না।

টোটো, উমা, টাপু স্কুলে। তনুদা বি এস-সি দেবে। সারাদিন পড়ে। মোটা মোটা কেমিস্ট্রির বই। একপাশে টলস্টয়ের আনা কারেনিনা।

শীতের বিকেলে তনুদা মন দিয়ে টলস্টয়খানা পড়ে। একমাথা কালো কোঁকড়া চুল। লম্বাচওড়া ফর্সা চেহারা। গম্ভীর। সামনেই টেস্ট। একদিন সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে বেরিয়ে আর ফিরলো না।

পরদিন তো মেজদা বড়দা থানায় খবর নিল। সেদিনও কোন খবর পাওয়া গেল না। তার পরদিন সকালে অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের মৃতদেহের খবর পেয়ে লেক হাসপাতালে গিয়ে তনুদার ডেডবডি পাওয়া গেল।

সুইসাইড।

পটাসিয়াম সায়ানাইড।

আজও আমরা কারণ জানি না। তনুদার সুবাদে কেওড়াতলার সঙ্গে পরিচয় হল।

মা আধপাগল! বাবার চোখের মণি অস্থির—ধোঁয়াটে। মেজদা একদম গম্ভীর। বড়দা চুপ করে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে।

আমি কুস্তির আখড়ায় ভর্তি হলাম। পুলিশফাঁড়িতে। তেল মেখে শেষরাতে বুকডন, বৈঠক। তারপর মাটি মেখে কুস্তি। কুস্তির শেষে ওস্তাদকে পিঠে নিয়ে সারা আখড়া আড়াইবার পাক খাই। এতে নাকি কোমরের জোর হয়।

দেখতে দেখতে সুঠাম চেহারায় গোঁফ রাখতে শুরু করলাম। ধুতি পাঞ্জাবি পরে সুধীরলালের পপুলার গীত গাই গুনগুন করে। সারাদিন কলকাতায় টহল দিই আর ভোররাতে সর্ষের তেল পাইনট করে গায়ে মেখে ডন-বৈঠক। মাটি সমেত ওস্তাদ গায়ে রগড়ানি দেয়। পটপট করে গায়ের লোম উঠে যায়।

॥ আট ॥

একদিন ভোরে কুস্তির আখড়াতেই খবরের কাগজ এল। আততায়ীর গুলিতে গান্ধীজী নিহত।

আগের সন্ধ্যাতেই রেডিও শুনেছি।

কাগজ আসতেই কুস্তি বন্ধ করে রাখা হল। তখনো তিনি জাতির জনক হয়ে ওঠেননি। গান্ধীজী কথাটা জন্ম থেকেই শুনে এসেছিলাম। দুঃসংবাদে কলকাতার রাস্তায় মানুষের ঢল নামল। কথাটার মানে বুঝলাম।

আমাদের বাবা-কাকারা ওঁকে নিয়ে বিভক্ত ছিলেন। কেউ অপছন্দ করতেন। কারণ, পোকায় কাটা স্বাধীনতা। কেউ মনে করতেন—উনি অবতার। স্বাধীনতার সময় থেকে যাঁরা ওঁকে সবচেয়ে নিন্দামন্দ করেছেন—কিছুকাল দেখছি তাঁরাই ওঁকে সবচেয়ে বেশি মানেন। এখন মনে হয়—মহাপুরুষ কখনো ফিকে হয়ে আসেন—আবার কখনো দেদীপ্যমান।

ক'মাস আগে তনুদা আত্মঘাতী। তারপর গান্ধীজী নেই। কলকাতায় আশেপাশে উদ্বাস্তুরা সন্ধ্যের দিকে ফাঁকা জায়গা পেলেই দখল করে। পুলিশ ভ্যান ছুটে যায়। বর্ডারের ওপার থেকে আত্মীয়স্বজন এলে কেউ কাউকে চিনতে চায় না।

এর ভেতর শীত যায়-যায়। কিন্তু আমাদের ম্যাট্রিকুলেশনের রেজাল্ট তো বেরোয় না।

সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরলে মেজদা ডাকে, কোথায় ছিলি ?

ভূগোলের নম্বর জানতে গিয়েছিলাম।

কোথায় খাতা পড়ল ?

সেন্ট জেভিয়ার্সে। ফাদার ফেয়ারব্যাঙ্কের হাতে—

তখন রবিবার মর্নিং শোয়ে ডগলাস্ ফেয়ারব্যাঙ্ক্সের থ্রি মাসকেটিয়ার্স দেখা হয়ে গেছে।

কত পাবি ?

মেজদার মুখে হাসি ফোটাতে বলেছিলাম—বোধহয় বেয়াল্লিশ—

তাহলে তো লেটার পাবি জিওগ্রাফিতে ? কি বলিস ?

ভাল স্টুডেন্টের মত লাজুক মুখে বললাম—তাই তো দেখছি।

মেজদা ঝালিয়ে নিল, ভূগোল তো পঞ্চাশের ভেতর ?

হুঁ।

এইভাবে এক একদিন সন্ধ্যেবেলা এক এক সাবজেক্টের কথা বলে গেছি

মেজদাকে। কোনোটায় লেটার এক্সপেক্ট করছি। কোনোটায় একটুর জন্য মিস করছি। যেটায় মিস করছি—সেটার জন্যে সন্ধ্যেবেলা মেজদার সামনেই আপসোসের চুকচুক শব্দ করছি জিভে। আমার সঙ্গে সঙ্গে মেজদাও আপসোসের শব্দ করছে মুখে—চুক্‌চুক্‌। একটুর জন্যে লেটার মিস করলি হিস্ট্রিতে—

দুপুরের কলকাতা বড় মনোহারি। একখানা টিকিট কেটে ছবিঘরে ঢুকলে অনেকক্ষণ সবকিছু ভুলে থাকা যায়। চোখের সামনে পর্দায় রূপকথার জগৎ। সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরলে অফিসফেরৎ মেজদার মুখোমুখি। তখন সব কাল্পনিক নম্বর বলে যাওয়া। এইভাবে বলতে বলতে আমি যে স্ট্যান্ড করার মত রেজাল্ট বলে বসে আছি—তা খেয়ালই করিনি।

তনুদা নেই। টোটো, উমা, টাপু স্কুলে। আমাকে নিয়ে মেজদা-বড়দার অনেক আশা। আমি স্কলারশিপ নিয়ে বেরোলাম বলে।

এরকমই এক সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরে দেখি হাওয়া অন্যরকম। আমি যখন দুপুরে ছবিঘরের রূপকথার রাজ্যে ছিলাম—তখনই রেজাল্ট বেরিয়েছে। মেজদা অফিসে বসে খবর পেয়ে রেজাল্ট নিয়ে বাড়ি ফিরেছে।

বারান্দায় পা দিয়েই দেখি মেজদা আমারই অপেক্ষায় পায়চারি করছে। দেখতে পেয়েই আমায় এক চড়। একটুর জন্যে লেটার মিস! একদম রয়াল ডিভিশন !!

কথা বলতে বলতেই মেজদার হাত নেমে এল। কষে আর এক চড়।

পুরনো অভ্যেসে সে চড় ভুলে গেলাম। পরদিনই টোটোদের সঙ্গে লেকের মাঠে বল পেটাতে চলে গেলাম। যেখানটায় রোজ খেলা হয়—সেখানটায় বিরাট প্যান্ডেল। কংগ্রেস হচ্ছে। আমরা কাছাকাছি ফাঁকায় খেলছি—খেলতে খেলতে কাদায় একাকার। সেই সঙ্গে লেকে চুটিয়ে ডুবসাঁতার। সন্ধ্যের মুখে ভিজেগায়ে ডাঙায় উঠে দেখি—দেদার পুলিশ। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা দরকার। আমি আর টোটো ডেকরেটরের টিনের দেওয়ালে ফোকর দেখে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। আমাদের গায়ে জল। খালি গা।

এলাহি কাণ্ড। বুকে ব্যাজ লাগিয়ে হাজার হাজার লোক বসে।

টোটোকে নিয়ে আমি ডায়াসের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেলাম। মাথার ওপর কাঠের পাটাতন। নিচে কাঠের টুকরো। পেরেক। বাঁশের টুকরো। মাথা তুললেই পাটাতনে ঠুকে যায় মাথা।

এরই ভেতরে পুলিশও হামাগুড়ি দিয়ে আমাদের দু'ভাইকে তাড়া করলো।

জায়গাটা আমাদের চেনা। শরীরটা আমাদের পুলিশের চেয়ে ছোট। তাই পুলিশ পারবে কি করে আমাদের সঙ্গে?

মাথার ওপর কাঠের পাটাতন আর শেষই হয় না। পায়ে কাঠ লেগে কেটে যাচ্ছে। পুলিশের তাড়া। দম বন্ধ হওয়ার জোগাড়। একটা ফোকর দিয়ে

মাথা তুলে নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে দেখি—ক'হাত দূরে সুন্দর গদির ওপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে যিনি চোখে চশমা লাগিয়ে কাগজ দেখছেন মন দিয়ে—তাঁর ছবি তো রোজ ছাপা হয় কাগজে। কী গায়ের রং।

টোটো এসে একই জায়গায় মাথা তুলেছে। জওহরলাল!

ও আর নিজেকে সামলাতে পারেনি। মুখফসকে বেরিয়ে গেছে নামটা।

আমাদের খালি গা। ভিজে মাথা। পুলিশ পাটাতনের নিচে অন্ধকারে আমাদের শুধু পা দেখে হয়তো ভেবেছে শালকাঠের প্যালা।

নেহরুর চারপাশে আরও অনেক চেনা চেহারা। একজন তো গোবিন্দবল্লভ।

টোটোর গলায় নিজের নাম শুনে নেহরু তাকালেন। প্রথমে চমকে গেলেন। পরেই চশমা খুলে আমাদের ভিজে মাথা—খালি গা দেখেই বোধহয়—খুব মোলায়েম করে হাসলেন। তখন বুকে ব্যাজ লাগানো একজন মাইকে বক্তৃতা দিয়ে চলেছেন। জোর গলায়। চাদ্দিকে আলোয় আলো।

আমি আর টোটো পাল্টা একই সঙ্গে জওহরলালের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। সেই সঙ্গে নিশ্চয় বিস্ময়ও ছিল আমাদের চোখে মুখে।

পুরো ব্যাপারটাই কয়েক সেকেন্ডের। হাঁটুর কাছাকাছি পুলিশের দাপাদাপি টের পেয়েই আমরা দু'জনে একই সঙ্গে সেই ফোকর দিয়ে গলে গিয়ে আবার চেনা অন্ধকারে হামাগুড়ি দিতে দিতে প্যান্ডেলের বাইরে চলে এলাম।

আমাদের মায়েদের হিরো, বাবাদের ভিলেন, ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রীকে এরপরে অনেকবার কাছের থেকে দেখেছি। তখন গায়ে জামা—মাথা আঁচড়ানো আমার। কিন্তু অমন স্নেহের চোখে মোলায়েম করে হাসতে তাঁকে আর দেখিনি। মৃত্যুর আগে তাঁর শেষ জনসভা বোধহয় ছিল ভৈসালোটনে। ভারত আর নেপালের একটি যৌথ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধন করতে যান সেখানে। তখন ও'র আর সেই মুখশ্রী নেই। সেই গলার স্বরও নেই। মুখ ফুলে গেছে। গলা ঘড় ঘড় করে। ক'দিন পরেই মারা গেলেন। কংগ্রেস অধিবেশনের ব্যস্ত মঞ্চে বসেও কয়েক সেকেন্ডের জন্য তিনি আমাকে আর টোটোকে চিনতে পেরেছিলেন। তার মানে আমরা কে হতে পারি? কেমন হতে পারি? নিশ্চয় সিকিউরিটি রিস্ক নই। ভুল চিনলে তো চেঁচিয়েই উঠতেন।

কলেজে যাচ্ছি, ধুতি পাঞ্জাবি পরি। ভোররাতে সর্ষের তেল মেখে বুক ডন মারি আড়াইশো। গা গরম হলে লাফ দিয়ে আখড়ার মাটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ি। যে সে মাটি নয়—কলসী তিনেক দুধ ঢালা হয়েছে। তারপর নিমপাতা। আগে ছিলাম পুলিসফাঁড়ির আখড়ায়, এখন চলে এসেছি ট্রামডিপোর আখড়ায়। দশাসই ড্রাইভারদের সঙ্গে দঙ্গল লড়ি।

লড়ালড়ি মানে কসরৎ। দম তৈরি। ঘাম ঝরানো। আধা পাঁচ। দুই পায়ে কাঁইচি মার। ডান হাতের তালু দিয়ে ডবল বয়সের ড্রাইভারের ঘাড়ে থাবা

লাগানো। শরীরটা হয়ে উঠলো চাবুক।

দুপুরে চানটান করে কলেজে যাবার সময় ট্রামে টিকিট লাগে না। ভোর-রাতের ওস্তাদ তো তখন ট্রাম-ড্রাইভার। আমায় দেখে বেপট জায়গায় গাড়ি স্লো করে আমায় তুলে নেয়। উঠে আসুন খোখাবাবু—

সেসব ড্রাইভার রিটায়ার করে এখন দেশে চলে গেছে। কাউকে কাউকে পরে চশমা চোখে দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন করতে দেখেছি ট্রামে।

স্কুলে টানা ক্লাস। কলেজে মাঝে মাঝে অফ পিরিয়ড। তখন শ্রীহরি মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে খুরির চায়ের সঙ্গে লবঙ্গলতিকা। সে লবঙ্গলতিকায় সত্যিই একটা আস্ত লবঙ্গ বসানো থাকতো। দাঁতে কাটলে মুখের ভেতর লতিকা আলাদা স্বাদের হয়ে উঠতো।

বাবা রিটায়ার করে একটা জমির সন্ধান পেয়ে সাড়ে তিনটাকায় পঞ্চাশ ফুটের এক টেপ কিনলেন। বললেন, চল তো সঙ্গে। চার কাঠা মোট দু'হাজার টাকা চাইছে। মেপে দেখতে হয়—চার কাঠা ঠিক কতটা। এতগুলো টাকা তো আর জলে দেওয়া যায় না।

বাবার সঙ্গে দুপুররোদে মাপতে গেলাম। ফাঁকা মাঠ। যুদ্ধের কিছু বাচ্চা ট্যাঙ্ক ফেলে গেছে আমেরিকানরা। সেগুলো মাঠের শেষে কালীঘাট রেল স্টেশনের গায়ে গাদিমারা। এদিক ওদিক ধানচাষের পর কাটা বিচুলির নাড়া। সদ্য চালু স্টেটবাস বুড়োশিবতলার দিকে ঘুরে বেহালা চলে যাচ্ছে।

বাবা অনেক মেপে বললেন, লোকালিটি হতে অনেক দেরি হবে এখানে। ফাঁকা মাঠে দু'হাজার টাকা তো ছড়ানো যায় না।

বাবা ছড়ালেন না। কয়েক বছরের ভেতর জায়গাটার নাম হল নিউ আলিপুর, দুপুররোদে যে জায়গাটা বাবার সাথে ফিতে মেপে হদ্দ হয়েছিলাম—ঠিক সেখানটায় এক পেল্লায় বাড়িতে এখন অ্যাটমিক এনার্জির অফিস।

আগেকার দাম পরে দেখছি—সব সময়ই সস্তা লাগে। কিন্তু সময়মত সেই টাকাটা ক'জনেরই বা হাতে থাকে! থাকলেও ক'জনেই বা কিনে ফেলে! কিনতে পারলে পৃথিবীর গা থেকে খানিকটা মাটি কেটে নিয়ে তা পুড়িয়ে তবে তো ইট। সেই ইট দিয়ে ঘিরে তবে তো শক্তপোক্ত বাড়ি। তাতে ছুটিয়ে বাস করে গুষ্টির সুখ। দরকারমত ঘর বাড়ানো। একরকমের স্বাধীনতা। কিংবা তৃপ্তি। ছোটবেলায় ভাই হলে তার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলতাম—ও ছোটভাই, কেমন আছো? বড় হলে সঙ্গে নিয়ে খেলেছি। বয়স হলে টেলিফোনে খবর রাখি—কি খবর? কেমন আছো?

কিন্তু আমাদের এক মাসতুতো দাদা—সুবলদা—নিজের সহোদরদের তো দেখতেনই—সময় করে আমাদেরও খবর নিতেন। আসতেন। গল্প করে মায়ের মন ভাল করে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। যেমনি দেখতে তেমনি বড় চাকরি করতেন

সুবলদা।

সুবলদা আমায় দেখেই বললেন, ও তো ব্রিলিয়ান্ট।

মা শুনে 'থাক' বলে মলিন করে দুঃখের হাসি হাসলেন। আমি তখন পড়াশুনোয় বিদ্যাসাগর। মেজদা বড়দা আমায় নিয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার দশা।

সুবলদা আমায় ডেকে বলল, তোর দরকার কনসেনট্রেশন। মনটা এক জায়গায় কর!

সুবলদাকে কাজের জন্যে সারা পৃথিবী ঘুরতে হোত। কলকাতায় এলে গ্রেট ইস্টার্নে উঠতো। বোম্বাইয়ে তাজ। বিদেশী কোম্পানীর বড় চাকরি। সুন্দর চেহারা, সুন্দর হাসি। সবার খোঁজখবর নেয় সুবলদা।

আমার তখন সবই ভাল লাগে। শুধু পড়াশুনো বাদে। বিশেষ করে কোন মেয়ে হেঁটে গেলে মনে হচ্ছিল—এই বুঝি খানিকটা বাতাস শাড়ি পরে চলে গেল। নিজের শরীরটা নিয়ে কি করবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। গোঁফ রাখি। আয়না দেখি। ট্রামের জানলার সিটে বসে বাতাস খাই। কলকাতায় তো কেউ জানে না—মা আমায় এক সন্ধ্যেবেলা 'হীনমন্যতা ও তাহার প্রতিকার' পড়তে দিয়েছিল। সুবলদা বলল, আয় তোকে মাইন্ড একাগ্র করার রাস্তা দেখাচ্ছি। মা কালীর এই ফটোখানা কাছে রাখ। রোজ ভোরে ফটোখানা টেবিলে রেখে মা কালীর পায়ের দিকে একমনে তাকিয়ে থাকবি।

থাকলাম।

বেশ, থাকলি তো! এবারে মন থেকে সব চিন্তাভাবনা বের করে দে—

দিলাম।

দিয়েছিস তো? যখন দেখবি মনে আর কিছু নেই—তখন দম বন্ধ করে বুকের মাঝখানটায় একখানা পুরনো ব্লেড দিয়ে সামান্য চিরে নিবি—

কী সর্বোনাশ!

কিছু সর্বোনাশের নয়। বুক চিরে যেই একফোঁটা রক্ত বেরোবে—অমনি তা আঙুলের ডগায় তুলে মা কালীর পায়ে দিবি। মনে রাখিস, সবটাই দমবন্ধ অবস্থায় করবি।

সে সময় যদি কিছু মনে ঢুকে পড়ে?

মন থেকে তা তাড়িয়ে দিবি। ঘুম থেকে উঠে রোজ ভোরে এমন করবি।—বলতে বলতে সুবলদা পকেট থেকে চটি একখানা ইংরাজি বই বের করে দিল। নে—রেখে দে কাছে—

কালী দি গডেস। বাই বিবেকানন্দ।

কথামত বই, ফটোখানা আর একখানা পুরনো ব্লেড টেবিলে রাখলাম। সবই করি। বুক চিরে রক্ত দিতে দিতে সে জায়গাটা কালো হয়ে উঠলো। দমও বন্ধ করে থাকি। কিন্তু মন তো ফাঁকা করে ফেলতে পারি না। যে ভাবনাটাই তাড়াই

—সেটাই চিটেগুড়ের মত মনের ভেতর ঝুলে থাকে। মহা মুস্কিল!

একদিন সেকথা সুবলদাকে বললামও।

সব শুনে সুবলদা বলল, ভাবনাগুলো কেমন বল তো একবার?

তুমি শুনে কি করবে! তুমি তো আমার মনে ঢুকে সেগুলো তাড়িয়ে দিতে পারবে না! আর সত্যি বলতে কি, সব তো এখন মনেও পড়ছে না সুবলদা—

আজকেরটাই বল! তবে সত্যি কথা বলবি পানু।

এই ধর যেমন—আজ যতই দম বন্ধ করছি—ততই নার্গিস ভেসে উঠছিল মনে। আবার ভৈরবের বুকে ইলিশের নৌকোও ভেসে উঠছিল মনে। নার্গিসকে তাড়াই তো নৌকো ফিরে আসে। নৌকোটাকে তাড়াই তো নার্গিস ফিরে আসে। অতক্ষণ তো দমবন্ধ করে থাকা যায় না সুবলদা। প্র্যাকটিকাল দিকটাও তো ভাববে—

নার্গিস কিভাবে আসছিল?

হালচাল ছবিতে পাঁচিলের ওপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে নার্গিস। পেছনে পেছনে দিলীপকুমার—

দমবন্ধ অবস্থায় চোখ বুজে আগে দিলীপকুমারকে তাড়াবি। ওয়ান বাই ওয়ান।

দিলীপকুমারকে নিয়ে ততটা অসুবিধে ফেস করিনি। চোখ বুজতেই দিলীপ-কুমার মুছে গেল। কিন্তু নার্গিস?

কেন? একই তো প্রসেস!

উঁহু সুবলদা। চোখ বুজলেই নার্গিস বরং আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন—

তখন কি করলি?

অন্য ভাবনা দিয়ে নার্গিসকে তাড়াতে গেলাম। নিয়ে এলাম ভৈরবের বুকে দেখা ইলিশ ধরার ভাসন্ত নৌকো—পাল—জাল—সবকিছু একসঙ্গে। কিন্তু সেই জালে দেখি নার্গিস জড়িয়ে যাচ্ছে।

তোর প্রসেসে একটা বড় ভুল হয়ে গেছে পানু!

কিরকম?

যে রোগের যা। নৌকো দিয়ে কি নার্গিস কাটে!! নার্গিসকে কাটান দিতে চাই নলিনী জয়ন্ত। যেমন কিনা দিলীপকুমারকে কাটান দিতে চাই অশোক-কুমার। পাওয়ারফুল জিনিসকে মন থেকে ইরেজ করতে পাওয়ারফুল জিনিস। যদি দেখলি নলিনী জয়ন্ততেও হচ্ছে না—তো সুরাইয়াকে আন—

ওদের যাতায়াত অব্দি দম থাকবে?

না হয় একবার নিঃশ্বাস নিয়ে ফের দম নিবি।

শেষে দু'জনেই যদি মনের ভেতর বসে থাকে?

ওরা কখনো পাশাপাশি চুপ করে থেকে যেতে পারে না। কাটাকুটি করে আপনাআপনি কাটান ছাটান হয়ে যায়।

সুবলদার এই প্রসেস আমি বেশিদিন ফলো করতে পারিনি। সাঁইত্রিশ আটত্রিশ বছর পরে এই প্রসেস নিশ্চয় একটা হাসির কথা। কিন্তু এই মানুষটি হাসির ছিলেন না। খুবই অ্যাকশনের মানুষ ছিলেন। ছিলেন সরস আর সহৃদয়। আমার চেয়ে বাইশ বছরের বড়। দুই যুদ্ধের মাঝখানের যুবক। স্বাধীনতার পরেকার মধ্যবয়সী। শতাব্দীর আশিভাগ কাটিয়ে এই তো সেদিন চলে গেলেন।

তনুদা আত্মঘাতী হতে মা পাগল হয়ে যায়। মায়ের মনটা ভাল করতে সুবলদা আমাদের সবাইকে নিয়ে বর্ধমানে বেড়াতে চললো। সবাই মানে—মা, আমি, টোটো, উমা, টাপু। বর্ধমানে তখন সুবলদার পরের ভাই মাখনদা সরকারী চাকরে। পুরনো বড় বাড়ি।

সে বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে শঙ্খচিল মেরে প্রথম বন্দুক চালানো শিখলাম। সেখানে মাখনদার বউকে আমার খুব ভাল লাগলো। বউদির ভাই এসেছিল পাটনা থেকে। আমারই বয়সী। রোজ সন্ধ্যায় শ্যাম সায়র থেকে বেড়িয়ে ফিরে দোতলার বড় ঘরে গানের মজলিশ বসতো। মাখন বৌদির ভাই আমায় একটা জিনিস শেখালো।

দুপুরে চান করে উঠে বৌদির ভাইয়ের দেখাদেখি ভিজে চুলে অ্যালবার্ট কেটে মাথা-সই-সই নারকেলদড়ি বেঁধে রাখতে শুরু করলাম সারা দুপুর। চিবুকসুদ্ধ মাথা দড়ি দিয়ে বাঁধা বলে অনেক কষ্টে ভাত খেতে হোত। কেননা ওই অবস্থায় দড়ির বাঁধন উতরে হাঁ করা বেশ কঠিন ছিল। আমরা দুজনই তখন মাথার চুল রবিন মজুমদারের কায়দায় কিছুটা ঢেউ খেলানো করতে চেয়েছিলাম।

বৌদি একদিন ধমকে উঠলো, তুমি দড়ি বেঁধেছো কেন? তোমার মাথার চুল এমনিতেই কোঁকড়ানো!

এখনো পরিষ্কার দেখতে পাই—বড় দোতলা বাড়ির একতলায় উঠোনের সামনে সিঁড়িতে ওঠার মুখে হাসি চেপে কী এক অপরূপ ভঙ্গীতে বৌদি দাঁড়িয়ে। কী যেন জানতে পেরেছে এমন চাপা চোখে আমায় বলছে—তোমার মাথার চুল তো এমনিতেই কোঁকড়ানো!

বাইরে জানালার আকাশে তখন শিমুলতুলো পরের পর উড়ে যাচ্ছিল। এখন সেগুলোকে মনে হয় সময়ের গোল্লা।

বৌদিকে আমার সেই থেকে ভালো লাগল। একরকমের অন্য ধরনের ভালো লাগা। বোধহয় কোন এক ধরনের সুন্দরকে চিনতে পারার আনন্দটাই সেই বয়সের ভালো লাগা হয়ে উঠেছিল। এখন তো তাই মনে হয়।

শ্যাম সায়রের বাঁধানো চওড়া পাড় ধরে কলমের আমগাছ। একটা লাল রংয়ের সুরকির রাস্তা ফটক দিয়ে রাজবাড়ির ভেতর চলে গেছে। কী ভোরে কী সন্ধ্যায় সে রাস্তায় তারার গুঁড়োর প্যাটার্নে ঘিয়ে রংয়ের বকুল ফুল পড়ে আছে। এখনো দেখতে পাই।

সুবলদা আমায় মহিষাদলের রাজবাড়িতে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিল। কী কারণে যেন বাড়িটা তখন পরিত্যক্ত। রাজবাড়ির সামনের গোলাপবাগানটাও পরিত্যক্ত। কেননা ডগডগে ফুটন্ত লাল গোলাপের উপর দিয়ে মাকড়শার অবিচ্ছিন্ন জাল। মালি এলে তো এটা হতে পারতো না। এমন কি ফড়িং বা বোলতা-ভীমরুল এলেও নয়। এতটাই পরিত্যক্ত। শুধু বাতাস আসে। আর আসে আলো।

বিকেলের মুখে আমি আর সুবলদা রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। কাঠের মেঝে আমাদের পায়ে দপদপ করে উঠলো। সেই সঙ্গে ধুলো। ভাঙা জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েছে দেওয়ালের অয়েল পেন্টিংয়ে। সে ছবির ক্যানভাস ত্যারচা করে ছিঁড়ে যাওয়ায় মনে হল—ছবির রাজার গলা কাটা গেছে।

সুবলদাকে তখন আমি বলে বসলাম, বৌদিকে আমার আলাদা মতন খুব ভাল লাগে।

যেন কোন অপরাধের কথা বলছি—এমন ভঙ্গী আমার গলায়।

সুবলদা বলল, তাতে কী হয়েছে! তোর বয়সে এটাই স্বাভাবিক। কাউকে দেখে ভাল লাগবে—এটা যে চোখে লাগার বয়স।

আমার জীবনে সুন্দর লাগার এই প্রথম প্রকাশ্য লেসন। যা আমার মনে অকারণে অপরাধ বোধ জাগিয়ে রাখতো—তাই সুবলদা স্বাভাবিক করে দিল স্বচ্ছন্দ কথায়। স্বচ্ছন্দ হাসিতে।

ঘরে জায়গা কম। আমি সুবলদা বারন্দায় শীতলপাটি পেতে শুয়েছি। গরমের রাত। চাঁদ জায়গা বদলে বদলে আলো ফেলছে। সে জ্যোৎস্নায় যেন একটা তাপ ছিল। ঘুম ভেঙে যাচ্ছিল। কটা রাত বোঝা যায় না। এই সুবলদা ঠিক আমার নিজের দাদাদের মত নয়। সুবলদা কি মনোদিদির কথা জানে? কিংবা শুনেছে? এক এক জন মানুষের এক একটা ভঙ্গী আমার মনে যে গেঁথে যায়। কেউ যে চোখে লেগে যায়।

নিজের শরীরটাকেও তখন নতুন নতুন ভালবাসতে শিখেছি। ধুতি পাঞ্জাবি পরলে চেহারায় যুবকের আভাস। গলার স্বর কিছুকাল আগে ভেঙে যায়। সেই স্বর আবার গাঢ় হতে শুরু করেছে। জেগে ওঠা কণ্ঠমণি পাতলা মাংসে ঢাকা পড়ছে। মুখের চোয়াড়ে ভাবটা মিলিয়ে যাচ্ছে।

ঘুম ভেঙে গেল শরীরেরই ঝাঁকুনিতে। নিজেই ঝেঁকে উঠে একসময় থেমে গেলাম। এতক্ষণ যেন জ্যোৎস্নার ফোয়ারার ভেতর চান করছিলাম। সেরকমই লাগছিল। সে চান যেন ঘুম ভাঙাতেই ফুরিয়ে গেল।

কি হোল? অ্যাঁ?—বলেই সুবলদা উঠে বসলো। করেছিস কি? গা তো ভিজিয়ে দিলি!

আমি তো চোর। খুব লোয়ার ক্লাস চোর। তখন মাঝে-মধ্যে ঘুমের ভেতর

শরীরটা ঝাঁকুনি দিয়ে অমন দু'এক রাতে হয়ে যেতো।

যা পাজামা পালটে আয়।

ঘরে গিয়ে পালটালাম তো। অন্ধকার ঘর। দাঁড়িয়ে আছি। কী করে আবার—কোন মুখে সুবলদার পাশে গিয়ে শোব!

শুয়ে পড় এসে। এখনও অনেকটা রাত আছে—

প্রায় চোখ বুজে এসে শুয়ে পড়লাম। খানিক আগে কি কোন স্বপ্ন দেখেছিলাম? পাছে সুবলদার গায়ে গা লাগে—তাই প্রায় কুঁকড়ে শুয়েছি। স্বপ্নে যে কেন দোষ করে বসি? আশ্চর্য, স্বপ্নটাও তো মনে নেই! শুধু মনে আছে—ঘুমটা খুব পাতলা ছিল। আর সারা শরীরটা যেন এইমাত্র জ্যোৎস্নার ফোয়ারায় চান করে উঠলো। জোৎস্নার জলটাও একটু গরম ছিল। এখনো সেই হলুদ স্ফটিক জলের হলদে দাগ গায়ে লেগে আছে।

অমন শুলে কি ঘুম হয়? ঠিক করে শো!

তবু আমি কুঁকড়ে থাকি।

সুবলদা তখন পাশ ফিরে শুয়ে যেন নিজেকেই বলছিল—স্বপ্নদোষে আবার দোষের বালাই কি রে পানু? অমন তো সবারই হয় একটা বয়সে। নে ঘুমো। কাল ভোরে আবার তোদের নিয়ে রসুলপুরের দিকে যাবো।

নিশুতি রাতে সে গলা ছিল আমার কাছে দেবদূতের আশ্বাস। নিজেকে হীন না মনে করার পরোয়ানা। সুবলদা বোধহয় কাশী ডাক্তারের বয়সীই হবে!

সুবলদা যে বিদেশী কোম্পানীতে বড় কাজ করতো—তাদের সদর ছিল আমেরিকার দেলোয়ার স্টেটে। অনেক পরে একদিন সকালে নিউইয়র্ক থেকে ট্রেনে ওয়াশিংটন যাচ্ছি। একটা স্টেশনে ট্রেন থামলো। দেখি স্টেশনের নাম—দেলোয়ার। কাছেই একটা নদী। খোঁজ নিয়ে জানলাম—নদীটার নামও দেলোয়ার।

প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লাম। ট্রেন চলে গেল। সেই নিশুতি রাতের পর তিনটে যুগ কেটে গেছে। সেদিনকার স্বপ্নদোষ ছিল আতঙ্ক। আজ তা তুচ্ছ ব্যাপার। দেলোয়ারের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সুবলদার সেই কোম্পানীর হেড অফিস খুঁজে পেলাম। এখানে সুবলদা কতবার এসেছে।

তখন সুবলদা কলকাতায়। আবার স্টেশনে ফিরে এলাম। সুবলদা অনেকদিন হল রিটায়ার করে বাড়িতে। বেরোন কম। একমাত্র ছেলে বড় হয়েছে। বিয়ে দিয়েছেন তাকে। সুলদার মতন বৌদিরও শরীর ভাল নয়। আমি সেদিন সুবলদার কথা মনে করতে করতে দেলোয়ার স্টেশনে দাঁড়িয়ে নিজের অজান্তেই অনেকক্ষণ ধরে দু'টো কথা আওড়াচ্ছিলাম মনে মনে।

দেলোয়ার হোসেন! দেলোয়ার হোসেন!!

পরের ট্রেনে উঠলাম। ভীষণ স্পীডে যায় গাড়ি। একসময় কামরার

ভেতরটা খুব অন্ধকার আর ঠাণ্ডা হয়ে এলো। শুনলাম—ট্রেন চলেছে দেলোয়ার নদীর তলায় অনেক নীচু দিয়ে—টানেলের ভেতর দিয়ে।

আজও মনে হয়—আমি সুবলদার সঙ্গ, অভিজ্ঞতা, কথা বলার ঢঙ, জীবনের দিকে তাকানোর কায়দার ভেতর দিয়ে ভীষণ স্পীডে ছুটে চলেছি। সুবলদা আমার টানেল। আজও তাঁর ভঙ্গী আমার ভেতর পরমাণু বিকিরণ ঘটিয়ে চলেছে।

সুবলদা একদিন চলে গেল। তাঁর যাওয়াটাও একেবারে অন্যরকমের। সেকথা বলার সময় আসুক।

আমার কলেজ পাড়াটাকে আমি বলি আমার যৌবনের উপবন। ট্রামে বসে কলেজের তেতলায় চোদ্দ নম্বর ঘরের করিডর দেখা যায়। ওই গেটে কত বক্তৃতা দিয়েছি। ওই বারান্দায় সরস্বতী প্রতিমা তুলে হলঘরে নিয়ে যেতাম। ওখানটায় দাঁড়িয়ে প্রিন্সিপাল আমায় দাবড়েছিলেন। ওই পানের দোকানে আমরা ওয়াইল্ড ওডবাইন সিগারেট কিনতাম। ইউনিয়ন ইলেকশনে জিতে ওই সিঁড়িতে বসে গেম সেক্রেটারি—কালচারাল সেক্রেটারি কে হবে ঠিক করেছিলাম। চিত্তদা আউটগোয়িং ছাত্রনেতা হিসেবে আসতো। পরে এম পি হলে আমি দিল্লি গেলেই ওঁর কোটায় কতবার ফিরতি রিজারভেশন পেয়েছি ট্রেনে। ওখানেই ভারতীর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। ওখানেই ভারতীর সঙ্গে শেষ দেখা।

আলাপ করিয়ে দিয়েছিল জয়ন্ত। নতুন বছরের নতুন গেম সেক্রেটারি। ভারতী থার্ড ইয়ারের বটানি অনার্স।

সেই সময় কলেজ ইউনিয়ন নিয়ে মারদাঙ্গা, ঝগড়াঝাঁটি, ইনজাংশন—কিছুই ছিল না। পার্টি ক্যান্ডিডেট বলে কিছুই ছিল না। বরং যারা জিতে বেরিয়ে আসতো—পার্টি তাদের তোয়াজ করে দলে টানতে চাইতো। কলেজ ইউনিয়ন দখলটখল বলে কিছু ছিল না।

ইউনিয়ন টের পাওয়া যেতো কলেজ শিল্ডের খেলার দিন। আর সরস্বতী পুজোয়। এছাড়া ম্যাগাজিনে। কাদের ক'টা কবিতা বা গল্প বেরোলো। তখন একবার প্রফুল্ল সেন আমাদের ডেকে চানাচুর আর চা খাইয়েছিলেন। রাজ-ভবনের যেখানটায় ঘুরে মিনিবাস এখন বিবাদি বাগে যায়—সেখানে রাস্তা থেকে বেশ উঁচু একটা বাড়িতে তিনি থাকতেন তখন। সেই সময় খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্লদা। খুব গম খেতে বলতেন। এখন তো সবাই খায়। আর বলতে হয় না।

ইউনিয়নের মেয়ে ভাইস প্রেসিডেণ্ট হিসেবে ভারতী প্রায়ই আসতো। তখনই শুনেছি—ভারতী গেটে এলে তার সামনে কলেজের দারোয়ান জয়ন্তকে সেলাম দিত, এজন্যে জয়ন্ত নাকি দারোয়ানকে আগাম বকশিশ দিয়ে রাখতো মোটা।

ঠিক এরকম একটা ঘটনা হামিদ বে বলেছিল—কাননকে সঙ্গে নিয়ে বড়ুয়া ডিনারে এলে ফিরপোর ব্যান্ড দাঁড়িয়ে উঠতো। কোন একটা বিশেষ সুর তারা

বাজাতো তখন। বড়ুয়া নাকি এজন্যে আগাম বকশিশ দিয়ে রাখতেন।

জয়ন্তর রুমাল ছিল সিল্কের। বটানি পড়ার জন্য ওর বাড়িতেই ছিল মাইক্রোস্কোপ।

আমাদের বাড়িতে তখন যা যাচ্ছিল—তাতে আমার খুব মন দিয়ে পড়াশুনো করার কথা। পড়াশুনো তাড়াতাড়ি শেষ করে কাজে ঢোকার চেষ্টা করার কথা। ইউনিয়ন করা আমার পক্ষে ছিল বিলাসিতা। অনার্স নিয়েছিলাম কেমিস্ট্রিতে।

চোদ্দ নম্বরের পাশের ছোট্ট ঘরটা ইউনিয়ন রুম। ইউনিয়নের নামে নিজের নামে প্যাড ছাপিয়ে ভাবছি না-জানি কী হয়ে গেলাম! কলেজ করিডর, হলঘর, কমনরুম, গেটের সামনের চওড়া ফুটপাথ—সবই মনে হয় নিজের এলাকা। প্যাডে কীসব লিখে সই করে রবার স্ট্যাপ মারি নিচে। তারপর কাগজখানা নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে দিই। যেন সেই নোটিশ দেখে চন্দ্রসূর্যকে উঠতে হবে আকাশে।

পার্টির তরফে দাদারা এসে ডেকে নিয়ে যায়। জি বি অ্যাটেন্ড করি। সুকুমারদা ক্লাস নেন। তখন পার্টি ব্যান্ড্। নন্দনাদি আসে। আমাদের ডাকে কমরেড্। তাতেই আমাদের পা পড়ে না মাটিতে।

প্রায়ই পার্টি-ডিসিপ্লিনের কথা শুনতাম। শুনতাম—পুলিশী অত্যাচারের কথা। প্রফুল্ল সেনের ছবি ছেপে নিচে লেখার রেওয়াজ ছিল—দুর্ভিক্ষ মন্ত্রী। আন্দামানে ছিন্নমূলেরা যাতে না যায়—সেজন্যে গানও বাঁধা হল—

গান্ধীটুপিরা ওদের বলতো সমাজবিরোধী।

এখন ওরা গান্ধীটুপিদের বলে সমাজবিরোধী। আগেকার সেসব গান কোথায় ভেসে গেছে। এক এক সময় মনে হয়—কে কার ঢাকে কত জোর কাঠি বাজাতে পারে—সেইটাই বড়। কথার কায়দা, অভিযোগ, পালটা অভিযোগ চালিয়ে যেতে গলার জোর চাই। চাপানউতোর চালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর তো কিছু দেখতে পাই না।

তবে গান্ধী, নেহরু, বিধানকে এখন আর কেউ খারাপ বলেন না। প্রফুল্ল সেন অনেকদিন হল ও-পাড়ায় জলচল।

মাঝখান থেকে আমাদের তাহলে ওসব ভুল শেখানো হোল কেন? চাকরির পরীক্ষায় পাশ দিয়েও চাকরি পাইনি। কারণ—এস বি রিপোর্ট খারাপ।

ভারতীকে আমি এই অবস্থায় এড়িয়েই চলতাম। তাতে ভারতী আরও বেশি করে কাছে আসতো। তখন জয়ন্তর মুখে হাসি! চোখ ছলোছলো।

একদিন ভারতীর সঙ্গে রেস্তোরাঁয় গিয়ে কাটলেট খেলাম! চিড়িয়াখানায় গিয়ে রাশিয়ান পাণ্ডা দেখলাম। সন্ধ্যায় গড়ের মাঠে গিয়ে ভারতীকে চুমু খেলাম। ভারতীও খেল—খুব ভাব দিয়ে—জোর শব্দ করে। অন্ধকার আমাদের ঘিরে ছিল। দূরে ঘোড়ার পিঠে আবছা পুলিশ।

তারপরই আমার দশা হল—অজগরের চোখে চোখ পড়ে যাওয়া বনের পাখি।

নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেল। ভারতীকে চোখে হারাই। নিজেকে বললাম—প্রেম! তাহলে তোমারই নাম ভারতী।

একদিন জয়ন্তর কথাও গল্প করলাম ভারতীকে।

ভারতী বলল, তাই নাকি? ওমা, আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি!!

জয়ন্তদের আলাদা একটা দল ছিল। তাতে আমিও বেড়াতে যেতাম মাঝে মাঝে। খুব একটা ভাল লাগতো না। সে দলের একটা অভ্যেস ছিল—আগের রাতে রেডিওতে অনুরোধের আসরে কী কী গান দিয়েছিল—তাই নিয়ে আলোচনা। হেমন্ত আর ধনঞ্জয় নিয়ে তর্ক লেগে যেতো। ওদেরই ভেতর কয়েকজন ভাড়ায় ফুটবল খেলতো। যেদিন খেলা থাকতো না—আসলে ওরা কলেজ টিমেরই প্লেয়ার—হসটেলের এক ঘরে দরজা আটকে চটি বই একজন রিডিং পড়তো। বাকি সবাই শুনে গরম হোত। এসব ছিল ষোল থেকে কুড়ি পাতার বই। যে পড়তো সে ছিল আমাদের কলেজের পার্মানেন্ট ব্যাক। জুম্মা খাঁর স্টাইলে বল হাঁকড়াতো। রিডিংও পড়তো সেই স্টাইলে। ঘরও গরম হয়ে যেতো।

অনেকদিন পর শিকাগো কিংবা লনডন, টোকিও কিংবা ওয়াশিংটনের সস্তার পাবে বুরবোঁ কিংবা হানেদা নিয়ে বসেছি—সামনে লাইভ শো—পেছনের স্ক্রিনে বিতিকিচ্ছিরি ব্লু—তবুও সেই চটি বইয়ের রিডিং শুনে যা হোত তা হয়নি। কারণ অল্প বয়সে কল্পনাই অনেকটা কাজ এগিয়ে দেয়।

আর ছিল ওই দলে খুচরো বাঙালী শিল্পপতিদের সুশ্রী, ডানপিটে, বখা, মোটর সাইকেল দাবড়ানো কিছু ছেলে। তখনো ব্যবসায় বাঙালী মুছে যায়নি। তখনো মদ যুবকদের কাছে এতটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি। প্রেম একবার এসেছিল জীবনে—গানটাও বেরোয়নি।

ওমা? আমি তো কিছুই বুঝতে পারিনি! বলে সেই যে ভারতী উধাও হল—আর আমার দিকে ঘেঁষলো না। আসলে জয়ন্তর খবরটার আমিই ছিলাম বিশেষ সংবাদদাতা। নিজেরই অজান্তে।

তারপর জয়ন্তই বলতে লাগলো, আজ দু'জনে রোমান হলিডে দেখলাম। বি গার্ডেনে বেড়াতে গিয়ে ও গান শোনালো। ভারি সুন্দর গায় ভারতী। একদিন জয়ন্ত গুচ্ছের ফটো দেখালো। ওদের পুরো দলটার সঙ্গে শালওয়ার কামিজ পরে ভারতী পিকনিকে গিয়েছিল। ফুলেশ্বর। বেশির ভাগ ছবিতেই ভারতী। নানান্ পোজে।

জয়ন্তর বাড়িতে মাইক্রোস্কোপ তো ছিলই। ছিল ওর নিজের রোলিফ্লেক্স। ছিল বাবার ওষুধের দোকান। আর ছিল হেসে খেলে বেড়াবার মতন জীবন। যা আমার ছিল না একটুও। থাকার কথাও নয়। এই নিয়ে দুঃখ বা ক্ষোভেরও কিছু নেই। আমার মতই তো প্রায় সবাই।

তবে কষ্ট পাচ্ছিলাম। একরকমের অদ্ভুত কষ্ট। চাপা। ক্ষয় হয়ে যাচ্ছিলাম।

অনেক পরে বুঝেছি - ওটা কষ্ট নয়। অপমান থেকে উঠে আসা একরকমের জেদ। তবে তুমি চুমু খেতে গেলে কেন? এই-ই যদি মনে ছিল?

পার্টির জি বি বেড়ে গেল। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্কুল কোড বিল আনলেন। ওরকমই একটা কিছু। ঠিক মনে পড়ছে না। সবাই বলল, এটা অন্যায়।

মিটিং। কনভেনশন। মিছিল। স্ট্রাইক। কাগজে নাম উঠেছে। ছবি। ওদিকে পারসেন্টেজ নষ্ট হচ্ছে ক্লাসে। ফোর্থ ইয়ারে প্রি-টেস্টে অনার্সও হারালাম।

শ্যামাপ্রসাদবাবুর মিটিং বানচাল করতে গিয়ে তাঁর মুখের সামনে মাইকটা দুমড়ে ফেললাম।

ক'দিন বাদে প্রিন্সিপাল ডিসকলেজিয়েট করে দিলেন। সোনায় সোহাগা!

বন্ধুদের ভেতর তাত্ত্বিক ছিল সোমনাথ। ওর হবার হক ছিল। ওদের আঠারো ভাইয়ের বাবা জেল-খাটা মানুষ। স্বাধীনতার পর সিনেমার গল্প লেখেন। সঙ্গে চিত্রনাট্য। নতুন হিরো হিরোইন সুচিত্রা উত্তম তখনো ঠিক অ্যাপিয়ার করেনি। সোমনাথের বাবার গল্পই ওই জুটিকে সফল, রোমান্টিক করে তুলেছিল পরে। সোমনাথের ছিল শয়নং হট্টমন্দিরে—ভোজনং যত্রতত্র। ভবানীপুর থানার ও. সি-র ছেলেকে অংক কষাতো। খেতো কলকাতার শেষ পাইস হোটেলে—চেতলা ব্রিজের কাছাকাছি উড়িয়াপাড়ায়। কিংবা নিত্যানন্দ ভোজনালয়। শুতো এক টিউটোরিয়ালের বিরাট টেবিলে। ওই টিউটোরিয়ালেই দিনে তিন চারটে ক্লাস নিত। ক্লাস পিছু পাঁচসিকে পেতো। তাই ওকে আমরা সমাদরে প্রফেসর ভট্টাচার্য বলে ডাকতাম। সংক্ষেপে প্রঃ ভঃ।

তা প্রঃ ভঃ কথা বললেই বিপ্লব ঝরে পড়তো। ওর কাছেই গ্যালপিং কথাটা শিখেছিলাম। ওর মায়ের ছিল গ্যালপিং টিবি। শ্যামাপ্রসাদবাবু ডেকে বলেছিলেন, বিপ্লব ছাড়ো। মায়ের চিকিৎসা করাও। কাঁচড়াপাড়ায় ভর্তি করে দিচ্ছি। তুমিও পাশটাশ করে আমাদের কলেজে পড়াও।

সোমনাথ রাজি হয়নি। তখন ওর বাবা শিয়ালদা নর্থ স্টেশনের ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে পাকাপাকি থাকেন। বারো-চোদ্দখানা সুপারহিট বাংলা ছবির গল্পকার। ওঁকে নিতে শিয়ালদা স্টেশনেই প্রোডিউসারদের গাড়ি আসতো। কী কারণে যেন বাড়ি যেতেন না। কখনো অ্যাশট্রে ব্যবহার করতেন না। সিগারেটের ছাই চারদিকে পড়া চাই। কখনো স্টেশন থেকে শহরে ঢুকে কিছুদিনের জন্যে বাড়িভাড়া করলেন - সেখানে নিজেই রান্নাবান্না করতেন। ষোড়শোপচারে। আবার ওয়েটিং রুমেই ফিরে আসতেন। সেখান থেকেই তিনি ওপারে চলে যান।

এই সোমনাথই একদিন বলল, অ, প্রেমে পড়েছো! সেজন্যেই তোমার মগজে মেদ জমেছে—

এমনই তখন বয়স আমাদের কারও কাছেই ছোট হওয়া যায় না। অথচ

জানি --ছোট কেউ না হলে তো বড় যে বড়—তা-ই বোঝা যায় না। তবু কষ্ট দুঃখ চেপে গিয়ে প্রবল আপত্তি করি, কী বাজে বলছিস !

ঠিক বলছি। তুমি না একজন সাচ্চা কমরেড হতে চেয়েছিলে !

কবে চেয়েছিলাম—মনে পড়লো না। সোমনাথ ওই ভাবেইকথা শুরু করতো। একদিন তো হাজরার মোড়ে দাঁড়িয়ে বলল, স্তালিনগ্রাদের প্রতিটি বাড়ির জন্যে যুদ্ধ হয়েছিল।

তখন তাকিয়ে দেখেছিলাম—হাজরার মোড়ের প্রায় বাড়িই পুরনো। এর অল্প-দিনের ভেতর গোলাম কুদ্দুস লিখলেন—ইলা মিত্র···তুমি স্ট্যালিন-নন্দিনী।

নিদারুণ অত্যাচার সহ্য করে ইলা মিত্র পূর্ব পাকিস্তানী জেল থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন। আর অনেক—অনেক পরে নিজের দেশেই হতমান হলেন লিউ সাউ চি। তাঁর সাচ্চা কম্যুনিস্ট বইখানা খুব যত্ন করে পড়েছিলাম। ভাল বই।

সোমনাথের চোখের সামনে থেকে পালিয়ে এলাম। পরীক্ষা দিতে পারছি না দেখে বাড়ি অগ্নিগর্ভ।

বড়দার একটা বড় দুঃখ ছিল? আমার একটা ভাইও কি কলকাতা পুলিশের সার্জেন্ট হতে পারবে না ভগবান ? হে ভগবান !

প্রায়ই বড়দা একথা বলতো। পরাধীন আমলে লাল মোটর সাইকেল দাপিয়ে বেড়ানো ক্যালকাটা পুলিশের সার্জেন্টের গ্ল্যামার বড় মনে ধরেছিল বড়দার।

কলেজে ডিসকলেজিয়েট। রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরে বেড়াই। চেহারা প্যাকাটি মেরে গেছে। মনটা ভারতীর জন্যে সেই জাপানী গরম জল হয়ে রয়েছে। ধোঁয়া নেই। কিন্তু ধিকি ধিকি জ্বলছে সর্বক্ষণ। অনেকটা শেয়ালদা নর্থ স্টেশনের গরম চা। তাতেও কোন ধোঁয়া থাকে না।

এই অবস্থায় একদিন সন্ধ্যেবাতে সাদার্ন অ্যাভিনু দিয়ে হাঁটছি। তখন যাকে বলে বুলভার্ড রাস্তার মাঝখানে। সেখানে নাগরিক জ্যোৎস্নার ভেতর জয়ন্তদের দলটা বসে। মাঝে মধ্যমণি হয়ে ভারতী।

আমার সঙ্গে ঘ্যাচ করে সম্পর্কচ্ছেদ করে ভারতীর বিবেক অস্বস্তিতে ছিল। তাই ওদের কেউ আমায় দেখে ভারতীকে বলতেই ভারতী যেন অটোমেটিক সুইচ হয়ে গেল ; সবই কয়েক সেকেন্ডের ভেতর।

ভারতী ছায়ার ভেতর তার পাশে বসা কলেজ হাফব্যাককে কি বলল। হাফ-ব্যাক ঝুঁকে পড়ে তার পাশের দশাসই বিমলাক্ষকে কি বলল। বিমলাক্ষর বাবার বালব্ কোম্পানী ছিল। বিমলাক্ষর ছিল বিরাট লম্বা মোটর সাইকেল। সেটা পড়ে ছিল ঘাসের ওপর। হাফব্যাকের মুখ থেকে কি শুনে বিমলাক্ষ তিড়িং লাফে মোটর সাইকেল টপকে গ্যাক্ করে আমায় ধরলো। এই, রোজ দুপুরে ভদ্দর-লোকের বাড়িতে ফোন করিস কেন রে ?

আমার আজও বিশ্বাস—ওই ভিড়ে সেদিন জয়ন্ত ছিল না—কিছুতেই ছিল

না। থাকলে ও ঘটনা ঘটতে পারতো না।

বললাম, ফোন? কার বাড়িতে?

এখন ন্যাকা সাজা হচ্ছে! রোজ দুপুর একটায় ভারতীকে ফোন করিস কেন? ভদ্দরলোকের মেয়েছেলেকে ফোন করে ডিস্টার্ব করা কেন?

বলতে বলতেই বিমলাক্ষ এক রদ্দা কষালো। বিমলাক্ষর চোখজোড়া সত্যিই খুব সুন্দর ছিল। মুখখানা ভাবুক প্যাটার্নের। চেহারাটা অরণ্যদেবের। বোধহয় ওয়েট লিফটিং ওর হবি ছিল।

ঘুরে পড়তে পড়তে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম, আমি কারও কোন নাম্বারই জানি না—

আবার মিথ্যে কথা?

সত্যিই জানতাম না। কিন্তু তখন আর মুখে কথা আসছে না আমার।

ভারতী যে এতটা মিথ্যেবাদী তা বুঝতে পারিনি। কলেজ ইউনিয়ন নিয়ে বিমলাক্ষর সঙ্গে একটা পুরনো রেষারেষি ছিল আগেই। সেটাকেই ও সময়মত কাজে লাগিয়েছে। একেই কি লেনিন বলেছেন—

আর ভাবতে পারলাম না। কি হচ্ছিল বুঝতেও পারছিলাম না। বিমলাক্ষর রদ্দা তোলা হাত কে যেন আটকে দিল। সন্ধ্যের মুখে ফিরতি এক হিন্দুস্থানী নরসুন্দরকে ওদেরই কেউ রসিকতা করে ধরে আনলো।

আমায় থান ইটের ওপর বসতে হল।

অল্পক্ষণের কাজ। ডিরেকশনের বিশেষ দরকার নেই। এদিক ওদিক ক্ষুর চালিয়ে পরামানিক আমায় দশ মিনিটের ভেতর ন্যাড়া করে দিল।

সন্ধ্যেবেলায় জ্যোৎস্নার ভেতর ছোট্ট জটলাটা আমায় দেখে হাসির হররায় ভেঙে পড়লো।

ছাড়া পেয়ে আমি কোন্‌দিকে হেঁটে চলেছি—গোড়ায় তা বুঝতেই পারিনি। আর যাই হোক এ অবস্থায় তো বাড়ি ফিরতে পারি না।

কলকাতার কাঁহা কাঁহা রাস্তা ঘুরে বেড়ালাম—তা আর আজ মনে নেই। এক সময় রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেল। ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেল।

এখনো মনে হয়—ভারতী কেন ওদের লেলিয়ে দিয়েছিল? নিজের মুখোমুখি হতে পারছিল না বলে? নিজের কাজের যুক্তি খুঁজছিল? মেয়েরা তাহলে এমন হয়? কে জানে? সবটাই সেদিন ঘটেছিল যেন ঘোরের ভেতর।

অনেক রাতে সরু সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠে যখন কড়া নাড়ি তখন কি ওর ঘুম ভাঙতে চায়। একবার শুনলে সোমনাথ ছিল কুম্ভকর্ণ।

অনেক রকম শব্দ করার পর ও উঠে দরজা খুললো। সামান্য ফাঁক করে তাকিয়েই দরজা পুরো খুলে ফেলল, এত রাতে? তুই? আমি ভেবেছি পুলিশ!

ভেতরে চল।

জল খেলাম। সোমনাথ আলো জ্বাললো, ন্যাড়া হয়েছিস কবে? সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে পড়েছিস তাহলে! তোর এই প্রেমই তোকে খেল—

প্রেমই বটে!

তারপর সব বললাম। পর পর সাজিয়ে।

সব শুনে বলল, ওদের এবার পলিটিক্যালি ফাইট করে কোণঠাসা করতে হবে—

তা করিস। কিন্তু এই মাথা নিয়ে তো আমি বাড়ি ফিরতে পারবো না!

সে একটা রাস্তা হয়ে যাবে। নে—এখন শুয়ে পড় তো।

বলেই সোমনাথ শুয়ে পড়লো। শুয়েই ঘুমোলো। আমি পাশের টেবিলটায় ছাত্রদের রেজিস্টারগুলো গাদি দিয়ে মাথায় দিলাম। ঘুম কি আসে! অন্ধকারে শুকনো চোখ জ্বলতে থাকে।

পরদিন ভোরে ভোরে টিউটোরিয়ালের দারোয়ান কড়া চায়ের সঙ্গে লেড়ো বিস্কুট এনে দিল।

বিশাল বাথরুমে ভাল করে চান হল। তারপর দুজনে নিচে নেমে শ্রীহরিতে গরম কচুরির সঙ্গে বাসি আলুর ছোঁকা ঠেসে খেয়ে নিলাম।

খেয়ে সোমনাথ মন দিয়ে কর্মখালি দেখতে দেখতে বলল, হয়েছে। এটা আমাদের হবে—

দেখি—।

সোমনাথ কাগজটা এগিয়ে দিল।

চালগোলায় বিশ্বাসী, কর্মঠ কর্মী চাই। এই গৃহেই গৃহকর্মে নিপুণ গৃহভৃত্য চাই। খাওয়া থাকা ব্যতীত মাসিক পঞ্চাশ ও পঁয়ত্রিশ। সকালে সাক্ষাৎ কাম্য!

নিচে চেতলার এক ঠিকানা। নামের পাশে পদবী—আঢ্য।

পারবো?

খুব পারবি। দু'জনে একসঙ্গে থাকবো। টিউশনিতে তো তিরিশ টাকার বেশি পাওয়া যায় না। এখানে যে খাওয়া-থাকাটা ফ্রি। চল—আত্মগোপন চাইছিলি! তাও হয়ে গেল—! মাথায় চুল গজালে বাড়ি ফিরবি।

যেতে যেতে একটা লন্ড্রির সামনে সোমনাথ গায়ের জামা খুলে কাচতে দিল। আমাকেও বলল, তোরটাও দে। রসিদটা সাবধানে রাখিস। একসময় এসে ছাড়িয়ে নিলেই হবে।

আমরা দুজনে গেঞ্জি গায়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে উঠলাম। তখনো ভাবছি—কাল সন্ধ্যের ঘটনাটা কি জয়ন্ত জানতে পারবে না? জানলে কি করবে? মানুষ হিসেবে ওর সঙ্গে যে সম্পর্ক—তা কি ভারতী ঢুকে পড়ায় এতটাই হিংস্র হয়ে উঠেছে? আমার তো বিশ্বাস হয় না!

সোমনাথ বলল, তোর নাম মোহন। আমি হরিপদ। আমরা আলাদা আলাদা

যাবো। ওখানে গিয়ে আমাদের বন্ধুত্ব হবে। তোর দেশ রাণাঘাট। আমি আসছি মেদিনীপুরের এগরা থেকে। আমি বিশ্বাসী, কর্মঠ কর্মী। তুই গৃহকর্মে নিপুণ গৃহভৃত্য।

পারব কি?

খুব পারবি। মনে রাখিস—তোর নাম মোহন।

আমাদের পদবি? বাবার নাম?

সে তখন যা মনে আসবে তাই বলবি—আগে থেকে অত সব ঠিক করে রাখতে গেলে সবই গুলিয়ে যাবে পানু—

উঁহু, মোহন!

সোমনাথ হেসে ফেলল। আমি বললাম—এক্সপিরিয়েন্স জানতে চায় যদি?

যা মুখে এসে যাবে তাই বলবি।

ট্রাম থেকে নেমে হাঁটতে হাঁটতে আমরা যখন আদিগঙ্গার ওপর—তখন রোদ্দুর বেশ চড়া।

সেই কাঠের ব্রিজটা এখন আর নেই। চেতলা বয়েজ স্কুল ব্রিজের রেলিংয়ে অনেকটাই ঢাকা পড়ে গেছে। বরং পাশেরই কৈলাস বিদ্যামন্দির বাইরে থেকে এখন বেশি সপ্রতিভ।

মোহন দাস আর হরিপদ পোড়েলের এক কথায় কাজ হয়ে গেল। আদিগঙ্গার গা দিয়ে বিরাট চালগোলা। তার পেছনে পেল্লাই অট্টালিকা। সঙ্গে পেয়ারা বাগান। ধানের গোলা শহর কলকাতার ভেতর। গরুর গোহাল। ঢেঁকি। সামনের দিকে চালকল। বাঁধানো চাতাল। পাশেই ছোটমত হাসকিং মিলও আছে।

গোলায় গোলায় থাক থাক বস্তা। চাল ওজনের বিরাট কাঁটা। টিনের দেওয়ালের তাকে সিদ্ধিদাতা গণেশ। যেমন হয় আর কি! এমন কি ক্যাশ-বাক্সর সামনে ফতুয়া গায়ে গোষ্ঠ আঢ্য অব্দি আমাদের মনের ভেতরকার ছবির সঙ্গে মিলে গেল।

তবে গোহালের পাশেই টিনের নিচে একজোড়া ল্যান্ডমাস্টার। তখনো অ্যামবাসাডার বাজারে ওঠেনি।

দুজনেই পাঁচ মিনিটের গ্যাপে আলাদা আলাদা করে বললাম—পরীক্ষা করে দেখুন। যদি পছন্দ হয় রাখবেন।

আঢ্যমশায় বোধহয় আতান্তরে পড়েছিলেন। বললেন, ওই মাইনে কিন্তু।

আমরা আলাদা আলাদা করে মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

এরই ভেতর হরিপদ পোড়েল বলল, যদি কাজ পছন্দ হয় তো দু'পাঁচ টাকা বাড়িয়ে দেবেন বাবু—

সে দেখা যাবে। এখন তো লেগে পড়।

আমরা বহাল হলাম। বাড়ির মা আমায় ভেতরে ডেকে নিয়ে গেলেন। আমি

গিয়ে বিরাট একটা বাঁধানো উঠোনের মাঝখানে দাঁড়ালাম। বাড়িসুদ্ধ মেয়েরা আমায় দেখতে ঘোরানো বারান্দা—দোতলার ব্যালকনিতে ভেঙে পড়লো। এক ঘণ্টার ভেতর বুঝলাম, আঢ্যমশায়ের তিন বিয়ে।

॥ নয় ॥

নেড়া হওয়ায় গৃহভৃত্যের ভূমিকায় আমি অনেকটাই বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠলাম। সোমনাথের তুলনায় আমার কাজটাও ছিল কঠিন। সর্বক্ষণ ভেতর-বাড়িতে আঢ্যমশায়ের তিন বউয়ের চোখের সামনে থাকা। যাকে বলে অন্তঃপুরে। তাছাড়া ওদের ছেলের বউ—কলেজে পড়া মেয়েদের সামনে খালি গায়ে ভেতরবাড়ি ঝাঁট দিয়ে জলের ন্যাতা নিয়ে উবু হয়ে মেঝে মুছে ফেলা চাট্টিখানি কথা নয়।

সবচেয়ে কঠিন হয়ে ওঠে—কারও কথার পিঠে কথা না বলে চুপ করে থাকা। উচিত কথা ঠোঁটে এসে বুড়বুড়ি কাটে। যাকে বলে ঠোঁট চুলকোয় বলার জন্যে। কিন্তু বলার উপায় নেই। তাহলেই কোশ্চেন করবে—তুই এসব কথা শিখলি কি করে মোহন?

অতএব মুখ বুজে বাসন মাজি। মোটা চালের ভাত চিবোই। বড়মায়ের মেজো মেয়ে কথায় কথায় দোতলার কোণের ঘর থেকে গারগেল করার জল চায়—মোহন—ও মোহন—

আমি একতলার রান্নাঘর থেকে ছুটতে ছুটতে গরমজল নিয়ে দোতলায় উঠি। পয়লা দিনেই দুই থাই বাথায় টাটাতে লাগল। বারবাড়িতে হরিপদ ওরফে সোমনাথ দিব্যি সন্ধ্যের দিকে ক্যাশবাক্সে, ওজনের দাঁড়িপাল্লায় ধুপধুনো দিল। তারপর বাবুর পড়া খবরের কাগজ উল্টো করে ধরে পিড়ার ভান করতে লাগল।

ওর পদমর্যাদা বেশি। মাইনেও বেশি। আমি হলাম গিয়ে গৃহভৃত্য আর ও হল গিয়ে চালগোলার কর্মঠ কর্মী। রাতে শোবার সময় একত্র হলাম।

গোড়ায় যেটাকে চালকল ভেবেছিলাম—আসলে সেটা সুরকিকল। এক সময় চালু ছিল। এখন অনেকদিন বন্ধ। যন্ত্রপাতি বদলে সেটা চালকলে রূপান্তরিত হচ্ছিল। আসলে আঢ্যমশায়ের আদি ব্যবসা ছিল সুরকি।

আমিও পাল্টে যাচ্ছিলাম। খানিক দূরেই আমাদের বাড়ি। সেখানে মা, মেজদা—সবাই থাকে। আর এখানে আমি বাড়ির চাকর হয়ে শুয়ে আছি সারাদিন কাজের পর। ভারতীর উসকানিতে আমার কলেজের ছেলেরা গতকাল আমায় ন্যাড়া করেছে। আমার অপরাধ—আমি ভারতীকে ভালবেসে ছিলাম। আমার ক্লাসের ছেলেরা আর ক'দিন বাদেই অনার্স পরীক্ষায় বসবে। আমি ডিসকলেজিয়েট। চমৎকার!

ছাঁদে চিলেকোঠার ঘরে শুয়ে শুয়ে অনেক রাত অব্দি জানলা দিয়ে আকাশের তারা দেখলাম। আজও এত বছর পরে এখনো তারা দেখি। এতদিন ধরে দেখতে দেখতে তারাগুলো মুড়ির মত ফর্সা হয়ে উঠেছে। তখন মনে হয়েছিল পৃথিবীতে আমার ঘটনাটাই ইমপর্টেন্ট। এখন দেখছি সবার মত আমার ঘটনাগুলোও অর্ডিনারি। আমার সেই বয়সে উদ্যমী যুবক আঢ্যিমশাই গাঁয়ে গাঁয়ে পুরনো বাড়ির ধসে পড়া দেওয়াল কিনে বেড়াতেন। সেই দেওয়াল ভেঙে ইট লরিতে চাপিয়ে চলে আসতেন। তারপর সেই ইট গুঁড়িয়ে সুরকি। সুরকির কারবার থেকেই চালের কারবার। চালকল। দোমহলা বাড়ি কলকাতা শহরে। তিনখানা বউ। দুখানা গাড়ি।

পয়লা দিনেই টের পেলাম—বাবুর তিন বউ। কেননা সকালের দোশরা প্রস্থের চা পেঁছে দিতে গিয়ে গোলমাল করলাম। বড়মা চায়ে চিনি খান না। তাকে দিয়েছি মেজমায়ের চিনির চা। আর ছোটমাকে দিয়েছি বড়মায়ের র চা। মেজমায়ের হাতে পড়েছে ছোটমায়ের দুধ চিনির চা সরবৎ।

সারা বাড়িতে ভূমিকম্পের দশা। এর ভেতরেই বড়মায়ের মেজমেয়ে গারগেলের ফুটন্ত জল চাইছে বার বার। নুন মেশানো। তিনরকমের চা। একরকমের গরম জল। সব মিলিয়ে চার রকমের গরমজল। চা। দুধ। চিনি। নুন। সব একাকার হয়ে গেল। আমি কাপ হাতে ওপর নিচ করছি। দৌড়ে দৌড়ে। হাতে প্লেটের ওপর কাপ দাঁতকপাটির মিউজিক দিয়ে নাচছে। তার ভেতরে রান্নাঘর থেকে ঠাকুরের দাবড়ানি। সেই অবস্থায় সিঁড়ি দিয়ে উঠছি—নামছি।

ব্যাপারটা ভালই হল। আধঘন্টার ভেতর সারা ফ্যামিলি চিনে ফেললাম। বড়মা জবু থবু। মেজোমা চশমা চোখে—সবসময় নিজের চোখের সামনে কাগজ মেলে বসে আছেন। ছোটোমা খুব আধুনিকা। বেণী বেঁধে চায়ের কাপ হাতে স্যান্ডেল পায়ে ঝুলবারান্দায় দাঁড়ান। নিজের ছেলেমেয়েকেও দেখেন না। তারা ছাদে শুধু ঘুড়ি ওড়ায়।

এইসব ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙলো নিশুতি রাতে। সোমনাথ ওরফে হরিপদ তখন অঘোর ঘুমে। কলকাতা ভীষণ শান্ত, কলকাতা নিঃঝুম জ্যোৎস্নার চাপা তাপে পুড়ে যাচ্ছে। কোথাও দেশোয়ালিরা একত্র হয়ে তুলসীদাস গাইছে। সঙ্গে সেই খচোমচো বাজনা। আদিগঙ্গার ওপারেই খোলা মাঠ। সেখানে তখনো নিউ আলিপুর ঠেলে ওঠেনি।

মন দিয়ে ঘুমন্ত কলকাতার ওপর চোখ বোলাচ্ছি। কখন সোমনাথ এসে পাশে দাঁড়িয়েছে।

ঘুমোসনি ?

বললাম—আসছে না ঘুম।

তবু শুয়ে থাক। ভোর থেকেই তো ঘর ঝাঁট, ঘর মোছা। আমি বাবা ওসব থেকে বেঁচে গেছি। ভবানীপুর থানার ওসির বাড়ি টিউশনি করে পুলিশ রিপোর্টের ফাইলখানা সরিয়ে ফেলেছি। এবার রেলের চাকরি আমার কে আটকায়!

আমি ঘচ করে ওর মুখে ফিরে তাকালাম—তুই না বিপ্লব করবি?

বিপ্লব তো আছেই। তার আগে নিজের খরচাটা চালিয়ে নেবাব মত একটা রোজগার তো চাই—। আমি চুপ করে গেলাম। কলেজে ডিসকলেজিয়েট। ভারতী কলা দেখিয়েছে। তারই ওসকানিতে আজ আমি নাগড়া। তারপর টিকটিকিদের কৃপায় সোমনাথের পুলিশ রিপোর্ট যদি ওসির ছেলেকে পড়িয়ে থানা থেকে সরাতে হয়—তো আমারটাও তো ভাল হবার কথা নয়।

আর চাকরি করেই যদি বিপ্লব করতে চায় সোমনাথ—তো ওর এখানে হরিপদ হওয়ার কোন দরকার নেই। শ্যামাপ্রসাদবাবু তো ওর পড়ার খরচ দিয়ে পাশ করিয়ে নিয়ে নিজেই চাকরি দিতে চেয়েছিলেন। সেখানে পুলিশ রিপোর্টের বালাই নেই। শ্যামাপ্রসাদবাবুর চাকরি করেও তো বিপ্লব করা যেতো। তবে হ্যাঁ—শ্যামাপ্রসাদবাবুর ব্যাপারে কোন গোলমাল করা চলবে না। কন্ডিশন এই একটাই। তো সে কন্ডিশন কি চালগোলার এই কর্মঠ কর্মী হওয়ার চেয়ে খুব খারাপ ছিল!

এসব ভাবছি। সোমনাথ জানতে চাইল, ভারতীর কথা ভাবছিস?

বললাম—তা ভাবছি।

ভেবে যা—ভেবে যা। এসব প্রেম ডিকেয়িং সমাজের সিম্পটম।

তাই বুঝি?

সোমনাথ আমার চোখে তাকাতে চেষ্টা করলো।

পরদিন ভোরেই বড়মায়ের মেজোমেয়ে আমার কান টেনে এক চড় কষালো, টেবিলে একখানা খাম ছিল মোহন—সরিয়েছিস?

কিসের খাম মেজদি?

সে-খবরে তোর কি দরকার? খামখানা দেখেছিস? ডাকে দেবো ভেবেছিলাম—

আমি খাটের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে একখানা মুখআঁটা নীলখাম কুড়িয়ে এনে দিলাম।

খুশিতে মেজদির মুখখানা হেসে উঠলো। এর আগে কখনো কলেজে-পড়া কোন মেয়ের—বিশেষ করে আমারই সময়কার বেণী দাপানো কোন মেয়ের গারগেলের জল এনে দিইনি। নীলখাম খুঁজে দিইনি খাটের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে।

আমাকে চাকর ভাবায় সেই মেজদিরও কোন আড়ষ্ট ভাব ছিল না। বরং

বলা যায় স্বচ্ছন্দই।

যা—ছুটে গিয়ে ডাকে দিয়ে আয় তো—

ছুটে রান্নাঘরে এলাম নিচে। চুলোয় বোধহয় ভাত চেপেছে। আলগা করে চিঠিখানা আগুনের আঁচের কাছে ধরলাম। দিব্যি খুলে গেল। ডাকবাক্সে চিঠিখানা ফেলতে গিয়ে মেজদির নিজের হাতে লেখা লাইনগুলো পড়লাম। কোন এক বিমলেন্দুকে লেখা—

'আমি জানি তুমি কি চাও। কিন্তু সে তো এখন হবার নয়। লক্ষ্মীটি, আমায় ভুল বুঝো না। সবই তোমার। একটু ধৈর্য ধর। আমাদের মিলন সফল হলে তো কোন বাধাই থাকবে না সেদিন।'

আমি চমকে উঠলাম। ভারতীও তো এই একই ভাষায় আমাকে এসব কথা বলেছে। তবে কি সব মেয়েই এই এক ভাষায় এই সময়টায় এসব কথা বলে? চিঠিখানা ডাকে দিয়ে মেজদির ওপর আমার আর রাগ থাকলো না কোন। মেরেছে মেরেছে একটা চড়—তার চেয়ে বেশি কিছু তো নয়। বড়লোকের আদরের দুলালী—লাভলেটার হারিয়ে ফেলে দিশেহারা দশায় অমন একটা চড় কষাতেই পারে—বিশেষত চাকরকে—যে কিনা সদ্য সদ্য ন্যাড়া।

দুপুরে মেজদি গারগেল করে সেজেগুজে প্রেম করতে বেরিয়ে গেল। তার মানে ডাকে দেওয়া চিঠিতে আজ যা লিখেছে—সেই কথাগুলোই লাভারের সামনে দেখা হলে আজ রিপিট করবে মেজদি। এটাই তাহলে মেয়েদের নিয়ম? ভারতীও তো তাই করতো আমার সঙ্গে! চিঠিতে লেখা কথাগুলো আমায় বহুবার বলেছে মুখে। একখানা চিঠি তুলে দেবো নাকি জয়ন্তর হাতে?

একতলার রান্নাঘর থেকে ভাল ভাল রান্নার গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে গিয়ে খিদেই বাড়িয়ে দেয় শুধু। কিন্তু এ তো নিজের বাড়ি নয়। বাড়িসুদ্ধ সবাই খেয়ে উঠলে বাসনকোসন তোলার পর রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে খেতে বসা। ততক্ষণে ভাল ভাল রান্না সব ঠাণ্ডা মেরে যায়।

তখনো কলকাতায় গেরস্থবাড়ির বারান্দার গায়ে পাতাবাহার গাছ—উঠোনে তারের খাঁচায় টিয়া। আঢ্যমশায় ভোরবেলা ছোট মায়ের ঘর থেকে বেরিয়ে বারোয়ারি বাজারের বড় থলেটার সঙ্গে তিন বউয়ের জন্যে তিন-তিনটে মাছের থলে আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। তিন বউয়ের মনে ধরানো মাছ কেনার পর আঢ্যমশায় আমায় নিয়ে সারা বাজার চক্কর দিতে লাগলেন।

সকালবেলার ভরা বাজারে আঢ্যমশায়ের পেছন পেছন আলু পটল কিনতে কিনতে আমার মনে হল—এর নাম প্রেম। এর নাম সংসার।

ভারতীকে ঘিরে যে প্রেমকে ভেবেছি—শিশির-ধোয়া শিউলি—সেই শিউলির জন্যে আমিও হয়তো একদিন মাছের আলাদা থলে নিয়ে বাজারে মাছের ওপর ঝুঁকে পড়ে বেছে বেছে কিনবো। কল্পনার তারাফুলগুলো নিত্যদিনের ধুলোয়

এভাবে বাসি হয়ে যায়।

পরে পড়েছিলাম—ঠাকুরমাকে পোড়াতে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথের মনে জগৎ-সংসারের আসল সত্যটি ধরা পড়ে গিয়েছিল। শ্মশানে বসে তাঁর মনে এই মহাভাবের উদয় হয়। আমার হয়েছিল বাজারে দাঁড়িয়ে। চার-চারটে বাজারের ব্যাগ কাঁধে তখন আমি নুয়ে পড়েছি।

আচ্যমশায়ের পেছন পেছন টলতে টলতে বাড়ি ফিরলাম। সবাই খেয়ে উঠতে বেলা দুটো। আমি চান করে উঠে দেখলাম—খাবার ইচ্ছে নেই। আদি-গঙ্গার ওপর দিয়ে মেঘলা ছায়া গিয়ে পড়েছে সেন্ট্রাল জেলের মাথায়। দু'জন ব্যাপারী একপাল অনিচ্ছুক পাঁঠা ছাগল নিয়ে আদিগঙ্গার গা ধরে টালিগঞ্জের দিকে যাচ্ছে। সরু পথ জুড়ে বনঝালের ঝাড়।

মেঘলা ছায়ার নিচে ওদের অবিরাম ব্যা ব্যা। এই ওদের শেষ যাত্রা।

আমি সোমনাথ ওরফে হরিপদকে কিছু না বলে আধঘণ্টার ভেতর ট্রামে করে বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম।

ফাঁকা বাড়ি। বাতাসে শীতের শিরশিরানি। সেই সঙ্গে মন খারাপ করে দেওয়া ছায়া। বিকেল হতে না হতেই যেন সন্ধ্যার আঁধারের ছোপ আলোয়।

টেবিলে আমার ফটো। বুঝলাম—নিরুদ্দেশ বলে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার আয়োজন চলছিল বাড়িতে। মা তো আমায় দেখে কেঁদেই অস্থির। কোথায় ছিলি? ন্যাড়া কেন?

সাধু হবো মা—

কি সব্বোনাশের কথা! এর মধ্যে সংসারে ঘেন্না ধরে গেল পানু—মা আর কথা বলতে পারলো না। হাউ হাউ করে শুধু কান্না।—কেন সাধু হবি বাবা? সে বড় কষ্টের জীবন। আবার কার পাল্লায় পড়লি?

বড়দা কোথায়?

সে তো বাঁকুড়া চলে গেল। ছুটি ফুরিয়ে গেছে। তোর ছবি দিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে বলে গেল।

আমি বাঁকুড়া চললাম—

শোন—শোন পানু—

বাঁকুড়া গিয়ে তোমায় চিঠি দেবো। মেজদাকে চিন্তা করতে বারণ কোরো।

তোর হাতে তো টাকা নেই। এই দশটা টাকা নিয়ে যা পানু। তোর কলেজ? বলতে বলতে মা আঁচল খুলে একখানা দশ টাকার নোট দিল।

টাকাটা নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে বললাম, কলেজে নাম কাটা গেছে, চলি—

এখনো মায়ের অবাক মুখখানা দেখতে পাই। কিসের তোড়ে যে অমন বেগে নেমে এসেছিলাম সেদিন—তা আজ জানি না। তখন তো সবই অগোছালো।

সামনে কী জানতামও না। এখন পেছনে তাকিয়ে সবই সাজানো-গোছানো লাগে। মনে হয়—এসব তো জানতাম। ঘটনাগুলোকে এখন ছাপানো ছবি লাগে। তবে তাতে সেই সময়কার তাপ-উত্তাপের কোন দাগদাগালি এখন আর দেখতে পাই না। আসলে জীবনে একটা সময় থাকে—যখন আমরা সবাই তোড়ে জল হয়ে বহে যাই। কোশ্চেন করি না কোন। মানে জানি না। তবু বহে যাই। এই তোড় আমাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়। অভিজ্ঞতা আয় করায়।

আসলে যে চিন্তা আমরা ঘাম দিয়ে আয় করি না—তার কোন দাম নেই। পেশী, অস্থি, মজ্জাকে ওভারটাইম খাটিয়ে মান-মর্যাদা যেখানে ধুলোয় মিশে যাবার দশা, শরীরসুদ্ধ যেখানে মেলট্রেনের চাকার নিচে রানওভার হওয়ার মত বিপন্ন—সেখান থেকেই দেখছি সারাজীবনের পাকাপোক্ত ধ্যানধারণা-চিন্তাভাবনা উঠে এসেছে। কালঘাম ছুটিয়ে তবে একটা চিন্তা পেয়ে যাই।

অসময়ে বৃষ্টি। কাকভেজা হয়ে হাওড়া স্টেশনে যখন পৌঁছলাম—তখন শুনলাম—অনেক ট্রেন বাতিল। বিহার-উড়িষ্যায় অনেক নদী ডাঙায় উঠে বেশ কিছু ট্রেনলাইন গিলে বসে আছে। বেরিয়েছি যখন—ফিরি আর কি করে!

কতদূর যেতে পারব ঠিক নেই। সেই পুরী প্যাসেঞ্জারেই উঠে পড়লাম। মেচেদা পেরিয়েই বৃষ্টি পেলাম। ভোরবেলা ট্রেন এসে বালেশ্বরে দাঁড়িয়ে গেল। আর এগোবে না। আকাশ মেঘলা। বাতাস ভ্যাপসা গরম। টিকিট কাটিনি। প্লাটফর্মের নিউজস্টলে তেলেগু, তামিল, ওড়িয়া ম্যাগাজিন ছড়ানো। তারই একটা তুলে নিয়ে মন দিয়ে পড়তে লাগলাম।

খানিকবাদে প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা হয়ে গেল। কালো কোট—লাল টাই—সাদা প্যান্টের চেকাররা ঢিলেঢালা হয়ে চা খাচ্ছে—কোত্থেকে একটা রিলিফ ট্রেন এসে দাঁড়াল। যাবে বাঁকুড়া। চলে এসেছি বালেশ্বর। এ আমার চিরকালের ব্যাপার।

বাঁকুড়ায় ট্রেন আরও ভোরে পৌঁছায়। এখন আমি বড়দার বাড়িতে হয়তো বড়বৌদির হাত থেকে চায়ের কাপ নিচ্ছি। তা নয়—কোথায় বাঁকুড়া আর কোথায় বালেশ্বর!

কি দরকার ছিল জেনেশুনে অন্য ট্রেনে উঠে পড়ার? বাঁকুড়ার ট্রেন নেই তো নেই। আঢ্যমশায়ের বাড়ি তো ফিরে যেতে পারতাম। সন্ধ্যেয় ফিরিস নি কেন মোহন? বলে দু'ঘা চড়-চাপড় না হয় দিত। মাথা নিচু করে ঘর ঝাঁট দিয়ে—ঘরে ঘরে চা যুগিয়ে একসময় রাতে পৌঁছে যেতাম। পরদিন ভোরে—মানে ঠিক এখন—রান্নাঘরে বসে হরিপদ ওরফে সোমনাথের সঙ্গে চা খেতাম।

আসলে ভারতী যেখানে থাকে—সেই কলকাতায় আমি আর থাকতে পারছিলাম না। জেগে থাকা অবস্থায়—কিংবা ঘুমন্ত দশায়—কোন সময়েই আমি ভুলতে পারছিলাম না—হিন্দুস্থানী নাপিত ক্ষুর কচকচ করে আমার মাথা সাদা করে

দিচ্ছে—সাদার্ন অ্যাভিনার ঘাসে ঢাকা বুলেভার্ড সন্ধ্যায় আবছা আলো-আঁধারিতে বেড়াতে আসা লোকজন মোহাচ্ছন্ন—আমারই এক পাল ক্লাস-ফ্রেন্ডের মাঝখানে মক্ষীরাণী হয়ে বসে ভারতী সবাইকে উসকে চলেছে সেখানে।

প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে লালচে রাস্তায় এসে উঠলাম। গাদাগুচ্ছের সাইকেল রিক্সা। বালেশ্বরের সকালবেলা। এক ঝুপড়ি চাখানায় চা খেতে খেতে শুনলাম—দু'জন ওড়িয়া ভদ্রলোক বলছেন—গতরাতে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এন্থনি ইডেন আর ফ্রান্সের গাই মোলেত ষড়যন্ত্র করে সুয়েজ আক্রমণ করেছে। নাসেরও বসে থাকার পাত্র নন। তিনিও অনেকগুলো জাহাজ ডুবিয়ে দিয়ে সুয়েজখাল অচল করে দিয়েছেন।

আর শুনলাম—চিফ মিনিস্টার নবকৃষ্ণ চৌধুরী সারা ওড়িশার জেলায় জেলায় ৩০।৩২ বছরের কাঁচকাঁচা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট পাঠিয়ে স্টেটের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন গুলিয়ে ফেলেছেন।

তার মানে আমায় যখন ন্যাড়া করা হচ্ছে—তখন থেকেই গাই মোলেত আর এন্থনি ইডেন অ্যাটাক প্ল্যান নিয়ে রেডি। তখনই নবকৃষ্ণবাবুর স্টেট অ্যাড-মিনিস্ট্রেশন গুলিয়ে বসে আছে। দুনিয়াতে একই সঙ্গে কত যে ঘটনা ঘটে! এতসব খাতায় তুলে মিছিল করার কেউ নেই। শুধু ইয়ারবুকগুলোয় সামান্য কিছু পরিচিত ঘটনার কথা থাকে। একথা কোন ইয়ারবুকেই সালতামামির ঘরে সেবারে লিখলো না—শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের মাথায় আবার চুল গজানোর ভেতরেই অ্যান্থনি ইডেন আর গাই মোলেতকে বিদায় নিতে হল।

আসলে কাল রাত্রে ট্রেনে যখন ঘুমোচ্ছিলাম—তখনই তো ব্রিটেন আর ফ্রান্সের প্যারাট্রুপ সুয়েজখালের ওপরকার আকাশে বিমান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুনিয়ার কোন ঘটনাই বোধহয় ইমপর্টেন্ট নয়। ঘটনা থাকে না—মুছে যায়। থাকে ঘটনার মোদ্দা নির্যাস। সেই নির্যাস আমাদের অজান্তেই আমাদের ঘুমন্ত বিরাট মহাদেশে মিশে যায়—লেপটে যায়। জেগে উঠে আমরা অস্বস্তি বোধ করি। কিন্তু কারণটা ধরতে পারি না।

এই বালেশ্বরেই এর ঠিক বিশ বছর পরে বাই রোডে হাইওয়ে বাংলোতে এসে উঠি একরাতে। সন্ধ্যেবেলা কুপির আলোয় দর করে বালেশ্বর বাজার থেকে যাকে বলে সামুদ্রিক লবস্টার কিনেছিলাম। বাই কার বালুগাঁও—রম্ভা যাবার পথে। তখন জ্যোৎস্নার ভেতর কোনারকের ভাঙা চুড়ো আমার মনে গেঁথে বসে গেছে। তখন ভিজে বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ভিখারীর কুষ্ঠ-ক্ষত এগিয়ে-দেওয়া হাত দেখতে পাই।

রিক্সা করে বালেশ্বর শহরের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। একটা দোতলা বাড়ির একতলার বারান্দায় বসে একটি শাড়ি পরা মেয়ে ইমপিচমেন্ট অব ওয়ারেন হেস্টিংস রিডিং পড়ছে জোরে জোরে। বোঝাই যায় শিক্ষিত ওড়িয়া গেরস্তবাড়ি।

রেডিওতে মজদুরমণ্ডলীর অনুষ্ঠানে ওড়িয়া নাটকের একটি ডায়লগ মনে ছিল। নায়ককে নায়িকা বলছে—টিকে এক কথা বলি পারি ফল্গুনী বাবু?

আমি সেই গলায় মেয়েটিকে বললাম—টিকে এক কথা বলি পারি?

আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে। মেয়েটি পড়া থামিয়ে আমাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। তখনো বালেশ্বর অখণ্ড বাংলার খুলনা, যশোর কিংবা বাঁকুড়া শহরের মতই। রাস্তা দিয়ে রিক্সা-সাইকেল যায়। তাতে চশমা চোখে প্যাসেঞ্জার। ওদিকে শহরের বড় রাস্তার গায়ে বাড়ির খোলা বারান্দায় হোল ফ্যামিলি হয়তো গোল হয়ে প্রেমানন্দে ল্যাংড়া খাচ্ছে। কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। খুব কম বাড়ির জানলাতেই পর্দা।

এখন তো গাঁয়েগঞ্জেও জানলায় জানলায় পর্দা। আমাদের কী এমন আছে যে এত ঢেকে রাখার চেষ্টা। গরমের দেশে কিসের যে এত আব্রু তা বুঝে উঠতে পারিনি আজও। না সাজুগুজুর একটা অঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো পর্দা? আড়াল-আবডালের জন্যে নয়—সাজসজ্জার জন্যে!

মেয়েটি এক পলক আমার মুখে তাকিয়ে ছুট্টে ভেতরে চলে গেল। ভেতরে লোক ডাকতে গেল? মারবে না তো? ওড়িয়াতে আমার জ্ঞান যৎসামান্য।

মেয়েটির সঙ্গে ভেতর থেকে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। চোখে চশমা। হুম ডু ইউ ওয়াণ্ট?

বললাম—কাউকে নয়। আমি একজন তরুণ বাঙালী পর্যটক।

বেডিং কোথায়?

দেখলাম—ভদ্রলোক বাঙলা বোঝেন। বলতেও পারেন।

বললাম স্টেশনে রেখে এসেছি।

ভদ্রলোকের পড়াশুনো কলকাতায়। লোকাল ফকিরমোহন কলেজে ফিলজফি পড়ান। জানতে চাইলেন—চা সিঙাড়া খেয়ে ঠিক করুন—কী করবেন? কোন্ দিকে যাবেন?

গম্ভীর হয়ে বললাম—আপনার কলেজে ছাত্রদের জন্যে একটা বক্তৃতার আয়োজন করতে পারেন? লেকচার শুনে যে যা ইচ্ছে দিতে পারে। আমার পূর্বভারত ভ্রমণ নিয়ে গল্পো—

সবটাই কি ট্রেনে?

নাঃ, তা হয় নাকি! বলতে পারেন বেশির ভাগটাই পেয়ে হেঁটে—

কিন্তু এখন যে কলেজ বন্ধ।

তাহলে?—বলে সিঙাড়ায় কামড় দিলাম। সঙ্গে এক সিপ চা।

ফিলজফির লেকচারার ভদ্রলোক বললেন, আমি বলি কি—আপনি এখানকার ক্রিমিনাল ল ইয়ার সুরেন রায়ের বাড়িতে কটা দিন থাকুন। সাকসেসফুল পুরনো বাঙালী উকিল। লোকজন গেলে উনি বাড়িতেই রেখে দেন। ফি-বছর রবীন্দ্র-জয়ন্তী করেন—

অগত্যা চা খেয়ে রিক্সা করে বালেশ্বরের মতি বাজার পেরিয়ে ক্রিমিনাল ল ইয়ার সুরেন রায়ের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। কটকটে রোদে বালেশ্বর পুড়ে যাচ্ছে। সুরেন রায় একমাথা সাদা চুল নিয়ে বিরাট বসার ঘরে বসে ফৌজদারি মামলার চার-পাঁচজন দশাসই আসামীর সঙ্গে ওড়িয়া ভাষায় কথা বলে যাচ্ছেন।

সেই কথার ভেতরেই একজন আসামী বলল, টিকে এক কথা বলি পারি সুরেনবাবু ?

সুরেনবাবু মুখ ঘুরিয়ে আমাকে দেখতে পেয়েই হাত তুলে আসামীকে থামালেন। আমার তখন আসামীর—'টিকে এক কথা বলি পারি'—শুনে মুখে হাসি এসে গেছে।

সুরেনবাবু বললেন, বাঙালী ?

হাসিমুখেই বললাম, হুঁ। নবীন পর্যটক—

নবীন ? তা বেডিং কোথায় ?

স্টেশনে রেখে এসেছি।

ভেতরে আসুন ! বলেই চড়া গলায় ভেতরবাড়ি থেকে কাকে ডাকলেন।

একজন ষণ্ডামার্কা লোক এল। এসে আমায় একটা ঘরে নিয়ে বসালো। জানলায় বাগান। বাগানে ফুল। তাতে ভোমরা উড়ছে। সবই দেখছি। একটি ভ্রমর বাগান থেকে উড়ে ঘরে এল। হাতপাখা ছিল পাশের খাটে। সেটা তুলে ভীমরুলটাকে (?) মারতে যাবো—এমন সময় সুরেনবাবু ঘরে ঢুকলেন।

ভাল সময়েই এসেছেন। আমি এবার তেল মেখে চান করবো। তারপর দু'জনেই একসঙ্গে খেতে বসা যাবে -

বেশ তো।

উঠোনে দু'খানা জলচৌকি পাতা হল। একটায় সুরেনবাবু বসলেন। অন্যটায় আমাকে বসতে হল দেখাদেখি। দু'জন লোক এসে আমাদের গায়ে তেল ডলতে লাগলো। তারপর পাশের কুয়ো থেকে বালতি বালতি জল ঢালতে লাগল আমাদের গায়ে। আঃ, কী আরাম ! কুয়োর জলে যেন দার্জিলিংয়ের ঠান্ডা ! গা মুছতে গিয়ে ওপরে তাকিয়ে দেখি দোতলার ঝুলবারান্দা থেকে সার দিয়ে বাড়ির মেয়েমহল দাঁড়িয়ে। নবীন বাঙালী পর্যটকের চান দেখছে !

দু'জনে খেতে বসলাম বিরাট বিরাট দুই পিঁড়ি পেতে। তার সঙ্গে জুৎসই থালা বাটি—বড় বড় মাছের মাথা। খেতেও পারেন সুরেন রায়। সাদা মাথা। শরীরের বাঁধুনী বেশ শক্ত। ৭৫ ৮০ তো হবেনই।

রুইয়ের মুড়ো চিবুতে চিবুতে বললেন, আমরা যখন জেনারেল অ্যাসেম্ব্লিতে পড়ি তখন—

ওরে বাবা ! বলে কি বুড়ো ? জেনারেল অ্যাসেম্ব্লি নাম তো ছিল স্বামী বিবেকানন্দের সময়। কবেই স্কটিশ চার্চ নাম হয়ে গেছে জেনারেল অ্যাসেম্ব্লির !

এ কবেকার বুড়ো তাহলে ?

সুরেনবাবু বলছেন, তখন ফিলসফার হিসেবে খুব নাম হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রজেন শীলের—

আমার গলায় বোধহয় কাঁটা ফুটলো।

সুরেনবাবু বলে যাচ্ছেন—আমরা তখনকার স্টুডেন্ট। আপনাদের এ সময় ফিলসফার হিসেবে কাদের খুব নামডাক ?

হড়হড় করে বলে গেলাম—ডঃ মনোজ ঘোষ, ডঃ পবিত্র বিশ্বাস, ডঃ সোয়েদুল ইসলাম—

ঠাকুর আমাদের দু'জনের মাঝখানে ঝুঁকে পড়ে জানতে চাইল—আর একটা করে মুড়ো দেবে কিনা। বৈতরণীর একদম টাটকা রুই।

বেঁচে গেলাম। নয়তো ক্লাস-ফ্রেন্ডদের নামের আগে ডক্টর বসিয়ে বসিয়ে আরও বলতে হোত। দুপুরে বিরাট খাটে লম্বা ঘুম। সূর্য অস্ত যায়-যায়। জেগে চোখ খুলে দেখি জানলার বাইরে বাগানে ঝুমকো জবার মাথার অনেক ওপরে আকাশটাও লালচে। পিঠের নিচে কেমন উঁচু উঁচু ঠেকছে।

তোশক তুলে দেখি—গাদাগুচ্ছের খুচরো। এটা কি তাহলে রায়বাড়ির বাজার সরকারের বিছানা ? রোজকার বাজার থেকে সরানো সিকি, আধুলি—গুনে দেখলাম সাঁইত্রিশটা কাঁচা টাকাও আছে। প্রায় সবটাই প্যাণ্টের ভেতরের পকেটে সরিয়ে দিলাম। রুমাল দিয়ে প্রায় তোড়া বেঁধে। যাতে কিনা হাঁটলে চললে ঝুমুর ঝুমুর আওয়াজ না হয়।

সন্ধ্যের মুখে বালেশ্বর স্টেশনে বেড়াতে গেলাম। যেন আমি এই শহরের পুরনো বাসিন্দা। সবই চেনা আমার। প্যাণ্টের পকেটে রুমালে তখন এক দেড়শো টাকা। একটা টায়ারের দোকান থেকে খাম কিনে কলম ধার চেয়ে কলকাতার বাড়িতে চিঠি লিখলাম নেটোকে—মাকে চিন্তা করতে বারণ করিস। বাঁকুড়া যাওয়া হয়নি। আমি এখন বালেশ্বরে।

চিঠি তো লিখলাম। এখন ডাকে দিই কোথায় ? টায়ারের দোকানীই বলল, এখনই ওয়ালটেয়ার থেকে ট্রেন আসবে। হাওড়া যাবে। গার্ডের কামরার ঠিক আগেই আর. এম. এস. কামরা। প্ল্যাটফর্মে গিয়ে সেই কামরায় সর্টারের হাতে হাতে ধরিয়ে দিন।

দিলামও তাই। সন্ধ্যের অন্ধকারে লেজে লাল ফুটকি জ্বেলে ট্রেনটা হাওড়ার দিকে ছুটে মিলিয়ে গেল। তখনো কি জানি ওই চিঠির আগে আমি কলকাতার বাড়িতে পৌঁছে যাবো !

রাত বেশ অন্ধকার হলে সুরেনবাবুর বাড়ির সামনে ফিরে এসে দেখি সারা বাড়ি অন্ধকার। বাড়ির সামনের লনে একটা হাই পাওয়ারের আলো জ্বলছে। সেই আলো ঘিরে দশকোটি শ্যামাপোকা।

চোখমুখ ঢেকে বারান্দায় উঠতেই বুঝলাম, সুরেনবাবু ইজিচেয়ারে অন্ধকারে শুয়ে আছেন। পাশের ইজিচেয়ারটায় বসতেই বললেন, মুঘল আর্মি কতদূর এসেছিলো জানেন?

না তো!

ওই যে সুবর্ণরেখা নামে রোগা পাহাড়ি নদীটা দেখেছেন—ওই অব্দি। সুবর্ণরেখা কোনদিন পেরোয়নি মুঘলরা। কেন জানেন?

না তো!

মুঘল আর্মি ওই অব্দি এসে আর এগোতে পারতো না। সোলজাররা এসেই জল ছেড়ে বালির চরে সোনার কুচি খুঁজতে বসে যেতো। তখনো সুবর্ণরেখার বেডে সোনা পাওয়া যেতো।

কথার ভেতর একসময় দুই বিরাট বাটিতে দুধ এল। জেনারেল অ্যাসেম্বলির সঙ্গে এক চুমুকে খেয়েও ফেললাম।

দুধ খেয়ে সুরেন রায় বললেন, আগস্ট মুভমেন্টের সময় হরেকৃষ্ণ লুকিয়ে আমার এখানে এসে সুজাতার সঙ্গে দেখা করতো। কাকপক্ষীও জানতো না।

হরেকৃষ্ণ?

হরেকৃষ্ণ মহতাব। সুজাতা ওর বউ।

শ্যামাপোকাও বাড়ছে—রাতও বাড়ছে। সুরেনবাবুর গল্প আর শেষ হয় না। ঘুমে আমি ঢলে পড়ছি। ভাগ্যিস দুধটা খেয়ে নিয়েছি, নয়তো খিদের চোটে নিজেকেই খেয়ে ফেলতাম।

খাবার তাহলে কখন খাবো? শোবোই বা কোথায়?

ঠিক এই যখন মনের অবস্থা—তখন সুরেনবাবু বললেন, গাঙ্গুলীমশাই, কলকাতার টিকিট কাটিয়ে রেখেছি। এই নিন। রাত এগারোটা পনেরোয় ট্রেন। এইবেলা রিক্সা চেপে স্টেশন রওনা হয়ে যান। কাল সকালেই কলকাতা পৌঁছে যাবেন।

না—মানে পর্যটনে বেরিয়ে—

পর্যটন তো কম হল না। এই বেলা বাড়ি ফিরে গিয়ে মা-বাবার মনে শান্তি দিন একটু। পথেই সাইকেল-রিক্সা পেয়ে যাবেন—

তাহলে যাবো?

হ্যাঁ, যাবেনই তো। পরে নিশ্চয় আবার দেখা হবে। এদিকে এলে আসবেন অবশ্য। হ্যাঁ—বেরোবার সময় মা-বাবাকে এবার থেকে বলে বেরোবেন কিন্তু।

তক্ষুনি টিকিট বুকপকেটে রেখে খরপায়ে রওনা দিলাম। সুরেনবাবুর বাড়ির ভেতরে আর ঢোকা হল না। নয়তো ঠিকই করে রেখেছিলাম—রাতে সবাই ঘুমোলে তোশকটা আগাগোড়া তুলে দেখবো। এই সময় যা পাওয়া যায়—তাই-ই লাভের—তাই-ই কাজে আসে। হাঁটছি তো হাঁটছি। সামনে শুধুই অন্ধকার।

আমিও ট্রেনে উঠলাম আর অমনি গাড়ি ছেড়ে দিল। বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে পরদিন বেলা ন'টা।

সবাই জানতো আমি বাঁকুড়ায়। মায়ের কাছেই শুনে থাকবে। তাই কারো মুখে কোন জিজ্ঞাসা নেই। বরং মেজদা বলল, এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলি? দাদা কেমন আছে? বউদি?

আমি তো বাঁকুড়া যাই নি!

তাহলে? আমি তো ভাবছিলাম—বাঁকুড়া গিয়ে নেড়া হলি কেন?

বালেশ্বর গিয়েছিলাম।

সেখানে নেড়া হলি কেন? শেষে পুরী গিয়ে পাণ্ডাগিরি করবি নাকি?

নেড়া আমি কলকাতায় হয়েছি।

মা মাঝখানে এসে পড়লো। পড়েই হাউ হাউ করে কান্না—ওরে পানু আমার সাধু হয়ে যাবে—ও পানু, এবার তুই কার পাল্লায় পড়লি বাবা? সব খুলে বল—

আঃ! থামো তো মা—

বললেও মা কি আর থামে!

মেজদা তিতিবিরক্ত গলায় ফোড়ন কাটলো—হয়তো মানসিক ছিল পানুর। কোথায় মানসিক করে মাথার চুল দিয়ে এলি? বল না খুলে—

স্বপ্নে মা কালী দেখা দিয়েছিল। তাই মাথার চুলটা দক্ষিণেশ্বরে দিয়ে তবে কলকাতা ছাড়লাম—

আজও আমি নিজেও জানি না—কেন আমার মুখ দিয়ে সেদিন এসব কথা বেরোলো! বলা তো যায় না—ভারতী নামে একটা মেয়েকে আমি ভালবাসি। সে আর আমায় বাসে না। বিট্রেয়ার—তারই উসকানিতে আমারই ক্লাসফ্রেন্ডরা নাপিত ডেকে - সন্ধ্যেবেলা—কচকচ করে—

স্বপ্নে মা কালীর যাতায়াতের কথা শুনে টোটো আর উমার চোখ তো গোল-গোল।

মেজদা হাসতে হাসতেই বলল, দক্ষিণা কালী মাথার চুল চাইলেন শেষে! আস্ত মাথাটাই দিয়ে এলে পারতিস! মুড়ো পেয়ে কালীও খুশী হতেন—ল্যাঠাও চুকে যেতো। তোকে নিয়ে কারও আর মাথা-ব্যথাও থাকতো না।

মা ধমকে উঠলো, আঃ!

আমি বললাম, মা কালীর সামনে হাড়িকাঠে গলাটা ঢুকিয়ে দিয়ে তাই বলেছিলাম মেজদা—

দাঁড়া দাঁড়া—কি বললি? দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে হাড়িকাঠে গলা দিয়ে ব্যা-ব্যা করে বললি—মা, আমায় নাও—

তখন আমার চোখে পলক না ফেলে, মেজদার হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে

গম্ভীর গলায় বললাম, না। স্বপ্নে—স্বপ্নের ভেতরে হাড়িকাঠ—

তাই বল। দক্ষিণেশ্বরে তো কোন হাড়িকাঠ চোখে পড়ে নি! মা, তোমায় নিয়ে তো কয়েকবার গেছি—হাড়িকাঠ তো দেখিনি!

মা আবার ধরাগলায় মেজদাকে ধমকালো, তুই চুপ কর। পানু আমার বিবাগী হয়ে যাবে যে—ও পানু, খুলে বল বাবা—স্বপ্নাদেশেই কি বাঁকুড়া না গিয়ে রুট চেঞ্জ করলি বাবা?

ইস্টার্ন রেল থেকে একদম বি এন আর-এ। স্বপ্নাদেশ বলেই সম্ভব মা।—বলতে বলতে মেজদা আমার দিকে তাকালো, তা খোঁজ করে দেখেছি কলেজে তো ডিসকলেজিয়েট হয়েছো। মানসিক-স্বপ্নাদেশে ঘোরাঘুরি তো অনেক হোল—এবারে বই খাতা নিয়ে পড়তে বোসো। বি-এসসি তোমাকে পাশ করতেই হবে পানু। গ্রাজুয়েট না হলে কোথাও গিয়ে চাকরির জন্যে দাঁড়াতে পারবে না।

আমি নিজেই অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম, কী করে এমন বার বার বানিয়ে যাচ্ছি। মানসিক? স্বপ্নাদেশ? একটা কাণ্ড জাগ্রত অবস্থায়—অন্যটা স্বপ্নের ভেতর। দুটোর ভেতর যাতায়াতের কথা বলতে গিয়ে চোখে পলক পড়া চলবে না। গলা গম্ভীর হওয়া চাই। আসলে কি ঘটলেও ঘটতে পারে—কিংবা হলেও হতে পারে—সেটাই তো বলে যাওয়া। পরে হয়ে দাঁড়াল -লিখে যাওয়া। হবার মত ব্যাপার-স্যাপার লিখে যাওয়া।

একসময় অভ্যেস হয়ে দাঁড়াল—হলেও হতে পারে ব্যাপার-স্যাপার গম্ভীর হয়ে বন্ধুদের বলে যাই—যদি দেখি ওরা তাতে মজে যাচ্ছে—তো সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেললাম। লেখাটা পড়ে শোনালে কেউ কেউ বলতে লাগলো—উঃ, দারুণ! কেউ বা বলল—সাহিত্য!

আমার এসব গল্পের বেশির ভাগ শুনতো শংকর। কবি ও গল্পকার শংকর চট্টোপাধ্যায়। আর নেই। অমন একাগ্র শ্রোতা পাওয়া অসম্ভব। মন দিয়ে শুনে বলতো—দারুণ। লিখেছিস?

নাঃ, লিখবো লিখবো ভাবছি।

লিখে নিয়ে আয়। তারপর কাগজে দেবো।

শংকরই একরকম লেখক করে দিল। শুনে শুনে। বলে বলে। লিখিয়ে লিখিয়ে। আর একজন শুনতো—কবি ও গল্পকার সত্যেন্দ্র আচার্য। সে সিগারেট খাবার সময় মাথার ওপর পাখা চালাতে দিতো না। পাছে সিগারেটটা জোর বাতাসে তাড়াতাড়ি পুড়ে যায়। ওদের বাড়ির জলখাবার ছিল মাখন-পাঁউরুটি-চিনি। তারপর চা। এই চায়ের পর গোনাগুণতি সিগারেট। কী করে জোরে পাখা চালাই।

সেদিক থেকে ভাল জলখাবার ছিল কবি মানস রায়-চৌধুরীর বাড়িতে। লুচি তরকারি। সেই সঙ্গে মাসিমা দিতেন একবাটি ডাল। প্রোটিন চাই তো।

কলকাতার অনেক রাস্তা হাঁটতে হোত। সেটা জীবন-যুদ্ধের একটা চ্যাপ্টার যাচ্ছিল।

ঘাঁটি তখন বিজলি সিনেমা হলের গায়ে খুদে এক রেস্তোঁরায়। মানস তো থাকতোই। থাকতো ওর দাদা—তখন হাউসসার্জেন। আর থাকতো ভবিষ্যতে দানিকেনকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলার বীরেন্দ্র মিত্র। ওদের বাড়ির জলখাবার ছিল বেস্ট। মাসিমা জন্মাষ্টমীতে আমাকে, সোমনাথকে ডেকে খাওয়াতেন। পরে গরীব হয়ে যাওয়ায় ওদের জলখাবারের স্ট্যান্ডার্ড পড়ে যায়।

ওরা তো আমার মিথ্যে মিথ্যে বানানো গল্প মুখে শুনতোই—লেখার পরেও শুনতো। শুনে ক্যান্ডিড ওপিনিয়ন দিতো। যেন আমি একজন সাহিত্যিক। তখন সাহিত্যিক বলতে প্রেমেনদাকে দেখি। ধারালো চেহারা। পায়ে পাম্পসু। ধুতি পাঞ্জাবি। এক একদিন বন্ধু-অভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্যের সঙ্গে বিকল মোটরগাড়ি রাস্তায় ঠেলেছেন দু'জনে। কোত্থেকে ফেরার পথে। ওঁর গল্পগুলো পড়ে তখন ভেতরে ভেতরে দুলছি—আর ভাবছি—কত বড় লায়ার!

আচ্ছা লায়ার কি কখনো নভেলিস্ট হয়? কে জানে?

গাদাগুচ্ছের এই মিথ্যে কথাগুলোই কি সাহিত্য? কে জানে?

পড়াশুনোয় লবডঙ্গা। খেলাধুলো জানি না। প্রেমে দেবদাস। ছাত্র-রাজনীতিতে মিসফিট। তার ওপর দিনে দিনে হয়ে উঠেছি চ্যাম্পিয়ান লায়ার। রেস্তোরাঁর মালিক দেবুদা—দেবু বারিক ছুরি দিয়ে আলুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে এক ফাঁকে আমার গল্পও শুনে যান। পরনে হাফপ্যান্ট। পায়ে স্যান্ডেল। মুখে বসন্তের দাগদাগালি। তখনো তাঁর টেস্ট ম্যাচে লাঞ্চ সাপ্লাই দেওয়া শুরু হয়নি। তখনো তাঁর স্পেন্সার সফট ড্রিংকসের মালিক হওয়া অনেক দূরের জিনিস। ক্যাটারিংয়ে তাঁর পথিকৃৎ হওয়াটা তখনো অঙ্কুরেই।

বানিয়ে বানিয়ে যা বলতাম আর লিখতাম—তার সবটাই যে অলীক ছিল তা নয়। জীবন থেকে কয়েক দানা নিয়ে তার সঙ্গে আমার ভেতরকার কল্পনার মিশেলে চোলাই যা দাঁড়াতো—তাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা যায়—কেলাসিত সত্য।

অনেক—অনেক পরে গর্কির ডায়েরি পড়তে গিয়ে দেখলাম—তিনিও তাঁর জীবনের দানা, গুঁড়ো এইসব কল্পনায় চুবিয়ে মজুর-ভবঘুরেদের বলতেন। তারাই ছিল তাঁর প্রথম শ্রোতা। পয়লা অ্যাসিড টেস্ট। সেইসব শোনানো গপ্প তিনি পরে লিখে ফেলেন।

।। দশ ।।

আসল কথা বোধহয় মজানো। মজিয়ে ফেলে পড়িয়ে নেওয়া।

তখন একজন পেল্লাই ঢ্যাঙামত লোক ভোরবেলা হাজরা মোড় দিয়ে ফুটপাথ ধরে ভবানীপুরে যায় প্রায়ই। কোন কোন দিন পাজামার একটা পা নিচের দিকে ছেঁড়া। চোরকাঁটায় ভর্তি। অল্পদিনের ভেতর তাঁর পরিচালনায় একটা ছবি বেরলো। পথের পাঁচালী। সত্যজিৎ তখন হয়তো বোড়ালে ছবির লোকেশন দেখতে যেতেন।

কি কারণে যেন দেবুদার রেস্তোরাঁ কিছুদিন বন্ধ হয়ে গেল। আমরা গিয়ে আশ্রয় পেলাম কালীঘাট ফায়ার ব্রিগেড স্টেশনের পাশে প্যারাডাইস রেস্তোরাঁয়। সেখানে এখন অনেকদিন হল ভাতের হোটেল। মাঝে বোধহয় ফার্মেসি হয়েছিল দোকানটা।

প্যারাডাইসের মালিক বাকি পড়ায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। আমাদের পড়ত সামান্যই। কিন্তু দুজন লম্বাটে—আমাদের চেয়ে বয়সে বড়, চোখে চশমা, ধারালো চেহারার ত্রিশ-বত্রিশের মানুষ—একজন কালোর দিকে অন্যজন ফর্সার দিকে—প্রায়ই দেড়-দু'লাখ টাকার বাজেট নিয়ে প্যারাডাইসের নড়বড়ে টেবিলে তুমুল হিসেবে মত্ত হয়ে পড়তেন। ঘন ঘন চায়ের অর্ডার দিতেন তাঁরা। ওঁদের হিসেব থেকে ছিটকে দু'একটা কথা ভেসে আসতো। ল্যাব। প্রিন্ট পাবলিসিটি। ক্যামেরা। আরও কত কি। আমাদের একটা টেবিল বাদেই এত বড় ব্যাপার ঘন ঘন ঘটে যেতো। দোকানী একদিন আর পারলেন না, পুরনো হিসেব চাইলেন। চা আর দিলেন না—আগের পাওনা ক্লিয়ার করুন।

তখন গায়ে মাখিনি ওঁদের। কিংবা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম। পরে দেখি ওঁদের একজন মৃণাল অন্যজন ঋত্বিক। অপরাজিত, তিতাস একটি নদীর নাম, ভুবনসোম দেখে যে কোন মগজে ঘুমন্ত স্মৃতি, ঘুমন্ত সংস্কার জেগে উঠতে বাধ্য।

সাহেবরা ওঁদের জীবনী লিখছে—আমার কেমন সন্দেহ হয়। অনেকটা ওয়ার্কিং লাঞ্চের মত। এদেশে ঘুরে গেলাম। টেপ করলাম। কথা বললাম। তারপর একখানা বই। আমার বিশ্বাসই হয় না। এভাবে কি ওঁদের বীজে পৌঁছানো যায়? ওঁদের বীজে পৌঁছানো মানে ওঁদের ভাল ছবির বীজে গিয়ে হাজির হওয়া। আর সেসব ছবি তো তারও আত্মা, ওরফে বাঙালিয়ানার জরায়ু।

আবার ভারতীয় কমার্শিয়াল ছবির কেষ্ট-বিষ্টু যাঁরা, কম বয়সে ঋত্বিক বা মৃণালের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করেছেন—তাঁদের কাছে ঋত্বিকের কথা তুলেছি। ওঁরা

ঋত্বিক বলতে অনিয়ম, অগোছালোপনা, দায়িত্বজ্ঞানহীনতার গল্প শুনিয়েছেন আমায়। একবারও ঋত্বিকের ছবির বৈশিষ্ট্য বা শিল্পগুণ নিয়ে কথা বলেন নি। ওঁরা এখন ফিল্মোৎসব, সেনসর, এন এফ ডি সি, হালকা হাসির হিন্দি ছবি করেন। নিজেদের বলেন লেফ্‌ট। সুটিং করেন প্যারিসে। কিন্তু ঋত্বিক বলতে বোঝেন —ওঃ, আমাদের পাশের বাড়ির সেই রেকলেস বাউণ্ডুলে! প্রশংসা করতে ঠোঁট ফেটে যায়। খেয়ালই করেন না—এমনভাবে কোন ভারতীয় চলচ্চিত্রকার গত পনের বছরের নতুন সিনেমাকে যদি সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করে থাকেন তো তিনি ঋত্বিক—আর কেউ নন। কোন প্রতিভা আগাম অবতীর্ণ হলে তাঁর ধ্বজা পরবর্তীরাই বয়ে নিয়ে গিয়ে থাকেন। ঋত্বিক কোথায় ধার করেছেন—কাকে ফেরৎ দেননি—কাকে গালাগালি করেছেন কিংবা কোথায় বমি করেন—এটা কোন ব্যাপারই নয়।

ওঁর মৃত্যুর বছর দুই আগেও অদ্ভুত জায়গায় দেখা হয়ে যেত। একবার তো রাত দুটো নাগাদ পায়ে প্লাস্টার অবস্থায় আমাদের এক আড্ডায় এসে হাজির। সঙ্গে ওঁর মেয়ে। দু'চারজন ভক্ত। ভাল করে হাঁটতেও পারেন না। আমাদের সঙ্গে খেলেন। খেয়ে আমাদেরই গালাগালি।

মরে যাবার মাসকয়েক আগে টেকনিসিয়ানে আমাকে আর আমার স্ত্রীকে একটি ছবি দেখতে নেমন্তন্ন করলেন। ইতি আর আমি গিয়ে দেখি শুধু আমাদের জন্যই ওঁর ছবি স্ক্রীন করেছেন। সঙ্গে ওঁর সেই হাফ-প্যান্ট হাফ-শার্ট পরা ভাই। চারজনে বসে ফাঁকা হলে দেখলাম। বোধহয় যুক্তি তক্ক গপ্পো। অনেক দোষ—কিন্তু এত গুণও ছিল ছবিটায়! দেশবিভাগ উনি মানেন নি।

ট্রেনে নাইট-জার্নির ধকল ছিল। ভেতরের ঘরে গিয়ে জামা খুলে শুতেই ঘুমিয়ে পড়লাম। বালেশ্বর থেকে একনাগাড়ে দাঁড়িয়ে এসেছি হাওড়া অব্দি। বিকেলে ঘুম ভাঙতেই মা খেতে দিল—খিচুড়ি। খেয়েই আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল সেই সন্ধ্যেবেলা। খোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি—ভারতীর কলকাতা অন্ধকার হয়ে আসছে। আঢ্যমশায়ের চালগোলায় সোমনাথ ওরফে হরিপদর কী হল জানা দরকার। অথচ বিছানা ছেড়ে উঠতেও ইচ্ছে করছে না। সারাগায়ে ব্যথা।

টোটোর আনা একখানা অনুবাদ উপন্যাস বিছানাতেই হাতে পড়ল। ইংরেজি থেকে বাংলা। স্পার্টাকাস। দাস গ্ল্যাডিয়েটরদের মরণযুদ্ধ চলছে স্টেডিয়ামে। হয় বন্ধু দাসকে খুন করো, নয়তো নিজে তার হাতে বধ হও! খেলার এই নিয়ম। উলঙ্গ প্রায় দুজনের শরীর থেকেই রক্ত ছুটছে। সুন্দরী মেয়েদের নিয়ে অভিজাত রোমানরা সুখাদ্য খেতে খেতে সেই খেলা দেখছে। দু'জন গ্ল্যাডিয়েটর

যুদ্ধ করতে করতে মরছে। আর ওরা তাই দেখতে দেখতে হাসি-ঠাট্টায় গোপন কামকেলির অভিলাষে ডুবে যাচ্ছে।

অনেক রাত অব্দি পড়ে শেষ করতে পারলাম না উপন্যাসখানা। পরদিন সকালে পড়ছি।

মেজদা টাকা দিয়ে বলল, যা আবার—ফোর্থ ইয়ারে গিয়ে ভর্তি হয়ে আয়। মন দিয়ে একটা বছর পড়বি। হাসতে হাসতে পাস করে যাবি।

কী হল ঠিক জানি না, গ্ল্যাডিয়েটরদের নেতা স্পার্টাকাসের মুড আমায় পেয়ে বসেছিল। ভর্তি হলাম গিয়ে থার্ড ইয়ারে। ঠিক করলাম, ফিরে পড়ব গোড়া থেকে। ভাল রেজাল্ট করতে হবে।

ভর্তি হয়ে বাড়ি ফিরে আবার ঘোরের ভেতর স্পার্টাকাস পড়ে যাচ্ছি। শেষের কয়েক পাতা বাকি। মেজদা অফিসফেরৎ সন্ধ্যেবেলা এসে জানতে চাইল, ভর্তি হয়েছিস?

হুঁ।

তাহলে একটা বছর ভাল করে পড়। এখন গল্পের বই তুলে রাখ।

আমি কিন্তু থার্ড ইয়ারে ভর্তি হয়েছি। আবার গোড়া থেকে পড়তে হবে—

কেন?

গোড়া থেকে পড়ব ভাল করে।

আবার দু'বছর? মেজদা ছুটে এসে আমার চুলের মুঠি ধরল। ধরে এক টানে আমায় বিছানায় বসিয়ে দিল। হাত থেকে স্পার্টাকাস পড়ে গেল মেঝেতে।

আমি শুরু থেকে শুরু করতে চাই। ভাল করে শুরু করতে চাই। কিন্তু তা এরা চায় না। এখন বুঝি—চাওয়ার কথাও নয়। কেননা সংসার টানতে গিয়ে মেজদাদের পিঠ বেঁকে যাচ্ছিল। তনুদা সুইসাইড করে পার পেয়ে গেছে। আমার তাড়াতাড়ি গ্র্যাজুয়েট হয়ে চাকরি নেওয়া দরকার।

শত্রুপক্ষের ইলেকট্রিক মিটারে তামার পয়সা বসিয়ে ধাঁ ধাঁ করে ইলেকট্রিক বিল বাড়িয়ে দিতে পারি। শেষরাতে লাইটপোস্ট বেয়ে উঠে সারা শহর অন্ধকার করে দিতে শিখেছি তো স্কুলে থাকতেই। কিন্তু গুরুজন বিশেষত মেজদাকে কাহিল করি কি করে? দিলাম ন্যাড়া মাথা দিয়ে ঢুঁসিয়ে।

মেজদা ভাবতেই পারে নি—তৈরিও ছিল না—অল্প-চুল-গজানো আমার মাথাটি তার পেটে গিয়ে যেমন ঢুঁসোলো—তেমনি বোধহয় কাতুকুতুও দিল। মেজদা চটে গিয়ে আমায় আড়ংধোলাই দিল।

অনেক পরে কথাসাহিত্যিক প্রফুল্ল রায় আমার একখানি ঠিকুজি করে দেন। তাতে লেখা আছে—জীবনে প্রথম উনিশটি বছর রাহুর দশা। 'রাহুকে' আমার মত কে চেনে!

আমার ধোলাই বাবদে সেদিন মা খেল না—আমিও না। ধোলাইয়ের পর নিয়ম ছিল—আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়া। এরকম ধোলাই খেয়ে আগেও শুয়ে পড়েছি তাড়াতাড়ি। তাই শুলাম। পাশের ঘরে আলো জেবলে মেজদা বোধহয় পড়ছিল। তার পাশের ঘরে টোটো, উমা, টাপু—ওরাও তো পড়ছিল বোধহয়।

আমি ডবল শার্ট ডবল ট্রাউজার পরে বেরিয়ে পড়লাম নিঃশব্দে। হাওড়া স্টেশন। ট্রেন। ভোররাতের দিকের আলোয় বাঁকুড়া। বড়দা তখন স্কুলডাঙার গায়েই প্রতাপবাবুর বাগানে। অনেক আমগাছ, তালগাছ, দীঘি।

পৌঁছনো মাত্র বড়বৌদি মুড়ি চিনি ঘি দিয়ে মেখে দিল। দিয়ে বলল, কি খাবি দুপুরে? এখানে পাঁঠার মাংস খুব মিষ্টি হয়!

খেতে বসে দেখলাম—সত্যি তাই।

বাঁকুড়ার শীতের দুপুর—বিশেষ করে প্রতাপবাবুর বাগানে বড়দার একতলা ভাড়াবাড়িতে আসলে ছিল ঘুমের ক্যাপসুল। আমি মাংস ভাত খেয়ে টানা ঘণ্টা চারেক ঘুম দিয়ে জানলায় দেখলাম—দূরে শুশুনিয়া পাহাড়ের মুণ্ডু। আর বাগানের গা দিয়ে একটা লাল পথ চলে গেছে শহরের বাইরে—পাহাড়ের দিকে কিনা জানি না।

ঘাসে ঢেকে আসা পথ। বড় বড় গাছ। দিঘিতে বিশাল বিশাল পদ্ম। বাগানের বর্ডারে বিশাল বিশাল তালগাছ। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তায় এসেছি। তালগাছ থেকে গাছি নামল। যেন স্বয়ং কালকেতু। পরনে প্রায় কৌপীন। কোমরে পা আটকাবার ফাঁদ আর গাছ কাটার ধারালো দা। আশেপাশে কেউ নেই। লোকটা যেমন কালো—তেমন তাগড়া লম্বা—আর সাদা দাঁতে একগাল হাসি। খাবেন? না বুঝে তাকিয়ে আছি। সদ্য নামানো কলসী থেকে তালপাতার ভাঁজকরা গ্লাসে তেলো তাড়ি ঢেলে দিল। খেলাম। অপূর্ব। লোকটা নিজেও খেল অনেকটা। আমায় আবার দিল—আবার খেলাম।

আমায় যেমন দিয়েছিল—আবার দিয়ে লোকটা পাশের গাছে তরতর করে করে উঠে গেল। আকাশ অন্ধকার করে সন্ধ্যে আসার যোগাড়। আমি মাথায় ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া লেগে আরাম পেলাম।

হাঁটতে হাঁটতে কলেজ, জেলাস্কুল, তারপর ফেমাস টি স্টলের ভিড়। খানিক এগিয়ে একটা ছবিঘর। তার সামনে সিমেন্টে তৈরি প্রমাণ সাইজের হাতি। অবাকই লাগছিল। মাত্র ক'দিন আগে ভারতীর উস্কানিতে নেড়া হতে হল। তারপর চেতলার আঢ্যদের চালগোলায় গৃহভৃত্য। সেখান থেকে বালেশ্বরে গিয়ে ফৌজদারি উকিল সুরেন রায়ের সঙ্গে পাশাপাশি বসে কুয়োর জলে স্নান। এখন সন্ধ্যের মুখে দোবারা তেলো তাড়ি পান ও শুশুনিয়ার মুণ্ডু দর্শন। বেশ আছি। এরই ভেতর স্পার্টাকাস পড়েছি। আবার থার্ড ইয়ারে ভর্তি হয়েছি। ভেবেছিলাম—ভাল হব।

কিন্তু তা হবার নয়।

সেই সিনেমাটায় তখন হচ্ছিল শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি। ডিরেক্টর ছিলেন সম্ভবত কার্তিক চট্টোপাধ্যায়।

শো ভাঙল। হুড়হুড় করে লোক বেরিয়ে আসছে।

হঠাৎ দেখি—কেউ কেউ আমার দিকে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছে। কি ব্যাপার? আমি যে তাড়ি খেয়েছি তা বুঝল কি করে? আমি তো বেচাল কিছু করিনি!

ভিড়ের ভেতর থেকে একটি ছেলে এগিয়ে এসে বলল, দারুণ অভিনয় করেছেন!

আরও হকচকিয়ে গেলাম। বলে কি ছেলেটা! বোধ হয় স্কুলে পড়ে। হাতে একটা বেঁটে সাইকেল। খানিক এগিয়েছি—আবার আমার চেয়ে কিছু বড় ছেলে এগিয়ে এল।

—নমস্কার। আপনি কবে এসেছেন?

—মানে?

—কোথায় উঠেছেন?

—আপনাকে চিনলাম না তো!

—আমাকে আপনার চেনার কথাও নয়। কিন্তু আপনাকে আমরা সবাই চিনতে পেরেছি—লুকোবার যতই চেষ্টা করুন! হাঃ হাঃ হাঃ।

ছেলেটির সঙ্গে দেখলাম আরও পাঁচ-ছ'জন একসঙ্গে হাসল।

আমি থতমত খেয়ে যেতে ওরা এগিয়ে এল, রামের সুমতিতে আপনার অ্যাকটিং সুপার্ব মাস্টার ছবি।

ছবিটার পোস্টার দেখেছি আগে। রামের সুমতিতে রাম সেজেছিল আমারই বয়সী একটি ছেলে। তখন অল্পবয়সী অভিনেতার নামের আগে মাস্টার আর অল্পবয়সী অভিনেত্রীর নামের আগে বেবি বসানো হোত।

ছদ্মবেশে কিছু একটা করে ফেলার নেশা আমার অনেকদিনের। আমি আসলে যা নই—কিছুক্ষণের জন্যে তাই হয়ে গিয়ে অসাধ্যসাধন কিংবা কেলেংকারি বাঁধিয়ে বসে আছি ভাবতেই আজও আমার রোমাঞ্চ হয়। সম্ভবত আসল জীবনে কোনদিন কিছুই করতে না পারায় অন্য কোন একটা বড় পরিচয়ের খোলসে ঢুকে পড়ে সর্বদাই বড় কিছু করে ফেলার স্বপ্ন দেখতাম। সে কাণ্ড বড়ই হোক আর কেলেংকারিরই হোক—যা কিনা আসলে আমি কোনদিনই পারব না। যেমন—

(ক) অল্প বয়স থেকেই ভাবতাম—আমি মোহনবাগান কিংবা ইস্টবেঙ্গলের গোলকিপার। ভাবতে ভাবতে একদিন স্কুলে থাকতে মফঃস্বলের টিমের এক ক্যাপটেনকে গুল দিলাম—আমি শহরের টাউন ক্লাবের আগামীবারের গোলকিপার। এখন প্র্যাকটিস চলছে। সে বিশ্বাস করে আমায় দশ টাকা ভাড়ায় খেলাতে নিয়ে গেল গাঁয়ের এক মাঠে! ঘোর বর্ষা। ভীষণ পিছল মাঠ।

চোদ্দ গোল খেলাম। দুই টিমের সব প্লেয়ার মিলে খেলার শেষে আমায় পাঁক মাখিয়ে মিছিল করে নদীর ঘাটে নিয়ে গেল। সঙ্গে টোটো ছিল। সে কাঁদছিল। আমি আনন্দে হাসছিলাম। ধরা পড়ি আর যাই পড়ি—একটা কাণ্ড তো হোল! সবাই মিলে মাঠের পাঁক মাখিয়ে মিছিল করে নদীর ঘাটে তো গেল আমায় নিয়ে!

সেখানে গিয়ে সব ধুয়ে তবে শহরে ফিরি। ওরা দশ টাকাই কেড়ে নেয়।

আবার যেমন—

(খ) সবাই ছুটে গিয়ে ভোঁ-কাটা ঘুড়ি লোটে। পাকা লুটিয়েদের হাতে আবার আঁকশি থাকে। ঘুড়িটা লুটে মাঞ্জা দেওয়া সুতোটা গম্ভীরভাবে হাতে গুটিয়ে নিতে হয়। তখন যারা দেখবে—তারাও গম্ভীর হয়ে যাবে—কিন্তু হিংসায় তাদের বুক ফেটে যাবে। চিরকালই হিংসায় আমার বুক ফেটেছে। কোনদিন একটাও ঘুড়ি লুটতে পারিনি। কিন্তু সব ভোঁ-কাটা ঘুড়ির পেছনেই ঊর্ধ্ববাহু হয়ে ছুটেছি। সঙ্গে টোটো।

একবার একখানা ঘুড়ি ভোঁ-কাটা হয়ে ভাসতে ভাসতে এল পানাপুকুরে—পানাপুকুরে পড়ল। আমরা লুটেরারা দৌড়তে দৌড়তে পুকুরপাড়ে এসে থমকে দাঁড়ালাম। ফিরে যাব? প্যাণ্ট-শার্ট টোটোর হাতে দিয়ে ল্যাংটো হয়ে ঝাঁপ দিলাম। ততক্ষণে ঘুড়ির কাগজ জলে ভিজে গলে গেছে। আমি ঘুড়ির কাঠি দু'খানা আর মাঞ্জা-গলে-যাওয়া খানিক সুতো নিয়ে তীরে উঠে এলাম। সেই আমার প্রথম ঘুড়ি লোটা।

টোটো লজ্জায় আমার দিকে প্যাণ্ট-শার্ট ছুঁড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিল।

আর উদাহরণ থাক। শুধু শর্টে বলি—অনেক ছবি দেখতে গিয়ে আমি নিজেকেই দেখতে পেয়েছি—বিশাল স্ক্রীনে উত্তমের জায়গায় আমি নিজে সুচিত্রার খোঁপায় ফুল গুঁজে দিচ্ছি। রাজকাপুরের জায়গায় স্ক্রীন জুড়ে কোরিওগ্রাফির ভেতর আমি নিভুল ঢোল বাজাচ্ছি—পা ফেলছি তালে—আবার মুকেশের গানের ঝোঁকে সময়মত নার্গিসকে টিজও করছি।

পরে এই জাতের একটা ছবি দেখেছিলাম। ড্যানি সেজেছিল গোগোলের ইন্সপেক্টর জেনারেল। আর একটা ছবির নাম শুনেছি—সিকরেট লাইফ অব স্যার ওয়ালটার মিটি। বড় সাইজের ইমপোস্টার।

বাঁকুড়া শহরে ফেমাস টি স্টলের সামনে সন্ধ্যেবেলাটা জমজমাট। মাস্টার ছবির সঙ্গে—পোস্টারে যা দেখেছি—কোঁকড়া চুল আর কপালে মিল ছিল। মুখের মিল ওরা পেয়ে থাকবে। খুব লাজুক হেসে বললাম, ক'দিন ছুটি কাটাতে এসেছি।

ওদের একজনই বলল, ছবিটা হিট হওয়ায় আপনার নিশ্চয় এখন সুটিংয়ের চাপ?

আবার লাজুক হাসলাম।

কি কি ছবি করছেন ?

চাপা গলায় বললাম—কয়েকখানা ফ্লোরে আছে। কিছু ছবির কথা চলছে—

কনট্রাক্‌ট সই করেছেন তো অনেক ?

আবার লাজুক হাসলাম।

যে আমায় প্রথম চিনতে পারে—সে-ই আমার সঙ্গে কথা বলার বড় দাবিদার হয়ে উঠল, তাতে অন্যরা রেগে এগিয়ে গেল। দেখি—একটা গোলমাল হবার উপক্রম।

বললাম, আমি ভিড় একদম পছন্দ করি না।

ওদেরই একজন বলল, হ্যাঁ, চিনতে পারলে লোক ঠেকানো যাবে না।

আরেকজন বলল, চলুন না—কলেজমাঠে অন্ধকারে গিয়ে বসবেন। কেউ জানবে না। বেশ সিক্রেটলি।

যেন বাধ্য হয়েই বললাম—চলুন।

জনা-দশ-বারোর একটা চাপা-প্রিভিলেজড্ ভিড় আমায় মাঝখানে নিয়ে মাচানতলা পার হল। আমরা কলেজের অন্ধকার মাঠে গিয়ে বসলাম। কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছি না। আমার চক্ষুলজ্জা কেটে গেল। মাথা গুনে দেখি—তা জনা-কুড়ির কম নয়। তাদের হাজারো কোশ্চেন। যেন প্রেসকে মিট করছি—এইভাবে সব কোশ্চেনের জবাব দিয়ে গেলাম। যেমন—

—সাবিত্রীর অপোজিটে কোন রোল করছেন না ?

—একটা ছবি সাইন হয়ে আছে অনেকদিন। এখনো ফ্লোরে যায় নি। আর তাছাড়া—

—বলুন ! বলুন—

—সাবিত্রী আমার সঙ্গে অভিনয় করতে বিশেষ রাজি নন। হিরোর চেয়ে যদি বয়স্ক দেখায়—তাহলে কোন্ হিরোইন রাজি হয় ?

—হোঃ হোঃ হোঃ ! তা ঠিক। ওঁর পাশে আপনাকে ছেলেমানুষ লাগবে। আপনি এখন কার সঙ্গে বেশি ছবি করছেন ?

—দু'খানা ছবি সুচিত্রার সঙ্গে। আরও একখানা হবে। মনে হচ্ছে প্রোডিউসার উত্তমকে বাদ দিয়ে নিতে চাইছেন।

—উত্তমকে বাদ দিয়ে ?

—হ্যাঁ। অবাক হবার কি আছে ? একই ম্যানারিজমের পেটেন্ট হয়ে পড়ছে উত্তম। তাই নয় কি ?

—হ্যাঁ, তাই তো ! এদিকটা আমরা লক্ষ্যই করিনি।

—গলা শুকিয়ে এল ভাই।

—নিশ্চয় নিশ্চয়। যা তো মনোতোষ—ফেমাসের কবিরাজি কাটলেট আনবি

দুটো—আর গরম চা। যাবি আর আসবি।

—ভুলেও আমার নামটি যেন করবেন না।

—তা আর বলতে! বলেই একজন অন্ধকারে ছুটে গেল। রাস্তায় বোধহয় খালি রিক্সা দেখতে পেয়েছে।

—পার ছবি আপনি কত নিচ্ছেন?

—ও আলোচনা নাই বা হোল ভাই।

—তবু? একটা ছবি যখন সাইন করেন—তখন তো কিছু নেন—

—সাইনিং মানি? সেটা বলতে কোন আপত্তি নেই। প্রোডিউসার বুঝে নিয়ে থাকি। কারও বেলায় স্রেফ এক টাকা নিয়ে সই করি। ওটা নিতেই হয়—নয়তো কন্ট্রাক্ট কমজোরি হয়ে যায়। আবার কারও বেলায় দশ হাজার অব্দি নিয়ে থাকি। যদি বুঝি স্ট্রাগলিং ডিরেক্টর—গল্পটা ভাল—চ্যালেঞ্জিং রোল—অপোজিটে ভাল স্টার তো নামকেওয়াস্তে যে কোন একটা টাকা নিয়ে সই করে দিই।

—সাহস আছে আপনার—

—কি করবো? নতুনদের তো সাহস দিতে হবে। ওরাই তো ইন্ডাস্ট্রির ফিউচার—

রিক্সা একদম মাঠে ঢুকল। এ কি! এ যে অন্য লোক!

একজন মোটামত লোক এক ট্রে কবিরাজী কাটলেট নিয়ে এসে পড়েছে। সঙ্গে পেয়ালাপিরীচ, ধোঁয়া ওড়ানো কেটলি।

—আপনি?

—আজ্ঞে দোকানটা আমারই। শুনলাম—আপনি স্বয়ং এসেছেন, তাই চুপ করে বসে থাকতে পারি?

কে একজন বলল, ওঁর নাম বললি কেন?

যে চা-কাটলেট আনতে গিয়েছিল সে বলল, ওঁর নাম বলাতে তো কেটলি, কাপ, প্লেট এল। নয়তো দিতে চাইছিলেন না।

দোকানী বলল, এর দাম আমি নিতে পারব না। আপনি বাঁকড়োর অতিথি—

আপত্তি করলাম—তা কি করে হয়? আপনার এটা ব্যবসা। তাছাড়া আমি বেড়াতে এসেছি। সব খরচখরচা সামনের ছবির প্রডিউসারের।

—এইবারটির মত আমায় মাফ করতে হচ্ছে মাস্টার ছবি। আমিও একজন আর্টিস্ট। হলাম না হয় ছোট আর্টিস্ট—

—কি রকম?

একজন বলল, বীরেশ্বরদা নিজেই তো পঞ্চানন অপেরার অধিকারী, হিরো—যাই বলুন।

বীরেশ্বর দোকানী বলল, এর পর কাল যা খাবেন তার দাম না হয় নেব।

নিন্‌ চেখে দেখুন।

অন্ধকারে সবার হাতেই স্পীড-এ চলছিল। বুঝলাম—এক ঘন্টার ভেতর এতটা বিশ্বাসযোগ্য হওয়া ঠিক হয়নি। কাল দিনের আলোয় তো শহর ভেঙে পড়বে প্রতাপবাবুর বাগানে!

আচমকা উঠে পড়ে বললাম, চলি।

—দাঁড়ান রিক্সা ডেকে দিই।

—না না, কোন দরকার নেই। বলেই ছুটে রাস্তায় এসে স্টেশন-ফিরতি ফাঁকা রিক্সায় চড়ে বসলাম। বসেই বেশ চেঁচিয়ে রিক্সাওয়ালাকে বললাম—চলো কেঁন্দুটি।

বাঁকুড়ায় এসে এই কেঁদুয়াডিহির নাম শুনেছি। আগেও শোনা ছিল। ওদিকে যাবার রাস্তাটাও সন্ধ্যের ঝোঁকে দেখে রেখেছি। এখানকার লোক যে কেঁন্দুটি বলে তাও এই ক'ঘন্টায় শুনে রেখেছি।

ওরা ফলো করার আগে রিক্সা তীরবেগে চলল—কলেজ কম্পাউন্ড বাঁয়ে ফেলে। অনেকটা গিয়ে রিক্সা থামালাম। একটা আস্ত কাঁচা টাকা দিয়ে বললাম—সামনে যে মোড় পাবে সেখানে গিয়ে দাঁড়াবে।

আপনি?

তুমি যাও না—আমি যাচ্ছি।

রিক্সা এগোতেই আমি বেঁটে দেওয়াল টপকে কলেজমাঠে ঢুকলাম। যা ভেবেছি।

ওরা মাঠ ছেড়ে দিশেহারা হয়ে রিকশাটা খুঁজছে। আমি গেট পেরিয়ে বাঁকুড়া সড়ক টপকেই প্রতাপবাবুর রাস্তায় পড়লাম। এদিকটায় স্ট্রীট লাইটের বালাই নেই।

বড়দা ফিরল রাত করে। আরও রাত করে এল বড়দার তাস খেলার খেলুড়েরা—রাত প্রায় ন'টা নাগাদ। এদের ভেতর দেখতে সুন্দর এক ভদ্রলোক মন দিয়ে তাস বাঁটছিলেন আর একা একাই কথা বলছিলেন। বড়দা ঘরের ভেতর অফিসের জামা কাপড় ছাড়তে ছাড়তে জবাব দিচ্ছিল। অনেকটা এরকম—

সিনেমা আর্টিস্ট নিয়ে কি ক্রেজ দ্যাখো ভাই—

ঘরের ভেতর থেকে বড়দা বলল, কেমন?

বারান্দা থেকে তাস বাঁটতে বাঁটতে সেই ভদ্রলোক: কে এক মাস্টার ছবি এসেছে নাকি এ শহরে। তাকে খুঁজে বের করার জন্যে এক রিক্সাওয়ালাকে দেখলাম কেন্দুটির মোড়ে জোর-জবরদস্তি করছে একদল ছেলে—কী হল বল তো দেশটার?

কি আর হবে। কোন কাজ নেই। তাস বাঁটো গোকুল, আমি আসছি—

আমি শুনছি আর কাঁটা হয়ে যাচ্ছি। গোকুল নামের সুপুরুষ ভদ্রলোক বললেন, আমার ছোটবোনও তো হিরোইন সিনেমায়। আমরা তো কাউকে এমন

যেতে যেতে দেখিনি।

কে? তোমার বোন সুমিত্রা দেবী তো? আরে সে তো আর্টিস্টের মত আর্টিস্ট। 'পথের দাবী'তে সুমিত্রা সেজেছিলেন। আজও আমার চোখে লেগে আছে।

আমি ভাবি—ওরে বাবা, এ যে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা হয়েছে। এই গোকুল নিশ্চয় সিনেমার নাড়ি-নক্ষত্র জানে। কাল ভোরে রোদ উঠলে যখন ধরা পড়ব—তখন বড়দার বন্ধু এই গোকুল থাকলে তো কেলেংকারির একশেষ। কেন যে জট পাকাতে গেলাম।

বড় বউদি বলল, খেয়ে নে—তোর বড়দার খেলা ভাঙতে দেরি আছে। তুই আর আমি খেয়ে শুয়ে পড়ি।

বড়দাকে খেতে দেবে না?

খেলা শেষ হলে আমায় ডাকবে, তখন ভাত বেড়ে দেব।

প্রতাপবাবুর বাগান নিঃঝুম হয়ে এসেছে। তাস খেলতে খেলতে বড়দা আর গোকুল যাও বা দু'একটা কথা বলছে, বাকি দুই পার্টনার একদম নির্বাক। তক্ত-পোষের ওপর মাদুরে হেরিকেন ঘিরে চার তাসাড়ু। উঠোনে ওদেরই যার যার ফেরার সাইকেল দাঁড় করানো। শীতের দাপটে রাত আরও নিঃঝুম করে দিচ্ছিল।

বুঝলাম—আমাকে এবার পালাতে হবে। আজ রাতেই। খাওয়া-দাওয়ার পর মশারির ভেতর চোখ খুলে শুয়ে আছি। অনেক রাতে ঘুম-চোখে বড়বৌদি বড়দাকে ভাত বেড়ে দিল। তারপর এক সময় বড়দাও শুয়ে পড়ল। সে কি নিস্তরঙ্গ জীবনই না ছিল। অফিস করো। খাও দাও। তাস খেলে ঘুমিয়ে পড়।

শেষরাতে অন্ধকারেই রেডি হয়ে গেলাম। বড়দা তখন অঘোর ঘুমে। বড় বৌদিকে চাপা গলায় ডেকে তুললাম। আমি যাচ্ছি—

কি ব্যাপার?

ফিরে ভর্তি হয়েছি তো। অ্যাবসেন্ট হওয়া ঠিক হবে না কলেজে।

তাই বলে এখুনি যাবি?

হুঁ।

এখন তো ট্রেন নেই।

ট্রেনে যাব না। বাস ধরব।

শীতকালের শেষরাতের বাঁকুড়া। রীতিমত বরফ পড়ছে যেন। বাসের গা শিশিরে ভেজা। তখনো দুর্গাপুর হয়নি।

খানিকবাদে বর্ধমান, বাস ছুটছে। দুধারে শালজঙ্গল। আমি বাসের ভেতর বসে ঠকঠক করে কাঁপছি। আমার সামনের সিটে একজোড়া কাবুলিওয়ালা। ওরা সুদ খেতে যাচ্ছে বর্ধমানে।

নতুন করে পড়তে গিয়ে দেখি—পড়াগুলো বিশেষ কিছুই বুঝতে পারি না

ক্লাসফ্রেন্ডরা বয়সে ছোট বেশ। ট্রামভাড়া, কলেজের মাইনে—এসব আর বাড়ি থেকে চাওয়া যায় না। টিউশনি যোগাড় করলাম।

আলিপুর জেলের কাছে আদিগঙ্গার ওপর কাঠের পোল! এখন সেটা সিমেন্টের। পোল থেকে নেমে খানিক এগিয়ে কাঠগোলা! সেখানে একটি ছাত্র পেলাম। বিবাহিত। ক্লাস নাইন। গলায় কণ্ঠী, বিড়ি ধরিয়ে পেচ্ছাপ করতে বসে।

তাকে টাস্ক দিয়ে টাস্ক পাই না। কোন না কোন ছুতো করে টাস্ক এড়িয়ে যায়। ফেরতা দিয়ে ধুতি পরে। গোলার পেছনেই ওর বাবা, মা, বউ, ভাই-বোন। একদিন তো নিজের ছ'মাসের মেয়ে কোলে নিয়ে পড়তে এল।

রীতিমত ধমকে উঠলাম—যাও, বাচ্চা দিয়ে এসো ভেতরে!

অনেক—অনেক ভাবে ফাঁকি দিতে দেখেছি, আমি নিজেও অনেকভাবে ফাঁকি দিয়েছি কিন্তু কাঠগোলার সেই বিবাহিত ছাত্রটি এ ব্যাপারে সম্ভবত সব রকম তুলনার বাইরে।

—পড়া করনি কেন?

—হয়নি স্যার।

—হয়নি কেন?

—কাল রাতে চোর এসেছিল স্যার।

—তাতে পড়া হয়নি কেন?

হবে কি করে স্যার? সারাদিন ধরে কতজনকে যে চোর বলে সন্দেহ করলাম। সন্দেহ করতে করতেই দিন ফুরিয়ে এই সন্ধ্যে এসে গেল। তারপর তো আপনি এসে গেলেন। তা পড়ব কখন বলুন?

অকাট্য যুক্তি। আমারও টাকা পাওয়ার দরকার। এই স্টুডেন্ট আমি টানা দু'বছর পড়ালাম। পড়িয়ে ফেরার সময় রোজ আমার মুখ ব্যথা করত—এতো কথা বলতে হোত। অনেক সময় ফেরার পথে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে চলে যেতাম।

নির্জন রাস্তা, ফুলের বাগান, বইয়ের জন্যে আস্ত একখানা বাড়ি সদ্য সদ্য খোলা ন্যাশনাল লাইব্রেরি তখন আমার ভাল লাগত। দেখলাম—লাইব্রেরিয়ান কেশবন আমারই মত হাঁটবার সময় ডান পা সামনের দিকে ঝাড়া দিয়ে হাঁটেন।

পড়ার লম্বা হলঘরটার কাচের বাক্সে বিশেষ বই বা পাণ্ডুলিপি রাখা হোত। বিশেষ করে যেদিন কোন বিদেশী অতিথি আসতেন—সেদিন সেই দেশের গুরুত্ব-পূর্ণ পাণ্ডুলিপি বা বই ওই কাচের বাক্সে থাকত। তাছাড়াও সেদিন ওইসব দামী বই কাচের বাক্সের কাছে টেবিলে খুলে রাখা হোত—যেন কেউ পড়তে পড়তে এইমাত্র জল খেতে উঠে গেছেন। বিদেশী অতিথি এই দৃশ্য দেখে পুলকিত হতেন।

আমি দু'বার ওই খোলা বইয়ের সামনে বসে পড়ে খুব বিপদে পড়ি।

প্রথমবার—ওরকম খোলা বই দেখে সামনে চেয়ার টেনে বসেছি। বইটি নেড়েচেড়ে কিছুই বুঝতে পারছি না। যেরকমভাবে খোলা ছিল—সেভাবে বইটি রেখে উঠতে যাব, এমন সময় আমার পেছনে দেখি এক বিদেশী দাঁড়িয়ে। তাঁর চোখে রীতিমত প্রশংসা ফুটে বেরোচ্ছে।

আমি চমকে উঠে দাঁড়ালাম।

বিদেশী হাত নেড়ে আমায় বসতে অনুরোধ করলেন।

আমি কি আর বসি। কেটে পড়তে পারলে বাঁচি এখন। বিদেশীর পেছনে লাইব্রেরিয়ান কেশবন। তিনিও চোখ দিয়ে আমায় বসবার জন্য অনুরোধ করলেন।

বিদেশী আর কেউ নন—ইথিওপিয়ান সম্রাট—হাইলে সেলেসি। সম্ভবত প্রাচীন আরবিতে লেখা ছিল বইটি। কিংবা অন্য কোন ভাষায়—যা কিনা ইথিওপিয়ায় চালু—বা আগে চালু ছিল। সেই ভাষার চর্চা কলকাতায় দেখে তিনি তো আমার ওপর খুশিই হবেন।

সেবারে সম্রাট ভারত সফরে এসে কলকাতা ঘুরে গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয়বার একইভাবে বিপদে পড়ি—যখন আমার পেছনে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রেসিডেন্ট টিটো। বুক পেটের ওপর অনেক ডেকরেশন।

।। এগারো ।।

এই লাইব্রেরির বারান্দাতেই মনোজ ঘোষ আমায় দেখেই চিনতে পারল—পানু না? এখানে কি করছিস? লাইব্রেরি তো তোর জায়গা নয়!

কেন? আমাদের কি লাইব্রেরিতে আসতে নেই?

হেসে ফেলল মনোজ। তা আসবি না কেন—আসবি। বাড়িটা—বইয়ের তাকগুলো ঘুরেফিরে দেখে বাড়ি চলে যাবি। তা বই আনাব কেন?

বই দেখতে বা নাড়তে আসিনি। এমনি এসে ম্যাগাজিন দেখছিলাম। তুই—তুই এখানে কি করছিস?

আছে বন্ধু আছে। এখনই বলব কেন?—যতদূর জানি তুই তো এমবি-ও পড়লি না, বি এসসি-ও পড়লি না! কি করিস এখন? রহস্য রাখ ভাই—

দেখবি? আয় তবে—

মনোজ আমায় নিয়ে একটা কিউবিকেলে তুলল। সোফার সামনে গোল টেবিলে গাদাগুচ্ছের বই। বেশির ভাগ বইয়ের মলাটে ঘোড়ার ছবি।

ভেটারিনারি ডাক্তারি পড়ছিস নাকি গোপনে?

তা একরকম বলতে পারিস। চল—বেরোবি?

আমি একবারে বেরিয়ে যাব মনোজ—চল। কিন্তু বইগুলো?

ওরা গুছিয়ে রাখবে'খন। কালই তো সকালে এসে আবার বসব।

খুলে বল তো মনোজ—কি পড়ছিস? ভেটারিনারি?

একদম মোমিনপুরের রাস্তায় পড়ে মনোজ বলল, পড়ে পড়ে দেখছি—ঘোড়ার আসল স্ট্রেংথ কোন্ পায়ে? পেছনের দুই দাবনায়? না, সামনের দুই পায়ে?

তাহলে তো ঘোড়ার অ্যানাটমি, মাস্‌ল—সব পড়তে হবে।

তা তো হচ্ছেই।

ছোটবেলার বন্ধুকে নিয়ে নির্জন রাস্তা দিয়ে হাঁটছি। যুবক হয়ে গেছি। পড়া শেষ হয়নি। চাকরি পাইনি। মনোজও নিশ্চয় তাই। সুন্দর সুন্দর বাড়ি। সেসব বাড়ির বারান্দায় আরও সুন্দর ফুলের টব—লতাপাতা। ঝকঝকে গাড়ি বেরিয়ে এসে তীরবেগে নিশ্চয়ই পুলের দিকে চলে যাচ্ছে। আর আমরা? দু'জন অনিশ্চিত মানুষ। সব সময় ভাবি—সামনে নিশ্চয় ভাল কিছু আছে। কিন্তু ভালো কিছুর সঙ্গে আর দেখা হয় না। জীবনটাই যেন খড়ি-ওঠা।

মনোজ ওদের বেহালার বাড়িতে নিয়ে গেল। মনোজের বাবা দেখলাম সামনের ঘরে একগাদা লোক নিয়ে বসে। অনেক টাইপিস্ট টাইপ করছে। তিনি ডিকটেশন দিচ্ছেন ইংরিজিতে। মাই লর্ড—

কি রে মনোজ—মেসোমশায় কি চাকরি ছেড়ে দিলেন?

ছেড়ে নয়—ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

শুনেছিলাম বড় প্রোমোশন পেয়েছেন!

বড় তো বটেই। স্বাধীনতার আগে আমাদের ছোটবেলায় বাবাকে দেখেছিস—হেড কনস্টেবল। তারপর এ এস আই হলেন। তখনো ইন্ডিয়া পরাধীন। স্বাধীনতার পর এস আই। বীরভূমে বদলি হলেন ইন্সপেকটর হয়ে। আলিপুরে এলেন অ্যাডিশনাল এস পি হয়ে। বীরভূম থেকেই হাত খুলে যায় বাবার—

আমি কিছু বুঝতে না পেরে তাকিয়ে আছি দেখে মনোজ বলল, বাবা তো প্রি-ইন্ডিপেনডেন্স ডেজ থেকেই রাইট অ্যান্ড লেফট ঘুষ খাচ্ছিল। স্বাধীনতার পর লাগাম-ছাড়া হয়ে ওঠেন। তারপর একদিন হাতেনাতে—ব্যাস, সাসপেন্ড হলেন। নে—বোস এখন—পরে কথা হবে।

ব্যাপারটা খুব সিম্পল। সাসপেন্ড হয়ে ওর বাবা নিজের কেস পুলিস কোর্টে লড়তে গিয়ে দেখলেন—পুলিসে তাঁর মত সাসপেন্ড শুয়ে শুয়ে রয়েছে।

তখন মনোজের বাবা তাঁদের আনঅফিসিয়াল উকিল হয়ে দাঁড়ালেন।

বছর না ঘুরতে দারুণ পসার। কোথায় লাগে পুলিসের এস পি-র চাকরি!

ভেতরের ঘরে বসে মনোজের বাবার ডিকটেশন দেওয়া শুনতে পাচ্ছিলাম—

দেন মাই লর্ডশিপ—দি ফলেন ওম্যান টোল্ড দি সেইড প্লেইনটিফ—তামাশা পায়েছো? ফেল কড়ি মাখো তেল!

জানতে চাইলাম—মাস গেলে কত পান মেসোমশায় ?

মনোজ বলল, তা ফেলে ছড়িয়ে বিশ হাজার টাকা তো আসেই।

মাসে বিশ হাজার ?

তা অবাক হচ্ছিস কেন ? বাবা তো তার লাইনে একজন দ'দে অফিসার। তাকে ঘাঁটিয়ে সরকারের লস। আট বছর হয়ে গেল বাবা সাসপেন্ড। ঘরে বসে মাইনের সেভেনটিফাইভ পারসেন্ট পান। তারপর পুলিস-কোর্টে ওকালতির আয়। ভগবান শেষ বয়সে বাবাকে ছপ্পড় ফুঁড়ে দিয়েছেন। তবে এই সঙ্গে বাবার অন্য সব গুণও বেড়েছে—

গুণগুলো ঘরে বসেই দেখতে পেলাম। কথায় কথায় শ'কার ব'কার করছেন স্টেনো টাইপিস্টদের। অথচ এই মানুষটিকেই ছোটবেলায় দেখেছি—পুলিশের সাধারণ চাকরি থেকে বাড়ি ফিরে বইয়ে মুখ করে পড়ে থাকতেন।

আরও দেখলাম বসার ঘরে বইয়ের তাকের পেছনে লম্বা বোতল। গ্লাসের অভাবে বাচ্চাদের খেলনা বাসনিতে ঢেলেই হলদে হুইস্কি খাচ্ছেন নিট, আর ঘুষ-খোর সাসপেন্ড দারোগার সঙ্গে তাদের কেস নিয়ে কথা বলছেন মনোজের বাবা।

মনোজের মা দেখলাম—আস্ত একটি ধ্বংসস্তূপ। আমায় অনেকদিন পরে দেখে সামান্য হাসলেন।

অবাক হলাম মনোজের এক মাসীকে দেখে। কালো সরস্বতী। আমাদেরই বয়সী। সবসময় হাসিতে, বেণীর দাপাদাপিতে জ্বলজ্বল করছে। আমাদের চা করে দিল। মনোজকে ধমকালো—পরিষ্কার বলল, পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে এ কোন ঘোড়ারোগে পড়লে !

আর অবাক হলাম—মনোজের একমাত্র বোন আশাকে দেখে। এত কাণ্ডের ভেতর ওর চোখেমুখে কোন দাগ পড়েনি। দিব্যি পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করে চলেছে।

ওদের বাড়িটা তখনকার বেহালার এক প্রান্তে। বাড়ির গায়েই বাড়িওয়ালার পানাপুকুর। ভাড়া দেবার জন্যই বানানো একটেরে তিনখানা বাড়ি। সব ক'খানাই একতলা। সাদা রঙের। তাদের সামনে খেলাধুলোর সবুজ মাঠ। প্রত্যেক বাড়িতেই একখানা করে কুয়ো। সেই কুয়োতলার গায়েই একখানা করে টিনের ঘর।

মনোজদের টিনের ঘরখানায় দেখলাম—ওর বাবার দরবার প্যারেডের টুপি, সোর্ড অবহেলায় পড়ে আছে। একখানা পড়ার টেবিল—তাতে মনোজের ডাক্তারি পড়ার কঙ্কালটার হাড়গোড়ের স্তূপ আর রেস খেলার কিছু হলুদ রংয়ের ছোট বই।

দেখে বোঝাই যায় - সারাটা বাড়ি মনোজের বাবার ওকালতিতে ওলট-পালট।

মনোজকে বললাম, ডাক্তারি পড়া ছাড়লি কেন ?

কি হবে পড়ে? দেখলি তো চারদিক—

তাই বলে তুই পড়বি না? একটা ক্যারিয়ার—

মেলা ফ্যাচফ্যাচ করিস নে!

এরপর আমি প্রায়ই মনোজের বাড়ি যেতে লাগলাম। শহরের প্রান্তে। একটি বিষাদগ্রস্ত বাড়ি—যেখানে টাকার অভাব নেই। যাই আরও এক কারণে—

আশা—আশাকে দেখতে আমার ভাল লাগে। আমি গেলে আশা এই নিরানন্দ বাড়ির বারান্দায় বসে গান গায়—

আমার পানে চেয়ে চেয়ে সুখে থাকো।

কিংবা—

আমার বুকের মাঝে
কী সুধা আছে
তা চাও কী?

রবীন্দ্রনাথের গান কিশোরী আশার গলায়। বাড়িটা থমথমে। পানাপুকুরের বুকে পুকুরপাড়ের বড় ডুমুর গাছটার কোন ছায়া পড়েনি। আমি মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আশাকে দেখি আর ভাবি—এই সংসারটাকে কি কিছুতেই ভরাডুবি থেকে তীরে তোলা যায় না? কিন্তু আমার বা কি ক্ষমতা! আমি তখন নিজেই একজন ডুবন্ত মানুষ!

তখনো জানি না—ওদের ভরাডুবিটা কতখানি।

মনোজ একদিন বলল, জানিস পানু—মাসীর অলৌকিক ক্ষমতা আছে। হাতের মুঠোয় সবসময় একখানা কালীর ছবি রাখে মাসী।

মাসীকে বললাম—দেখাও তো মাসী!

মাসী বলল, কেন দেখাবো? ওসব গোপ্ত জিনিস।

গুপ্তকে জানতাম গোপ্ত বলে অশিক্ষিত মানুষরাই। তবু ওরই ভেতর দেখি মাসীই সংসারে সব দিকে নজর রাখে। বিয়ে হয়নি। ভারী বয়স। জামাইবাবুকে সামনের ঘরে চা পাঠাচ্ছে মাসী। মনোজ আর আমাকে চা দিচ্ছে মাসী। আবার আশার চুলে তেল দিয়ে জট ছাড়িয়ে বেণী বেঁধে দিচ্ছে মাসী। স্বাস্থ্যে-শ্রীতে মাসী সব সময় জ্বলজ্বল করছে।

মনোজের একটা দশ টাকা দামের কোডাক ক্যামেরা ছিল। একদিন তাতে ফিল্ম ভরে বলল, পানু, আমাদের এই ভাঙা সাইকেলটায় উঠে তুই স্পীডে চালিয়ে এসে এই খেজুর গাছটার গায়ে লেগে অ্যাক্সিডেন্ট কর। আমি একটা অ্যাক্সিডেন্টের ছবি তুলবো।

আশা আপত্তি করল, কক্ষনো করো না পানুদা। তোমার ভীষণ ব্যথা লাগবে।

আশা বারণ করায় আমার জেদ বেড়ে গেল। তবু তো আশার সামনে একটা

অ্যাক্সিডেন্টে পেল করতে পারব !

নিখুঁতভাবে অ্যাক্সিডেণ্ট করে আমার হাত-পা ছড়ে গেল। আশা ছুটে এসে গ্যাঁদালি পাতার রস লাগিয়ে দিল কাটা জায়গায়। আমি আশার হাতের ছোঁয়া পেলাম আমার গায়ে।

মনোজ বলল, ঠিক হয়নি পানু—আরেকবার কর। একটুর জন্য শাটার ভুল টিপেছি।

আবার করলাম। আবার আশা ফার্স্ট এইড্ দিল। আবার মনোজ বলল, ঠিক হয়নি।

আশা বলল, দাদা, তুমি একটা ক্রুয়েল !

আশার টাচ পেতে আমি আবার স্পীডে সাইকেল চালিয়ে এসে খেজুর গাছের গায়ে অ্যাক্সিডেণ্ট করলাম।

মনোজ বলল, পারফেক্ট !

এবার আমার চিবুক, হাঁটু-দুইই ছড়ে গেছে। আশা আর ফার্স্ট এইড্ দিল না—রাগে পা দাপিয়ে বাড়ির ভেতর যেতে যেতে বলল, দাদাটা একটা অ্যানিম্যাল !

আমি বুঝলাম আশার আমাকে ভাল লেগেছে। আরও বুঝলাম—আশা ভারতী নয়। আমি চিনিতে পিঁপড়ের মত আশাদের বাড়িতে সেঁটে গেলাম। মাসের পর মাস। যাই আসি। ওদের বকুল গাছের নিচে ঝরাফুল সারাদিন রোদে পুড়ে সন্ধ্যের অন্ধকার বাতাসে গন্ধ ছড়ায়। মাঠটাও অন্ধকার। ঘরের ভেতর আলোতে মনোজের বাবা ডিকটেশন দিচ্ছে। আশা একা অন্ধকার সিঁড়িতে বসে। মাসী বোধহয় কুয়োতলার দিককার রান্নাঘরে ডালডায় কুচো নিমকি ভাজছে। তার জামাইবাবুকে দেবে—দেবে আমাদেরও। মনোজ রেসের মাঠ থেকে ফেরেনি।

আবার এমনও হোত—আমি সারা দুপুর সেই টিনের ঘরটায় সেদ্ধ হচ্ছি। ঘুমোনো যায় না—বসা যায় না। মনোজ আমায় বসিয়ে রেখে টাকার যোগাড়ে গেছে। কাল রেস। সন্ধ্যের মুখে ছায়া করে আকাশে তারা ফুটি-ফুটি—পানা-পুকুরের গায়ে ডুমুর গাছটায় তক্ষক ডেকে উঠল—তক্কে তক্কে—

অমনি আশা ঘুম থেকে উঠল, ওমা ! সারা দুপুর তুমি এঘরে ছিলে পানুদা ? দাদাটা কি বল তো ?

আমারও আজও সেই এক প্রশ্ন। মনোজটা আসলে কি ? আজও আমি জানি না। আমায় নিয়ে একদিন সকালে নৈহাটির কাছাকাছি হাজিনগর চলল। জুটমিল এরিয়া। বলল, আজ তোকে নিয়ে এক বৃক্ষসাধকের কাছে যাব, চল। যদি দয়া হয় তো তিনি এমন ফুলের পাপড়ি দেবেন—যা হাতে নিয়ে তুই যা চাইবি তাই পাবি।

বৃত্তসাধক ? সে আবার কি জিনিস ?

বৃত্তসাধনা না জানলে জীবনের কি জানলি পানু !

হবেও বা। লজ্জায় মুখ ফুটে কিছু বলা হল না। এতখানি বয়স হল অথচ বৃত্তসাধনা জানি না ! নিজেকে মনে মনে প্রশ্ন করে বোবা মেরে থাকলাম।

দুপুর-দুপুর হাজিপুরের কাছাকাছি এক হাফ-শ্মশানে এসে হাজির হলাম দু'জনে। হাফ-শ্মশান এজন্য বলছি যে—সেখানে কোন চালা নেই শ্মশান-যাত্রীদের জন্যে। আছে শুধু একটা ডোবা আর কিছু ভাঙা কলসী। একধারে পোড়াবার কাঠের ডাঁই। বিনা ওজনেই নাকি কিনতে হয়। চিতার কয়েকটা পোড়া গর্ত আর পেল্লাই এক শিরীষ গাছ।

সেই গাছতলায় মাঝবয়সী এক গাঁট্টাগোট্টা খালি-গা বাবার সঙ্গে দেখা হল। সে প্রথমেই বলল, তোরা এসেছিস ?

মনোজ বলল, কয়েকবার ঘুরে গেছি বাবা, আপনার দেখা পাইনি।

আমি তো নদীর চড়ায়—ওই কুঁড়েতে থাকি। বলে লোকটা অনেক নিচে গঙ্গার বুকে চর জায়গায় আঙুল দেখাল।

সেদিকে তাকিয়ে দেখি—দেশলাই খোলের চেহারা এক নড়বড়ে কুঁড়ে। তার চারদিকে সবুজ কী ফসল আছে—এত উঁচু থেকে বোঝার উপায় নেই।

বাবা বলল, বর্ষায় ডুবে গেলে ওপরে উঠে আসি। জল নামলে ফিরে যাই আবার।

নিচে তাকিয়ে দেখি—অনেক নিচুতে—অন্তত বিশতলা একটা বাড়ি উল্টে বসালে যতটা নিচু হবে ততটাই নিচুতে একটা কুকুর চর থেকে ভাসতে ভাসতে তীরের দিকে সাঁতরে আসছে।

কিঙ্কর ! কিঙ্কর !

গম্ভীর গলায় ডাকল বাবা।

মুহূর্তের ভেতর দেখি—ভিজে কুকুরটা আমাদের পায়ের সামনে ঝটপটাচ্ছে। আমি তো শিউরে উঠেছি। ওদিকে মনোজের মুখে দেখি—রিয়েল গুরু-প্রাপ্তির মৌজি হাসি।

বাবা বলল, ওই চিতেটা খুলে দ্যাখ তো কী পাস ?

কোদাল নেই। খোন্তা নেই। কাঁচা মত চিতা। দাঁড়িয়ে আছি। খুঁড়ব কি দিয়ে। মনোজ কিন্তু দু'খানা হাতকে খোন্তা বানিয়ে চিতার মুখটা খুবলে তুলে ফেলল।

তাকিয়ে দেখি আধপোড়া কয়েকমাসের শিশু-মড়া। সবটা না পুড়তেই মাটি চাপা দিয়ে চলে গেছে।

বাবা উবু হয়ে বসে চিতার বুক থেকে বাচ্চাটা তুলে শূন্যে ছুঁড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মুখে মুখে কিছু মন্ত্র —

ওঁ চামুণ্ডে, কালীয়ে, স্তম্ভয়, স্তম্ভয় ।
ওঁ ঐং ক্লীং হ্রীং ক্লীং ক্লীং কুরু স্বাহা ।

সব মনে নেই। হঠাৎ দেখি বাবার হাতে আধপোড়া বাচ্চাটা হেঁচকি তুলে কেঁদে উঠল। বেঁচে আছে ভেবে ধরতে গেছি, হাত দিতে গিয়ে দেখি—বাবার মুঠোর ভেতর বিরাট এক গেরোবাজ পায়রা কুতকুত করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি ধরব কি! ঢলে পড়ে যেতাম—যদি না তখনই মনোজ বলত, বাবা আমার বড় বাসনা—আপনি নিজে আমায় একটা সুগন্ধী গোলাপ দেন—

একগাল হেসে বাবা বলল, কি করবি? গোলাপ কেন?

শুধু একবার প্রেসিডেন্ট'স কাপে খেলব। জীবনে একটিবার—

ঘোড়দৌড়? চল আমার কুটীরে চল। এই কিংকর—

গঙ্গার ভাঙা গা ধরে আমরা তিনজন সাবধানে পা ফেলে চড়া নজর রেখে নামছি। বাবা বলল, বিদিশী ঘোড়া—আমার এই সুগন্ধী গোলাপের পাপড়ি কি খেতে চাইবে?

মনোজের তখন মরীয়া দশা। প্রেসিডেন্ট'স গোল্ড কাপ, জ্যাকপট—সব একসঙ্গে তার চোখের সামনে নাচছে!

সে যে করেই হোক, ঘোড়াকে খাইয়ে দেব আমি।

কি করে খাওয়াবি?

সে বাবা আমি আগের রাতে আস্তাবলে ঢুকে খাইয়ে দেব ঘোড়াকে—

পারবি তো? দেখিস—

খুব পারব বাবা। আপনি দিন একটা সুগন্ধী গোলাপ।

তবে র এখানে। এই তীরে বসে থাক। আমি আমার কুঁড়ে থেকে ঘুরে আসি। আজ বিকেল-বিকেল একটা বয়স্থা মড়া ভেসে আসবে—কুমারী—

ফট করে বলে বসলাম—আপনি জানলেন কি করে?

বাঃ, কাল সন্ধ্যেবেলা মুর্শিদাবাদের ভবানী গাঁয়ে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হল মেয়েটা। তা আমি জানতে পারব না! আমি এই ঘুরে আসছি—জলের ধারে বসে থাক দুজনায়—

গঙ্গা জুড়ে জল। সোলার মালা ভেসে আসছে। কলসী। কলা বউ। মরা গাই। জলের গা ধরে বাবার কিংকর ছপছপ করে কাঁচা মাছ ধরে খপ করে খেয়ে নিচ্ছে। লেজটা পাঁককাদায় শুকিয়ে খন্ড-ত (ৎ) একদম।

সন্ধ্যে-সন্ধ্যে সত্যি ভেসে এল। জলে ভাসতে ভাসতে একদম তরতাজা। ডুরেশাড়ি পেঁচানো। বাবা আর মনোজ টানাটানি করে ডাঙায় তুলল। ভাটায় জল নামায় ওরা দু'জন দিব্যি ছপছপ করে চড়ায় গিয়ে উঠল। উঠেই বাবার হুকুম—হাজিনগর কাছারি বটতলায় যা। দু'পাইট দিশি আনবি—

অচেনা জায়গা। বটতলার বাজারে গিয়ে দেখি অনেক দোকানের সাইনবোর্ডে লেখা হাজিনগর। আবার কোথাও কোথাও লেখা—হাজিপুর। পাঁইট-দুটো নিয়ে যখন ফিরলাম তখন গঙ্গার আকাশে চাঁদ। গঙ্গার ভাঙা গা ধরে কিঙ্কর আমায় পথ দেখিয়ে চড়ার ওপর কুঁড়েয় নিয়ে এল। চান্দিকে কলাইশাক গজিয়ে উঠে ঝিনঝিন করে সব সময় বাড়ছে। সন্ধ্যেরাতের ঠাণ্ডায় ঝিনঝিনে পাতাগুলো ভিজেমতন।

কুঁড়েয় ঢুকে দেখি—বাবা আসনে বসে। কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ে হবে—পঞ্চমুণ্ডিতে ঠিকমত বসেনি। বাবার মন্ত্রোচ্চারণের দোলানিতে পিঁড়িখানা খটাখট শব্দ করে দুলছে। পিঁড়িতে বাবা। তার সামনে সেই আত্মঘাতী কুমারীর একদম উদোম মড়া। বাবার হাতে সাদা হাড়ের কোশা মত লম্বা একটা পাত্র। চেহারায় অনেকটা তামার কুশী। যা থেকে আচমন-আহ্নিক হয়।

মড়ার ওপারে মনোজ বসে। নি-বাত। নিষ্কম্প। তারই ডানদিকে হেরিকেনের ওসকানো শিখা চিমনির কাঁচ ফাটায়-ফাটায়। কুঁড়ের বাইরে অবিরাম জল ভাঙার শব্দ। সেখানে অন্ধকারে গঙ্গা।

এনেছিস? নে—দে এখানে—

বুঝতে না পেরে তাকিয়ে আছি।

ঢেলে দে বললাম!

ছিপির প্যাক খুলে ঢেলে দিলাম। হাড়ের কোশাখানা উঁচু করে সবটাই বাবা গলায় ঢালল। দিশি গড়িয়ে তার গলায় গেল। আর সেই সঙ্গে অদ্ভুত এক শব্দ। খলখল। খলখল। যেন বান ডেকেই আস্ত একটা নদী তার সব জল নিয়ে খাত পাল্টাচ্ছে।

আবারও ঢালল বাবা। আবারও সেই শব্দ। খলখল। খলখল -

আমি তাকিয়ে আছি। বাবা আমার মুখে তাকিয়ে বলল, বুঝলি কিছু?

আমি তখনও তাকিয়ে।

বাবা হা-হা করে হেসে উঠল। এ কোশা কোন দশাসই পুরুষের শিরদাঁড়ায় তৈরি। কারণ পড়লেই খলখল করে ওঠে। আপনাআপনি। কোন বনচাঁড়ালের মেরুদণ্ড হবে—যার বুকের ছাতি ধর একখানা দরজা—

বাবা নিজের গলায় ঢেলে মড়ার হাঁ-মুখে ফুঁ দিল কষে। মুখ খুলে যেতেই তাতেও কারণ শোধন হল। এরপরেই বাবা অনামূর্তি। হাতের মুঠো থেকে খই ছুঁড়ে মারল। কুঁড়ে ঘরের বাইরে সেই খই ঢিল হয়ে পড়ল। সেই সঙ্গে অনেক হ্রীং ক্লীং—

মড়ার বুকের পাশেই হোমকুণ্ডে বেলকাঠের সমিধ পড়ে ধিকি-ধিকি আগুন একসময় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। আর সেইসঙ্গে মড়াও উঠে বসল। কী সুন্দর হাসি। দাঁতের সামান্য বেরিয়ে। তা যেন হীরে বসানো। কিন্তু চোখে চাইতেই

আমি ঢলে পড়লাম—

পরদিন ঘুম ভাঙল। তখন গঙ্গার জলে রোদ পড়ে চিক-চিক করছে। ঘর-ভর্তি ছাই। কোথায় মড়া? কোথায় বাবা? কেউ নেই। বাইরে বেরিয়ে দেখি মনোজ বসে আছে জলের ধারে। আর কিংকর ছপ ছপ করে মাছ ধরে খাচ্ছে। তখন জোয়ার আসে আসে।

দু'জনে আমরা সাঁতরে পাড়ে উঠলাম। উঠে মনোজ বুকপকেট থেকে সেলোফোনে মোড়া একটা গোলাপ বের করে দেখাল। দেখিয়ে বলল, অমন ঢলে পড়লি কেন?

পড়ব না? অত সুন্দর মুখে কোন চোখ নেই! চোখের জায়গায় অন্ধকার গর্ত!

বৃত্তসাধনায় তো অমন হবেই। ভোররাতে আমিও ঢলে পড়ি। চোখ চাইতে দেখি আলো ফুটি-ফুটি। ঘরে কেউ নেই। তুই আর আমি শুধু। তখন ছাইয়ের ভেতর থেকে গোলাপ তুলে নিলাম আলতো করে।

এই গোলাপটা কিন্তু আমাদের শান্তি দিল না।

সেদিনই কলকাতা পৌঁছে বেলাবেলি মনোজ আমায় নিয়ে হেস্টিংসে এল। বর্ধমানের রাজার নিজের স্টেবল। বাইরে থেকে তেমন ঘোড়া এলে এখানেই ওঠে।

উঁচু দেওয়ালে ঘেরা বিরাট জায়গা। ভেতরে যে কী এলাহি কাণ্ড—বাইরে থেকে তা ধরার কোন উপায় নেই।

মনোজের মুখে দুর্গানামের মত ডার্ক প্রিন্স ডার্ক প্রিন্স ঘনঘন শুনতে পাচ্ছি। হোটেল সেসিল পাড়ায় জকিদের আড্ডা থেকে পাওয়া খবর মত—ডার্ক প্রিন্স উঠেছে বর্ধমানের রাজার স্টেবলে।

বৃত্তসাধক বাবার কথাটা মনে পড়ল! বললাম—ডার্ক প্রিন্স কি গোলাপের পাপড়ি খেতে রাজি হবে মনোজ?

কোন ঘোড়াই কি গোলাপ খায় রে বোকা!

ভগলু দিয়ে খাওয়াতে হবে। ভগলু?

ভগলু জানিস না? বোকা বানিয়ে খাওয়াতে হবে।

ভোর-ভোর গোলাপ হাতে তো দুজনে ঢুকে পড়লাম স্টেবলে। ভেতরটা যে এমন সুন্দর ভাবতেও পারিনি।

সারি সারি ঘোড়া দাঁড়িয়ে। তা তিরিশ-চল্লিশটা হবে। ঘোড়ার বাঁয়ে আয়না। ডাইনে আয়না। পেছনে আয়না। সামনে আয়না।

মনোজ ফিস ফিস করে বলল, সব আসল বার্মিংহাম গ্লাস—বুঝলি?

এত আয়না! ঘোড়া কি মুখ দেখে সারাদিন?

পরে বুঝিয়ে বলব পানু। এখনকার মত শুনে রাখ—সবটাই সেক্সের জন্যে

—ওই তো ডার্ক প্রিন্স—

তাকিয়ে দেখি—আর পাঁচটা ঘোড়ার মতই আরেকটা ঘোড়া। স্টেবলের সব ঘোড়ার মতই এরও সারা গা চকচকে। আলো পড়ে ঠিকরে যাচ্ছে! মুখে দামী চামড়ার লাগাম।

ঘোড়ারা পা ঠুকছে মাঝে মাঝে। আয়নায় আয়নায় তাদের দাবনার ছবি। সারাটা স্টেবল যেন মাইকেল অ্যাঞ্জেলোর ড্রইংখাতা। কোনটা মাদী কোনটা মদ্দা—তা চিনতে শিখিনি। বীরত্ব, পেশী—টান-টান রূপের জগৎ যেন।

তার ভেতর খুব সাবধানে গোলাপের দুটো পাপড়ি ছিঁড়ে নিল মনোজ। বাকি ফুলটা সেলোফেনে মুড়ে বুকপকেটে রাখল। তারপর খুব মোলায়েম গলায় ঘোড়াটার দিকে এগোতে এগোতে বলতে লাগল—ডার্ক—ডার্ক বাচ্চু! চু চু—এটা খেয়ে নাও—ইন্ডিয়ান রোজ—

নির্জন স্টেবলে কাজটা বেশ এগিয়ে যাচ্ছিল। আমরা দুজনে কাজের লোকের মতই সদর দিয়ে ঢুকে পড়েছি।

ডার্ক প্রিন্সও মাথা নামিয়ে আনল। মনোজের হাতের দুটি পাপড়ি কি ডার্কের পক্ষে দেখতে পাওয়া সম্ভব? সঙ্গে সঙ্গে এও মনে হল—আদপেই এ যদি ডার্ক প্রিন্স না হয়।

তক্ষুনি মনোজকে চাপা গলায় বললাম, এ অন্য কোন ঘোড়া নয় তো?

চুপ কর! এর ঠিকুজী-কুলুজী আমার মুখস্থ। আও—আও ডার্ক বাচ্চু—বলতে বলতে মনোজ যেই পাপড়ি দুটি ডার্ক প্রিন্সের ঠোঁটে চেপে ধরতে যাবে—যাতে কিনা ডার্ক জিভ বের করে খেয়ে নেয়—অমনি স্টেবলের শান্তি খান খান করে একখানা গোঁফওয়ালা মুখ চারদিককার সব বার্মিংহাম গ্লাসেই ভেসে উঠল।

মনোজ চাপা গলায় বলল, তাহলে দূর থেকে নজর রেখেছে—দৌড়ো—

ধাক্কা দিয়ে বালতি উল্টে কয়েক সেকেন্ডের ভেতর আমরা দেওয়ালের বাইরে।

মনোজ বলল, খাওয়াতে না পারি—এই পাপড়ি হাতে সংকল্প নিলে প্রথম দুটো রেসে নির্ঘাৎ উইন। দূর থেকে কেমন পাহারা দেয় দেখলি পানু! আসলে দামী অ্যানিমাল তো! কেউ যদি খারাপ কিছু খাইয়ে দেয়? তবে তো বিলকুল বরবাদ!

এই স্টেবলেই আমাকে পরে একা আসতে হয়েছিল। যেন নিয়তি। সেকথা অন্যসময়।

আমার আর মনোজের সঙ্গে ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাওয়া হয়নি। কিন্তু আমি বেহালায় ওদের বাড়ি যাই। সেই হতশ্রী বাড়ি। বসার ঘরে বসে সস্তার আমলে বাড়ির কর্তা হুইস্কি খেতে খেতে মাসে তিশ হাজার টাকা আয় করছেন ঘুষখোর

বরখাস্ত দারোগাদের লিগাল অ্যাডভাইস দিয়ে। নিজেও সাসপেন্ড। তবে মাসে মাইনের পঁচাত্তর ভাগ টাকা ঘরে বসে পেয়ে যাচ্ছেন মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া অব্দি। পাশের ঘরে তাঁর জবুথবু স্ত্রী—চনমনে শালী—সদ্য কলেজে ঢোকা মেয়ে আর রেসুড়ে ছেলে।

আমি টিনের ঘরটায় গিয়ে বসে থাকি। তক্ষক তার সময়মত ডাকে। অন্ধকার নেমে আসে তার নিজের সময়ে। সারা বাড়িতে কোন কোন দিন আমার কেউ খোঁজ নেয় না। আমি মনোজের পড়ার টেবিলটায় তাকিয়ে থাকি। গাদা-গুচ্ছের রেসের বই। আর একটা কঙ্কালের কিছু হাড়গোড়। এই তো মানুষের পরিণতি! এর জন্যে এত?

এইসব ভাবতে ভাবতেই এক বিকেলে কুয়োতলার টিনের ঘর থেকে বেরিয়ে ভেতরবাড়ি ঢুকেছি। যদি মনোজ ফিরে থাকে—যদি আশা ফিরে থাকে কলেজ থেকে! মেসোমশাই খানিক আগে নতুন গাড়িতে মাসীমাকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে।

কুয়োতলার মুখোমুখি ঘরখানা ফাঁকা। কেউ নেই নাকি বাড়িতে। পরের ঘরের দরজা ভেজানো। সামান্য ঠেলে ফাঁক করেই পিছিয়ে এলাম।

এ কি দেখলাম! আমার মাথার ভেতর কামারশালার আগুনের শিখা এইমাত্র ছোবল দিয়েছে। নিজের ঘিলু পোড়ার গন্ধ নিজে পাচ্ছি।

ছুটে কুয়োতলার টিনের ঘরে ভাঙা চেয়ারটায় এসে বসলাম।

একটু পরেই মনোজ এসে ঘরে ঢুকল, কোন জানান না দিয়ে ভেজানো দরজা ঠেলতে গেলি কেন? এত কৌতূহল ভালো নয় পানু!

আমার মুখে একথায় কালি মেড়ে গেল, আমার কোন কৌতূহল নেই মনোজ। ভেবেছিলাম—কেউ বাড়ি নেই নাকি?

তাই বলে ভেজানো দরজা ঠেলে দেখতে হবে?

আমি তো কিছুই জানতাম না মনোজ।

এমন কিছু জানার জিনিস নয় পানু। মাসী সিদ্ধকামিনী—

কি বললি?

মাসীর হাতে সবসময় কালীর ছোট ফটো থাকে। কোন স্কুলকলেজে পড়েনি কোনদিন। আমার দাদামশায়ের দ্বিতীয়পক্ষের শেষ সন্তান। জানিস বোধহয়, মায়ের বাবা বড় কালীসাধক ছিলেন! নানা রকম ক্ষমতা ছিল তাঁর—

এসব জানব কি করে মনোজ?

তবে শোন্। মাসী তার বাবার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছে। বুড়ো মরার আগে কিছু বিদ্যে নিজের ছোটমেয়েকে দিয়ে যায়। তার কিছু শিখে নিচ্ছিলাম মাসীর কাছ থেকে।

তাই বলে—

হ্যাঁ পানু, মাসী ওই রকমই চায়। যে গুরুর যেমন দক্ষিণা। বিকেলের দিকে সন্ধ্যের মুখে মাসীর গায়ে কম্প দিয়ে জ্বর আসে। তখন তাকে জাপটে জড়িয়ে ধরেও রাখা যায় না এক-একদিন।

তাই জড়িয়ে শুয়েছিলি ?

মাসী কাজে বসেছিল ওই ভাবে—ক্রিয়া করছিল।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি মনোজের মুখে। আর কথা এগোলো না। বাইরে নতুন মোটরগাড়ির ঘুরে ফিরে আসার শব্দ। ভেতরবাড়ি থেকে মাসীর গলা। কাঁচা কয়লার আঁচ দিল উনুনে। পাকা পুরুন্ত গলায় মাসী বলে যাচ্ছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে—কেরোসিনের বোতলটা কোনদিন হাতের কাছে পাওয়া যাবে না।

এই সময়টায় মাসী রোজ বিকেলের চা করে। চা করে চায়ের কাপ টল-টলাতে টলটলাতে নিয়ে এসে এগিয়ে দেয়। তখন আমার দিকে তাকিয়েও ঠোঁটে হাসি—চোখে সুরমার ফাইন টান।

অনেক দূরে মধ্যবয়সে শীতের নিশুতি রাতে অজয়ের মেলায় আখড়ায় আখড়ায় ঘুরেছি। শীতার্ত অজয় ক্ষীণ বুকে কুয়াশা-মাখা জল নিয়ে শুয়ে আছে। এক এক আখড়ায় এক এক মোহান্ত। কোন কোন মোহান্ত শীতের নিশুতি রাতের আকাশের নিচেই পালঙ্ক পেতে মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়েছেন। যেন পৃথিবীখানাই তাঁর ঘর। পালঙ্কের নিচেই মোহান্তর জল সরার ডাবর-পিকদানী।

আবার কোন কোন টেম্পোরারি চালার ভেতরেও মোহান্তমশাই ডেরা ফেলেছেন। শিষ্য-প্রশিষ্যরা বড় জোর ভোগ চাপিয়েছে—দেখা করার জন্য কড়া নেড়েছি বড় দরজায়।

দরজা অল্প ফাঁক করে গলা বের করেছে বড়মোহিনী—এখন তো দেখা হবে না বাবু!

কেন ?

মোহান্তমশায় যে ক্রিয়ায় বসেছেন।

আশপাশের সাড়ে ছ'আনার দোকানীদের কানে সেকথা যেতেই তারা তো চাপা হাসিতে উথলে ওঠার যোগাড়।

তখনো জানি না—মাসী কতখানি সিদ্ধ—কতখানি কামিনী। তবে এইটুকু জানি—মাসী অন্ধকারেও ঝলকায়। হাতে তার ছোট একখানা টিনের ফটো। তাতে জিভ বের করা কালী।

মাসীর ক্রিয়ায় বসাটা খোলসা হয়েছিল আমার কাছে আরও পরে। তখন মনোজ আরও ছন্নছাড়া। আরও ছিবড়ে। তখনই জানলাম—মানুষ মানুষকে খায়। খেয়ে শাঁস মজ্জা শুষে নিয়ে মাড়াই-আখ করে ফেলে দেয়। তখন সে

স্রেফ জ্বালানি।

এইসব দেখে দেখেই কি আমি জীবনের আগ্রহ হারিয়ে ফেলছি? আর তো তেমন স্বাদ পাই না! কোথায় যেন বিস্মিত হবার ক্যামেরাটা হারিয়ে ফেলে বসে আছি! কোন এক যাত্রা-পালায় হিরোইনের গান শুনেছিলাম --

আমার কানের পাশা হারিয়ে গেল ওই ডোবায়—

সুরঃ কালেংড়া আড়ঠেকা। সঙ্গে ক্ল্যারিওনেট।

বড় ইচ্ছে—জীবনের মাঝখানটায় ক্ল্যারিওনেট বাজিয়ে বুকটা চিরে ফেলি নিজের।

॥ বারো ॥

বড়দা এত সুন্দর ছিল—আর বাবা তার ঘাড়ে এতই বোঝা চাপিয়েছিল—গলায় সুন্দর রবীন্দ্রসঙ্গীত—রীতিমত সুশ্রী আমাদের বড়দা তার জীবনের কেন্দ্র-বিন্দু হারিয়ে ফেলেছিল। তাস, রেস, আকাট ভোঁতা সব বন্ধুর ভেতর বড়দা হারিয়ে যাচ্ছিল। বিশেষ করে আমি যে জীবনে দাঁড়িয়ে উঠতে পারছি না—তার পাশে দাঁড়াতে পারছি না—এটাই বড়দাকে ভীষণ কষ্ট দিচ্ছিল। দিনকে-দিন রোগা হয়ে যাচ্ছি—চাকরির যে-পরীক্ষাই দিই—তাতেই ফেল।

শেষে একটা পরীক্ষা লেগে গেল। আমি কাস্টমসে এক পরীক্ষায় পাশ করলাম। বড়দা খুব খুশী। কিন্তু সেবারে এতই পাশ করলো যে অত ভেকান্সিই নেই। তাই ঝেঁটিয়ে বাদ দেবার জন্যে ফিজিকাল টেস্ট ডাকলো গড়ের মাঠে। দৌড়, লংজাম্প আর হাইজাম্প। তাতে যত বাতিল করা যায়।

বড়দা দৌড়বার শর্টস্ কিনে দিল। দু'দিন ভোরে উঠে মাঠে গিয়ে দৌড়োলাম! ভীষণ গায়ে ব্যথা। বড়দা বলল, ব্যথার ওপর দৌড়ো। নয়তো ব্যথা মরবে না। তাই করলাম।

এই সময় কলকাতায় খুব ফ্লু দেখা দিল। যাতে ফ্লু জ্বরে শুয়ে না পড়ি—সেজন্যে বড়দার সাবধানতার অন্ত নেই। আগাম এ পি সি ট্যাবলেট এনে দিয়ে বললেন, খেয়ে রাখ—তাহলে তোর জ্বর হবে না। সাবধানের মার নেই।

খাবার দু'ঘণ্টার ভেতর খুব জ্বর এসে গেল। হাতে মোটে আর তিনদিন। ঘন ঘন ডাক্তার, ওষুধ। জ্বর ছাড়লো। ভীষণ দুর্বল। সেই শরীর নিয়ে গড়েরমাঠে গেলাম ভোর-ভোর। কাস্টমসে তখন অনেক অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাজ করতো। তারাই পরীক্ষা নেবে—দৌড়, লংজাম্প, হাইজাম্পের। গাদাগুচ্ছের বেকারের স্পোর্টস দেখানোর জন্যে কাস্টমসের অনেক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান তাদের বউ-মেয়েদেরও মাঠে নিয়ে এসেছে। সে এক বিশাল তামাশা।

ভোরের বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে শর্টস্ পরে আমরা বেকারেরা দৌড়োচ্ছি। তিন হাজার মিটার ট্রাক রেস। ঘাসে চুনের দাগ। আমার সামনে কলেজের ঢ্যাঙামত সরোজদা। গায়ে মাংস নেই। অনেকদিন কোন চাকরি পাননি। যেন বা ম্যালেরিয়ার রুগী কোন সিকড়ে নিগ্রো। তোবড়ানো গাল। হাঁটছেন আর বলছেন—আগেই দৌড়ে দৌড়ে দম ফুরিয়ে ফেলো না। তিন পাক তো দিতে হবে। শেষের পাকে আমি আর তুমি সবাইকে ছাড়িয়ে যাবো।

আসলে জ্বর থেকে উঠে আমি দৌড়তে পারছিলাম না। আমি আর সরোজদা সারা মাঠে সবার পেছনে। দৌড়োচ্ছি না। আসলে হাঁটছি। তাই সবার চেয়ে এক পাক পেছনে। দৌড়তে হবে মোট তিন পাক।

যারা দৌড়োবার মত দৌড়চ্ছে—তাদের নিয়ে পাবলিক আদৌ মাথা ঘামাচ্ছে না। সারা মাঠ ঘিরে দাঁড়িয়ে সবাই আমাদের দু'জনকে নিয়ে মজে গেল। কেননা ঢ্যাঙা সরোজদার পাশে আমি লগবগ্ করতে করতে হাঁটছি – জ্বরের পর মাথা ঘুরছে। লরেল আর হার্ডি। সবার চেয়ে একপাক পিছিয়ে। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান চাকুরেদের হাতে স্টপওয়াচ। মুখে হুইসেল। তাদের মেয়ে-বউয়েরা তামাশা দেখার মত আমাদের দেখে হাসতে হাসতে হাততালি দিচ্ছে।

আমি ওসব দেখছি না। আমি দেখছি—বড়দা কোথায়? বড়দার মাথাটা দেখা যায় কিনা? টোটো বড়দার সঙ্গে থাকবে? টোটোকেও তো দেখতে পাচ্ছি না!

সবাই দৌড়ে দৌড়ে যখন শেষ পাক শেষ করলো—তখন আমি আর সরোজদা দ্বিতীয় পাক দৌড়চ্ছি। সরোজদার কথামত আমার দম ফুরোয়নি। কারণ আমরা তো দৌড়োইনি। হাঁটছি। মাথা ঘুরছে। ভোরের বাতাসের ভেতর আস্তে আস্তে গরম এগিয়ে আসছে। সারা মাঠ আমাদের দু'জনকে দেখে হাসির গররায় ভেঙে পড়ছে।

আমি শেষ পাক আর শেষ করতে পারলাম না, লজ্জায় অপমানে ট্রাকের পাশে ভেঙে পড়া দর্শকদের ভিড়ে ঢুকে পড়লাম। তখনই আমি অপমানকে স্পষ্ট দেখতে পাই। ঠিক যেমন গনগনে আগুনে গরম মাঠের ভেতর একা দাঁড়ানো গাইগরুকে দেখা যায়।

আমার চেয়েও বেশি আশাভঙ্গ হয়েছিল সেদিন বড়দার। বড়দা ভেবেছিল—যাক, একটা ভাই তাহলে চাকরি পেয়ে পাশে এসে দাঁড়াবে!

দৌড়ের পর ছিল লংজাম্প। কোপানো মাটিতে পড়তে পারিনি—লাফ দিয়ে শুকনো মাটিতে গিয়ে পড়লাম। বড়দা বলল, আর দরকার নেই। বাড়ি চল।

বাড়ি ফিরে খুব জ্বর। বেশ কিছুদিন ভুগে বারান্দায় বসে আছি। বারান্দার বাইরে বছরের প্রথম বর্ষা। বড়দা বলল, বর্ষা থামলে রোদ উঠুক,

তোকে নিয়ে এক জায়গায় যাবো।

কোথায় ?

বড়দা সেকথার কোন জবাব দিল না। বলল, তুই বেশ সুন্দর রোগা হয়েছিস।

বলতে বলতে বড়দা আমায় চোখ দিয়ে জরিপ করে নিচ্ছিল! রোগা হবার আবার সুন্দর কি! অথচ বড়দা যেন আমায় রীতিমত রোগা দেখে খুবই খুশী।

রোদ উঠলো পরদিন। বড়দা আমায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। সাদা ট্রাউজার—ভেতরে সাদা শার্ট গুঁজে পরেছি। পায়ে কালো সু। পথে এক জায়গায় বড়দা আমার ওজন নিল—সিনেমা হলের টিকিটঘরের সামনে।

ওজন উঠলো – একশো আট পাউণ্ড।

বড়দা বলল, বাঃ, চমৎকার!

আমি এত রোগা হয়ে গেছি যে হাঁটলে পা কাঁপে। সেই আমার শুকিয়ে যাওয়াকে বড়দা এত প্রশংসা করছে কেন? কেন বা তারিফ করছে? ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। ট্যাক্সি পিজি হাসপাতালের দিক থেকে হেস্টিংসের রাস্তা ধরলো। এ পথে মনোজের সঙ্গে এসেছি। ও রেসের ঘোড়াকে মন্ত্রসিদ্ধ গোলাপের পাপড়ি খাইয়ে বশ করতে চেয়েছিল।

ট্যাক্সি গিয়ে থামলো রেসের মাঠ ছাড়িয়ে গঙ্গার গায়ে এক বাগানে। তখনো হেস্টিংসে এত ঘরবাড়ি হয়নি। এত অফিস-কাছারি, নাবিক-গৃহ হয়নি। কয়েকটা পুরনো দিনের বাগানবাড়ি। নির্জন। গঙ্গার বাতাস উঠে সেসব গাছের মাথা দোলায় সারাদিন। তারই অবিরাম শব্দ।

বড়দা সেরকমই একটা বাগানবাড়িতে আমায় নিয়ে ঢুকলো। ঢুকতে ঢুকতে যাকে বলে সগর্বে—সেরকম মুখ করে বলল, এটা বর্ধমানের রাজার নিজের স্টেবল্।

তখনো বুঝিনি। বড়দা আমায় নিয়ে ঢুকতে ঢুকতে বলল, ফ্যামিলিতে যদি একজনও জকি থাকে তো মার দিয়া কেল্লা!

শুনে আমি তো চমকে উঠলাম। শেষে জকি! ঘোড়ায় কখনো উঠিনি। স্কুলে থাকতে নদীর পাড়ে ধোপার গাধা চড়ে বেড়াতো—তার পিঠে উঠতে গিয়ে পড়ে গেছি।

আগে বড়দার খুব শখ ছিল—তার একটা ভাই যদি কলকাতা পুলিশের সার্জেন্ট হয়! লাল মোটরসাইকেল দাবড়ে বেড়াবে। রেস খেলে খেলে বড়দার এখন ঘোড়ার মুখের আসল খবর চাই—তার মানে জকির মুখের।

বাগানটার একদিকে দেখি সুন্দর ঘাসে-ঢাকা মাঠে বিশাল তিনটে ঘোড়া দাঁড়িয়ে। হাফশার্ট ট্রাউজার পরা ছিপছিপে এক অ্যাংলোমত একজনকে বড়দা বলল, রবার্টস, হিয়ার ইজ মাই ব্রাদার।

রবার্টস্‌ তো আমাকে একবার দেখেই একটা ঘোড়ার পিঠ চাপড়াতে লাগলো।

সেই ঘোড়াটাকে দেখে বড়দা বলল, হ্যাপি প্রিন্স।

হ্যাপি প্রিন্স নামে একটা গল্প পড়েছিলাম। ভুলতে পারিনি। বড়দা নিজেই বলল, এবার গভরনরস্‌ কাপে দৌড়োবে। ওর ঠাকুরমা বরদার গাইকোয়াড়ের খুব পেট ছিল। তিন বছরে ষোলোটা কাপ জিতেছিল।

রবার্টস্‌ আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ট্রাই—

বলে কি? এই এত উঁচু ঘোড়ার পিঠে আমি উঠবো কি করে? ঘামে সারা দাবনা পেছল হয়ে আছে। মই থাকলে চেষ্টা করে দেখা যেত একবার!

সেকথা বলতে বড়দা বলল, মই কি রে? জকিরা তো রেকাবে পা দিয়ে পলকে উঠে পড়ে পিঠে!

এত উঁচু? আমি পারবো না বড়দা।

ট্রাই—ট্রাই করে দ্যাখ্‌। জকি হতে পারলে রেস-পিছু মোটা টাকা। ভাল খাবিদাবি। দু'একটা খবর পাচার করে দিলে তো কথাই নেই—

বাগানের গাছগুলোর পেছন থেকে খালিগা দুই খিদমদগার বেরিয়ে এসে বলল, কোই ডর নেহি! কোশিস কিজিয়ে—

কোশিস করব কি! হ্যাপি প্রিন্সের এক চাট খেলে আমি সাত হাত দূরে গিয়ে পড়বো! নাকের ফুটোগুলো একটা কাঁচা টাকার চেয়েও বড়। বাতাসে তার ঘাম আর গোবরের গন্ধ।

শেষে দুই খিদমদগার মিলে আমায় ঠেলে হ্যাপি প্রিন্সের পিঠে তুললো। হ্যাপি অমনি তবলার লহরার মত করে নিজের পিঠটা খুব তিরতির করে কাঁপালো। আর আমি অমনি হ্যাপির পিঠ থেকে ওপাশে খসে পড়লাম। একদম মাটিতে। দড়াম করে। হ্যাপি দয়া করে কোন লাথিটাথি কষালো না। হাঁটু ছড়ে গেছে—উঠতে পারছি না।

বড়দা আমার হাত ধরে টেনে তুলতে তুলতে বলল, ট্রাই এগেইন—ভয় কি! আমি আছি—রবার্টস্‌ আছে!

রবার্টস্‌ বলল, নো, হি ইজ ফ্রাইটেনড্‌!

উঠে দাঁড়িয়ে দেখি হ্যাপি প্রিন্স বড় বড় নিঃশ্বাসে বুকের ভেতর গঙ্গার হাওয়া টানছে। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আমার মাথা হ্যাপির গর্দানের কাছে। শেষে একটা ঘোড়ার কাছে হেরে গেলাম!

বড়দা চোখ কটমট করে বলল, হোপলেস! কোন কম্মের নয়!

এবারও বড়দারই আশাভঙ্গ বেশি।

আমি হোপলেসই ছিলাম। এখনো তাই। সব জায়গায় হেরে গিয়ে ঘন বিষাদের চোরাবালিতে তলিয়ে যাচ্ছি। মাথার চুলটুকু জেগে আছে শুধু। হাতের আঙুল দেখা যাচ্ছে। একটু বাদেই একদম তলিয়ে যাবো।

মনোজ অকুতোভয়ে রেস খেলতো। মন্ত্রসিদ্ধ গোলাপ যোগাড়ে বেরিয়ে পড়তো। আবার নিজেদের ফাঁকা বাড়িতে মাসির জ্বর হলে তাকে জাপটে ধরে শুয়ে থাকতো। তাই নাকি দরকার হোত মাসির। মাসি তো সিদ্ধাই। তাই তো বলতো মনোজ।

ওর বাবা সামনের ঘরে বসে ঘুষখোর দারোগাদের সওয়াল সাজাতো। যাতে তারা সরকারী শাস্তি থেকে পার পেয়ে যায়। আর ভেতরঘরে মনোজের সিদ্ধাই মাসি ভর হলে ভীষণ কাহিল আর অন্যরকম হয়ে যেত। চোখ স্থির। গরম নিঃশ্বাস ঘন ঘন। মাথার চুল এলো। মনোজের মা পারতপক্ষে বোনের ঘরে যেতেন না। অবশ্য এই বোন তার সৎবোন। বিয়ে হয়নি। বয়স্থা। কালী-সাধিকা। মনোজের বোন আশার সঙ্গে মাসী মাঝে মাঝে বিকেলে বেড়াতে বেরোতো।

আশা পড়তো কলেজে। মাসী বোধহয় স্কুলকলেজে পড়েইনি। অথচ সিনেমার নায়িকাদের মত হাহা করে হাসছে। জামাইবাবুকে দারুণ চা করে খাওয়াচ্ছে। আচমকা মাংস আনলে কষা করে রেঁধে ফেলছে। সরু কোমর। বড় বড় চোখের কণাতে সুরমা। টাইট করে ধনেখালি। টাইট করে বেণী। টাইট করে আরও কিছু। দেখলেই মনে হোত—টইটুম্বুর।

আশা যে সন্ধ্যের বাতাসে মাসিকে নিয়ে বকুলতলা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ধোপার মাঠের দিকে চলে যেত—তাতে আমার আশার জন্যেই ভয় করতো। যদি কোথাও মাসির ভর হয়! হঠাৎ যদি অন্ধকার আশফল গাছতলায় মাসি কালী হয়ে দু'হাত তুলে দাঁড়িয়ে পড়ে! তাহলে আশা কি করবে?

এমনিতে মাসির স্বাস্থ্য—মাসির চোখের ঝিলিক আমার ভাল লাগতো। তবু জানতাম—মাসি আমার সম্পূর্ণ অজানা।

ছোটবেলায় বিরাট যৌথ পরিবারের গ্র্যাঞ্জার, আহ্লাদ দেখেছি। সেই যে দেশটা ভাগ হয়ে সব নয়-ছয় হয়ে গেল, তারপর কিছুই আর জুৎসই লাগছে না। সবই কেমন ভাঙাচোরা। কেউ আর সম্পূর্ণ নিখুঁত নয়। কোথায় যেন সব সংসারই দাগরাজি হয়ে গেছে। আমি মনোজের বাড়িটাও মেলাতে পারছিলাম না।

অ্যাক্সিডেন্টের ছবি তুলবে বলে মনোজ আমাকে সাইকেল চালিয়ে গিয়ে যে খেজুরগাছটায় ধাক্কা খেয়ে আছড়ে পড়তে বলতো—সেই গাছটার গায়েই একটা ডোবা। পানায় ঢাকা। তীরে সজনে গাছ। সে গাছের ডাল শুয়োপোকায় ভর্তি। আর সেই গাছের পাশ দিয়েই মনোজের কুয়োতলা। টিউবওয়েল। চান-বাসনমাজার বাঁধানো চাতাল। ঠিক ডোবাটার গা দিয়ে। সেই ডোবার ওপারেই বাঁশবন। এখন তো কলকাতার ভেতর বাঁশবন ভাবাই যায় না! অথচ বাঁশবনের জন্যেই একদা ফেমাস বাঁশদ্রোণী এখন জবরদস্ত শহর।

এই কুয়োতলার পেছনে একটা ছোট্ট খুপরি ঘরে কতদিন একা বসে বসে মনোজের জন্যে ওয়েট করেছি। মাসী চা দিতে এসে বলতো, এই যে পানুদা— তোমার মনোজ কোথায় ?

আমি কি জানি। তুমি না জানলে কে জানবে ছোটমাসী ?

ওই নামেই মনোজ আর আশা ওকে ডাকতো। ছোটমাসী বলতো, আমিও কি সত্যি জানি ! বুঝতে পারি না ঠিক।—বলতে বলতে চায়ের কাপ ঠক করে নামিয়ে দিয়ে ছোটমাসী চলে যেত।

একদিন শীতের সন্ধ্যেবেলা মনোজদের বাড়ি গেছি। তখন কলকাতার শীতকালে ঠিক সন্ধ্যেবেলাতেই শীত আসতো। অ্যাতো তো ভিড় ছিল না। লোকের শীত করতো। গায়ে আলোয়ান জড়াতো। আমিও আলোয়ান জড়িয়ে গেছি। গিয়ে দেখি সারা বাড়ি অন্ধকার। যাকে বলে ঘুটঘুট্টে অন্ধকার। চাঁদ উঠতে দেরি ছিল।

কলতলার দিকটা খোলা। দেখতে গেছি—কেউ বাড়ি আছে কিনা। মাসীর চমকানো গলা, কে ?

আমি।

ওঃ, পানু ! এখন যাও।

ওরা বাড়ি নেই ?

না, কেউ নেই। সেদ্ধ করা কাপড় কাচছি। এখন যাও। দেখছো না— আমার গায়ে কোন কাপড় চোপড় নেই !

অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। মনে হল—ছোটমাসী সায়া পরে— সায়া অনেকটা তুলে দুই পায়ে সেদ্ধকরা কোন মশারি-টশারি ধামসাচ্ছে। হাঁটুর নিচে পায়ের খানিকটা খানিকটা ফর্সা মত।

চলে এলাম।

ক'দিন পরে মনোজের বাড়ি গেছি। পাড়ায় ঢুকেই শুনলাম—সেই ডোবাটায় কাদের যেন মরা বাচ্চা ভেসে উঠেছে। মনোজদের কুয়োতলার গায়ে সেই ডোবায়।

যেতেই মনোজ বললো, বাইরে চল পানু—

তখনো কলকাতার ভেতর জামরুল গাছ, আঁশফল গাছ, ফলসা গাছ—ফাঁকা মাঠ ছিল। ধোপারা কাপড় কেচে সেসব মাঠে শুকোতে দিত। কাচাকাচির ভাটি বসাতো।

সেরকম একটা মাঠে বসে মনোজ বললো, এই নিয়ে আমার তিনটে বাচ্চা মারা গেল।

তখন আমাদের পঁচিশ হয়নি। বৈধ বা অবৈধ কোনরকম পিতৃত্বের সঙ্গেই কোনরকম পরিচয় নেই। নিজের সন্তান মারা গেলে কেমন লাগে তা জানার

কথা নয়।

বললাম, তোর ?

হ্যাঁ।

আর দুটো কোথায় হল ? কোথায় মরলো ? কার পেটে হোল ?

মনোজ দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, আবার কোথায় !

তুই কি চাস ? কিছুই দেখতে পাস না পানু ?

অবাক হয়ে বললাম, আমি জানবো কি করে ? তুই তো কিছুই বলিসনি মনোজ !

এবারও দাঁতে দাঁত ঘষে মনোজ শীতের দুপুরের পুকুরে তাকিয়ে বলল, ভর হলে মাসীর জ্বর হয়ে যেতো জানতিস তো !

নাঃ, তা জানবো কি করে ? ভর হওয়ায় তুই জাপটে শুয়ে আছিস— একবার একঝলক দেখেছিলাম তখন।

ওই সেই তখন ! যেমন যেমন ভর—তেমন তেমন জ্বর—আর সেমন সেমন জাপটানো।

তাহলে মাসীর পেটে ?

এই নিয়ে তিন-তিনবার। আগের দু'টো মেরে বাঁশবাগানে পুঁতে দেয়। শেষেরটা পায়ে চটকে—ডোবায়—

উঃ, আর বলিস না মনোজ !- বলতে বলতে আমার বুকের পাঁজরে যেন পেরেক গেঁথে গেল।

খুনী ! সিদ্ধাই খুনী ! প্রাণে কোন দয়ামায়া নেই। রাক্ষুসী। বিচ্—

তখন অত ইংরাজি গালাগাল জানতাম না। ঘেন্নায় মনোজের মুখ লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। ঘেউ ঘেউ করতে করতে কুকুরের মুখ যেমন ফুলে যায়। এত যদি ঘেন্না তো জাপটানো কেন ? জাপটাতে গিয়ে যদি ওসব হয়ে যায় তো জাপটানোই বা কেন ? তখনো জানতাম না বাচ্চা হওয়ার ভেতর—বাবা হয়ে যাওয়ার ভেতরেও এতখানি ঘেন্না—এত বিপুল খুন থাকতে পারে !

সেদিন সন্ধ্যেরাতে তাহলে মাসীর পায়ের নিচে কোন মশারি ছিল না।

শরীরের নানান পার্টস্ সব মিলিয়ে জায়গামত সুষম দেখলে—ভ্রূর কোন বিশেষ ভঙ্গিমা যদি চনমনে করে দেয় কিংবা হাসিতে ভেঙে পড়া নয়তো চোখের ঝিলিকের দরুন - কিংবা সিম্পল দাঁড়ানো বা বসে থাকাই যদি কারও দিকে আমাদের আকর্ষণ করে—তাহলে সেই কাম পরিণামে একটি জন্ম দেয়। ভাবি, কেন কাম ? কেন জন্ম ? কেন খুন ? নিহতের যেখানে বাধা দেওয়ার কোন ক্ষমতাই হয়নি—বুদ্ধিও জন্মায়নি ! সে তো সারা জগৎসংসারের ওপর নির্ভর করে এই দুনিয়ায় এসেছে। সে তো সবাইকে বিশ্বাস করে। তার সম্বল বলতে হাসি, কান্না, ঘুম, খিদে।

এইভাবেই পৃথিবীটা আমার চোখের সামনে পাল্‌টে যাচ্ছিল। এখন তো জানি পৃথিবী এরকমই। নানা বর্ণচ্ছটা! সব সময়েই বদলে বদলে যাচ্ছে। কখনো রিপিট নেই। কোন থামা নেই।

ভবানীপুরে ট্রাম লাইনের সামনে সিনেমা হল। তার থার্ড ক্লাসের গেটের পরেই হাউজের গা কেটে একচিলতে রেস্তোরাঁ। সেখানে যাই। বসি। বন্ধুরা আসে। আমরা তখন কেউ কেউ ধুতি পাঞ্জাবি পরি—কেউ বা শার্ট ট্রাউজার। তিরিশ হতে কয়েক বছর বাকি। সেই সময় ওই রেস্তোরাঁয় থিয়োরেটিশিয়ান সোমনাথ আসতো। ওর সব বিষয়েই আগ্রহ। কাঠের বেঞ্চ। কাঠের লগবগে টেবিল। বৃষ্টি হলে সামনের রাস্তা ডুবে যেত। তখন খদ্দের হোত না। সেই সময় ওখানে আমি পকেট থেকে গল্প বের করে পড়তাম। সামনেই ভবানীপুর থানা। ওখানে একসময় সোমনাথ ও সি-র ছেলেকে অঙ্ক কষিয়ে নিজের পুলিশ রিপোর্ট হাবিস করে দেয়। এখন সে সাউথ ইস্টার্নে মালগাড়ি বের করে। রাতে পড়ে অ্যানসিয়েনট ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি অ্যান্ড সিভিলাইজেশন। গল্পের শ্রোতাদের ভেতর দেবুদাও আছে। রেস্তোরাঁর মালিক দেবু বারিক। আমাদের চেয়ে কিছু বড়। তাগড়া চেহারা। মুখে বসন্তের দাগ। সবসময় হাসিমুখ। হাফপ্যান্ট পরে স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে ছুরি দিয়ে বিকেলের খদ্দেরদের জন্যে বড় পেয়াঁজ কাটতে কাটতে দেবুদা আমাদের গল্প শুনতো। রমেন জাহাজে করে জার্মানি যাবে। তখন সাড়ে সাতশো টাকা লাগতো। ট্রেনে বোম্বাই। সেখান থেকে জাহাজে ক্যালে বন্দর। আবার ট্রেন। জার্মানি পৌঁছালেই চাকরি। দেবুদা একটা স্যুট বানিয়ে দিল রমেনকে। অজু—পরে কবি মানস রায়চৌধুরীর সেজদা ডাক্তারি করতে বিলেত যাবে। দেবুদা তার রেস্তোরাঁয় বিদায়-ভোজ দিল। আমরা তো চার পয়সার চায়ের খদ্দের। তখন চৌষট্টি পয়সায় এক টাকা।

একবার সোমনাথের বুদ্ধিতে দেবুদা সাহেবদের সঙ্গে টেস্ট ম্যাচে খাবার সাপ্লাইয়ের অর্ডার নিল। সেই তার পয়লা কেটারিং। তারপর দুপুরবেলা দেবুদা স্টুডিওতে খাবার পৌঁছে দিতে লাগল। উত্তম সুচিত্রা থেকে এক্সট্রা অব্দি সবার জন্যে। দেবুদার একটা ভ্যান হল। আমার একটা উপন্যাস বেরোলো। সোমনাথ তার এক পাড়াতুতো বউদিকে তার বাচ্চাসুদ্ধ বিয়ে করে ফেলল। দেবুদা বেঙ্গল কেমিক্যাল, বেঙ্গল এনামেল, বেঙ্গল পটারি, বেঙ্গল ইমিউনিটি—সবাইকে দুপুরের ভাত ডাল সাপ্লাই দিতে লাগল। আরো কটা সিনেমা হলের রেস্তোরাঁ তার আওতায় এসে গেল। এসে গেল চিড়িয়াখানার রেস্তোরাঁটাও। এমন কি একটা লেমোনেড কোম্পানীও। ততদিনে দেবুদার চোখে রেটিনা ডিটাচমেন্ট। আমার বিয়েতে মোট একশো নব্বই টাকার কেটারিং। মাসকাবারি খাইখরচ ছিল একবেলা তিরিশ টাকা। সপ্তাহে দুই সন্ধ্যে মাংস তার ভেতর। দেবুদার গায়ে ফিনফিনে আদ্দি। জনাচারেক ম্যানেজার। পরে

আমাদের বাবাদের শ্রাদ্ধ—ছেলেমেয়েদের বিয়েতেও দেবুদার কেটারিং। এ এক রূপকথার গল্প। রাঙাজবা, তরল আলতা, বোরোলিনের পরেই আজ বঙ্গজীবনের অঙ্গ দেবুদা। ততদিনে আমাদেরও কেউ কেউ উপাচার্য, সাহিত্যিক, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ডাক্তার, বড় আমলা। সেই রাস্তাঘাট আছে। লাইট-পোস্টগুলোও জায়গামতই। কিন্তু দেবুদার দোকানে গিয়ে সেই সব বন্ধু—সেই দেবুদাকে পাই না। আমাদের আড্ডা, ভালবাসা, রাগ, অভিমান—সবই যে সেই তখনকার বাতাসে মিলে আছে। কয়েক কোটি টাকার শ্রম রেভিনিউয়ের হিসেব নিয়ে দেবুদাকে এখন এয়ার-কন্ডিশন ঘরে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের সঙ্গে বসতে হয়।

সে সময় এক সুখদুঃখের বন্ধু দেবুদা। আরেক সুখদুঃখের বন্ধু ন্যাশনাল লাইব্রেরি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে যে বই ইচ্ছে পড়া যায়। লাইব্রেরির রিকুইজিশন স্লিপের পেছনে দিব্যি গল্প লেখা যায়। লিখতে লিখতে বিকেল হয়ে যেত। কাঠের মেঝে। বাইরে সিঁড়িতে শীতের ডালিয়া। লাইব্রেরিয়ান কেশবন ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হাঁটার সময় ওঁর ডান পা ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়তো। যেন বাচ্চা ছেলে। এক একদিন সারাদিন লাইব্রেরিতে বসে লিখেছি বা পড়েছি—বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি অঝোরে বৃষ্টি—নয়তো ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। সেদিকে তাকিয়ে ভাবতাম—ভবিষ্যতে না জানি কি আছে। খুব মজাদার রঙীন একটা মোড়ক আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

তখন একটা দুটো লেখা ছাপা হচ্ছে। লাইব্রেরি-ফেরৎ জিরাত পুল দিয়ে ময়দানের দিকে যাচ্ছি। পড়ন্ত রোদে আমারই সামনে আমার ছায়া। ছায়ার শির উন্নত। সে লম্বা হয়ে রাস্তা পেরিয়ে ঘাসের ওপর। বন্ধুবান্ধব বলছে—তুই-ই আগামী দিনের লেখক।

এই সময় এক মহিলা খুব সেজেগুজে লাইব্রেরিতে আসতেন। বয়স বোঝা যেত না। এসে র‍্যাকে সাজানো পত্রপত্রিকা নামিয়ে দেখতেন। খানিকক্ষণ থেকেই চলে যেতেন। কোন কোনদিন নীহাররঞ্জন রায় ট্রাউজারের ভেতর শার্ট গুঁজে লাইব্রেরিতে আসতেন। সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম।

একদিন দেখি—দক্ষিণ ভারতের একদল মহিলা ঘুরে ঘুরে লাইব্রেরি দেখছেন। কাছা-দেওয়া শাড়ি। তাদের দেওয়ালে ঝোলানো স্যার আশুতোষের ছবি দেখিয়ে কেশবন বললেন, হি হ্যাড্ দ্য ট্যালেন্ট টু ফাইন্ড আউট ট্যালেন্টস্।

অবাঙালী হয়ে অবাঙালীদের কাছে বাঙালীর এমন প্রশংসা! দেখা যায় না এমন সর্বভারতীয় ছবি। ঠিক করলাম—এজন্যে কেশবনকে প্রশংসা করবো।

প্রশংসা তো করবো, কিন্তু কোথায় করি? কি করে করি? জায়গামত সুযোগ বুঝে প্রশংসা করা দরকার। সুযোগ আর পাই না।

বিকেল পাঁচটায় লাইব্রেরির অফিস বন্ধ হয়ে যেত। তারপরেও তিন ঘণ্টা

লাইব্রেরি খোলা থাকে। একদিন রাত সাতটা নাগাদ লাইব্রেরির বারান্দায় এসেছি জল খাবো বলে। এসে দেখি কেশবন তাঁর নির্জন অফিসঘর থেকে বেরোচ্ছেন। ভাবলাম—এই তো পেয়েছি—এবার ঝেড়ে প্রশংসা করবো মানুষটাকে। গুণীর কদর দিতে জানতে হয়।

প্রশংসা করতে শুরু করবো—ঠিক এমন সময় দেখি—কেশবনের পেছন পেছন সেই সুন্দরী মহিলা তাঁর অফিসঘর থেকে বেরোচ্ছেন। দু'হাতে এলোখোঁপা বাঁধতে বাঁধতে।

আমার সব গোলমাল হয়ে গেল। এখন তো লাইব্রেরিয়ানের অফিস বন্ধ থাকে। ঠিক এমন সময় ? কি ব্যাপার ?

প্রশংসা করতে হবে ইংরাজিতে। সেই ইংরাজিই গুলিয়ে গেল। প্রপার ওয়ার্ডটি কিছুতেই মুখে আসছে না। তার কাছাকাছি শব্দ দিয়ে মনে মনে ট্রানস্লেশন করতে গিয়ে গোলমাল করে ফেললাম।

বললাম, মিস্টার কেশবন—আই অ্যাম্ অ্যাসটনিশড্ অ্যাট ইওর বিহেবিয়ার !

কেশবন ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, হোয়াট্ ? হোয়াট হ্যাভ্ আই ডান ?

অবাঙালী হয়ে অবাঙালীর কাছে বাঙালীর প্রশংসা করার জন্য কেশবনকে আমি প্রশংসা করতে চাইছিলাম। কিন্তু সব গুলিয়ে গেছে। জুতসই ওয়ার্ড মনে মনে হাতড়াচ্ছি।

প্রশংসা করতে গিয়ে ফের বললাম, আই অ্যাম্ সারপ্রাইজড্ অ্যাট্ ইওর বিহেবিয়ার !

তখন কেশবনের বয়স বছর পঞ্চাশ। আমি তিরিশও হইনি। কেশবন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুই বুঝতে পারছেন না। শুধু বলছেন—হোয়াট ? হোয়াট ?

সেই সুন্দরী মহিলা এগিয়ে এসে জানতে চাইলেন, কি হয়েছে ভাই ?

বাঙলায় খুলে বললাম। মহিলা তো শুনে হেসে আটখানা।

বললাম, ইংরিজি বিগড়ে গিয়ে এই গণ্ডগোল।

মহিলা তুবড়ির মত তুখোড় ইংরিজিতে সারা ব্যাপারটা কেশবনের কাছে জল করে দিলেন।

এসব ঘটতো—তাই জীবন সুস্বাদু ঠেকতো।

একটা কোন চাকরি দরকার—যার টাকা বাড়িতে দিয়ে দিলেই আমি লিখতে পারি। কিন্তু চাকরি করবো না—বাড়িতে অন্ন ধ্বংসাবো—এ চলতে পারে না। মার্টিন রেলের পি আর ও, আবগারি অফিসে অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর অব একস্‌সাইজ, ঘোড়ার জকি—কিই না চেষ্টা করেছি। কোনোটাই হয়নি।

এমন সময় নটবর এসে হাজির। পাড়ার নটবরদা। সে সিনেমায় কাকাতুয়া থেকে রাজস্থানী তরোয়াল—সবই সাপ্লাই দিয়ে থাকে।

আমার দিকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থেকে নটবরদা বলল, তোর হবে। পেয়ে গেছি। চল—

এ যেন নিশির ডাক। তাও দিনের বেলায়। নটবরদাকে আমরা চিনি। অনেকে আবার তাকে নটা বলেও ডাকে। পাড়ার এক ভদ্রলোকের বিশাল এক সেন্ট বার্নার্ড কুকুর ছিল। একেবারে গাধার সাইজের। ভদ্রলোক অফিসে গেলে সেই কুকুরকে বশ করে নটবরদা স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে কোন্ ছবিতে ভাড়া খাটিয়েছিল।

কিছুই হয় না। গেলাম নটবরদার সঙ্গে। মিস্টার দামানির বাড়িতে। পার্ক স্ট্রীটে গোল্ডস্টেন ম্যানসনে। তিনি হিন্দি ছবির প্রডিউসার। যাকে বলে বড়দরের ফাইনানসিয়ার। দামানি, ফেরওয়ানি, হিরোয়ানি নামে বেশ কিছু সিন্ধি বড় ফাইনানসিয়ার হিন্দি ছবিতে টাকা লাগাতো। এখনো বোধহয় লাগায়।

যেতেই দামানি বুঝিয়ে বলল, দু'টো সিন আছে—যেখানে শাড়ি আর পরচুলা পরে নার্গিসের ডামি হতে হবে।

আমি তো অবাক! নার্গিস হব কি করে?

সেকথা বলতে দামানি সাহেব বুঝিয়ে বললেন, দূরে থেকে ক্যামেরা আবছা করে তুলবে। স্পষ্ট বোঝা যাবে না। তবে ডিরেক্টর সাহেব ফাইনাল সিলেকশন করবেন। নার্গিস রাজি হচ্ছে না বলেই ডামির দরকার। দামী হাত-পা তো! ভয় পাচ্ছেন—যদি জখম হয়ে যায়—

কিরকম সিন?

একটা সিনে সিঁড়ি থেকে গড়িয়ে পড়তে হবে। অন্তত দশটা ধাপ। আরেক সিনে ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে হবে।

দুটোই পড়া! সবই করতে হবে শাড়ি পরে উইগ মাথায় চাপিয়ে! আবার ঘোড়া? আমি রাজি হলাম না।

দামানি বললেন, সে আপনার ইচ্ছা। আর ডিরেক্টর সাহেবের সিলেকশন। নগদ দু'হাজার টাকা। সিন হয়ে গেলেই পাবেন।

নটবরদা জানতে চাইলেন, অ্যাডভান্স?

পাঁচশো টাকা।

বেরিয়ে আসতে নটবরদা বলল, রাজি হয়ে যা পানু। পাঁচশো টাকা অ্যাডভান্স। প্লেনে বাগডোগরা। হোটেলে থাকবি। শিলিগুড়ির চা-বাগানে সুটিং। নার্গিসকে দেখবি কাছের থেকে। ক'জনের ভাগ্যে হয়?

উঁহু।—বলেও মনে হল—অতগুলো টাকা!

দোনামনা দেখে নটবরদা বলল, উইগ পরলে দূর থেকে তোর কপালের সঙ্গে নার্গিসের কপাল মিলে যায়। আমি কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি—তুই-ই নার্গিস—

কপাল! মনে মনে হাসি। নার্গিসের কপাল আর আমার কপাল!

নটবরদা বলল, একটা ট্রায়াল দিয়ে দেখতে পারিস কিন্তু। সিনেমায় পড়া কিন্তু আসল পড়ার মত অত ব্যথার নয়।

রাজি হয়ে গেলাম ট্রায়াল দিতে।

তখনো উত্তমকুমার উত্তমকুমার হয়নি। বাংলা ছবি রবিন মজুমদার আর অসিতবরণের দখলে। ভাগাভাগি করে। কালী ফিল্মস্ তখনো টেকনিশিয়ানস্ হয়নি। এক রবিবার সেখানে এক গরম গুদামের ভেতর নটবরদার লোকজন আমাকে ঘণ্টাতিনেক ধরে মুখে রং মাখিয়ে মাথায় উইগ চাপিয়ে—শাড়ি পরিয়ে নার্গিস বানালো। ঘামলেই দাঁড়-করানো পাখা চালায়। সে গোডাউনের কোণের দিকে কাঠের বিরাট সিঁড়ি নেমে এসেছে। সিঁড়ির মাথায় পাতলা রং করে বড় বাড়ির দোতলার আভাস।

পয়লা বারের পড়াটা নটবরদা নিজেই পড়ে দেখালো। পারফেক্ট আছাড়। পড়েই নটবরদা উঠে দাঁড়ালো। যেন কিছুই হয়নি।

এবার আমায় পড়তে বলল। কোন্ একটা গানের তালে গাইতে গাইতে নামতে নামতে পড়ে যেতে হবে। পা হড়কে। গান বা তার তালটা নটবরদা জানে না। বললো, এমনিই মনে মনে গুন গুন করতে করতে পড়ে যা।

নার্গিসের মেকআপ নিয়ে কয়েক ঘণ্টা ধরে ঘামছি ভেতরে ভেতরে। তারপর ইচ্ছে করে পা হড়কে পড়ে যাওয়া। পড়লামও দারুণ পড়া।

একদম পপাত। উঠে দাঁড়াতে পারি না। নটবরদার কাঁধে ভর দিয়ে যখন বেরিয়ে এলাম ওখান থেকে, তখন ডান পা ফেলতে পারছি না। গোড়ালির ওপরটা ফুলে গেছে।

টালিগঞ্জ ট্রামডিপো দিয়ে ফিরে আসছি। জষ্টি মাসের রোদেভেজা গনগনে বিকেল। নটবরদা আমার হাতে নগদ দুটো টাকা দিয়ে জানা রিকশায় বসিয়ে দিয়েছে। দিয়ে বলেছে—ঠিক এই সময় কেউ পা ভাঙে! ক্যারিয়ারে একটা ব্রেক আসছিল তোর—সব দিলি ভেস্তে।

আমার নিজের জীবন অনেকদিনই আমার হাতের বাইরে চলে গেছে। রিক্সায় দুলতে দুলতে বাড়ি ফিরছি। সামনে কোথাও কোন ছায়া নেই যে সেখানে বসে একটু জিরোবো। চারদিক পুড়ে যাচ্ছে। কোন আশা নেই কোথাও। বিশ্বাসও নেই। না ভালবাসায়—না রাজনীতিতে। ঈশ্বরেও নয়। তা যদি থাকতো তো বেঁচে যেতাম। ভগবান আছেন কি নেই—এ কথায় কোনদিন যাইনি। কিন্তু তাঁকে নিয়ে আলাদা করে কিছুই ভাবিনি। আমারই মত ঘুরতে ঘুরতে কেউ কবির হয়ে যায়। কেউ নানক। ভগবান তাদের পথ দেখান।

ঘুরতে ঘুরতে আমিও পথ পেয়ে গেলাম। তখনো রাউরকেল্লা, দুর্গাপুর,

ভিলাই জওহরলালের স্বপ্নে। ওসব শুরু হওয়ার প্রায় ছ'বছর আগে আমি একটি ছোট্ট ইস্পাত কারখানায় ঢুকে গেলাম।

তখনই আমি গল্প লেখার চেষ্টা শুরু করি। আমি পড়াও শুরু করি তখনই। খুব যে নিয়ম মেনে তা নয়। বাঙলা অনুবাদে রুশ উপন্যাস গল্প। প্রেমচাঁদ। বাঙলায় বঙ্কিম থেকে প্রায় সবার লেখা। বাঙালী মাত্রেই ভাল ছোট গল্প লেখে। অন্তত দশটি। রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক গল্পটিতে আমায় আজও বেঁধে রেখেছেন। তারাশঙ্কর, দুই বিভূতি, মানিক, সতীনাথ, প্রেমেনদা, গজেনদা, বুদ্ধদেব, প্রবোধ সান্যাল, মনোজদা—এঁদের পরেকার সন্তোষকুমার, নরেন্দ্রনাথ, সমরেশ, বিমল কর, রমাপদবাবুর ভারতবর্ষ গল্পটি, সুবোধ ঘোষের শকথেরাপি—আরও পরে দীপেন, মতি, সুনীল, শীর্ষেন্দু, সন্দীপন, দেবেশ—কে আমায় কৃতজ্ঞ করেননি? গল্পে বাঙালীর প্রতিভা খোলে। বাঙলা ছোট-গল্পই গত এক শতাব্দীর বাঙালীর জীবনের সামাজিক রিপোর্ট।

মহাযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ, স্বাধীনতা আমাদের জীবনের সুতোগুলো বুনে দিয়েছিল। তাতে ফুল তুলেছে আমাদের স্বপ্ন। রাজনীতি নিয়ে স্বপ্ন। একটি মেয়েকে ঘিরে স্বপ্ন। জীবনটাকে নিয়ে স্বপ্ন। বেভুল ঘুরে বেড়ানো, বই পেলেই আগাপাশতলা পড়ে ফেলা, যে-কোন খারাপকেই সুস্বাদু লাগায় জীবন চিরকালই আমার কাছে জিভেগজা। ভয় কখন ফুরিয়ে যায়।

কুস্তির আখড়ায় ওস্তাদকে পিঠে নিয়ে আড়াই পাক ঘোরায় কোমরে জোর হয়েছিল। আজও সে জোর পাই। ইস্পাত কারখানায় প্রায় তিন বছর গলন্ত ইস্পাতের সামনে আগাগোড়া দাঁড়িয়ে ডিউটি দেওয়ায় বাসে বা কোথাও দাঁড়াতে কষ্ট হয় না: দাঁড়ালে বরং ভালই লাগে। খবরের কাগজে বহুকাল নাইট ডিউটি দেওয়ায় এখনো মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে উঠে বসে দিনের মতই পড়ি, লিখি, হাঁটি, খাই। রাত দু'টোকে মনে হয় বেলা দু'টো। কোন জিনিসই সহজে হয় না বলে চারদিক আমার গলা টিপে ধরলেও আমি চমৎকার খেলি। দিব্যি কাটিয়ে বেরিয়ে আসি।

॥ তেরো ॥

ছোটবেলার দাম বোঝা যায় বড়বেলায়। সেসময় পা দু'খানা ছোটে সাইকেলের আগে। রাতে শুয়ে মনে হয় কখন ভোর হবে। রোগা নদী দেখে তার ভরা চেহারা মনে ভাসে। হেড স্যার গুরুজন। সন্ধ্যে হয়ে গেল—এখনো পড়তে বসিনি। আজ কপালে কী আছে কে জানে!

এই না বয়েসের কথা। অ্যানুয়ালে ফার্স্ট চান্সে সবাই তো প্রোমোশন পায় না। সে ভাগ্য ক'জনের? পরীক্ষার কোশ্চেন ছাপা হয় বঙ্গোপসাগরে।

ভাসন্ত জাহাজে প্রেস। যারা ছাপায়—তারা বোবা। কারণ এ চাকরি নিলে জিভ কেটে ফেলতে হবে। নইলে যে কোশ্চেন আউট হয়ে যাবে। এইসব ভাবতাম আমরা।

ক্লাস থ্রি-তে যার সঙ্গে পড়েছি তার সঙ্গে দেখা নেই তিরিশ বছর। সে এখন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার।

আমি ইঞ্জিনীয়ার। আমার ওপর ভার পড়েছে—ওই ডাক্তারকে উঠিয়ে দিয়ে সেখানে ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট বানাতে হবে। মুখোমুখি হতে দুজনে দুজনকে চিনলাম। ওর নাম ছিল দেবকুমার দাশ। সংক্ষেপে ডি কে ডি। ডাক্তারবাবুর ব্যাগেও লেখা ডি কে ডি। তখন দেবকুমারকে জড়িয়ে ধরলাম। তিরিশ বছর পরে। সবই কল্পনা। কিন্তু সত্যি হয় না কি!

যার পকেটে শৈশব নেই সে যেন কোনদিন প্রতিভার নদীতে না নামে। নামলেই ডুবে যাবে। নয়তো ভেসে যাবে। যার আছে—সেই শুধু সাঁতরাতে পারবে। জীবনেও তাই হয়। ভাল ছোটবেলা আসলে বড়বেলার অ্যাডভান্স টিকিট। আগে লাইন দিয়ে কেটে রাখতে হয়। এ টিকিট হাতে থাকলে বড়বেলাটাও সুন্দর।

মানুষ এক জায়গায় থাকে না। সে অবিরাম তার চলতি অবস্থা থেকে ওপরে উঠতে চায়। কখনো পারে। তবে বেশিরভাগ সময়েই সে পিছলে নিচে পড়ে যায়। শ্রেণীচ্যুত হয়। তাকে আমরা বলি ডিক্লাসড্। তখন আরও এক ধাপ নেমে গিয়ে যেটুকুও ছিল—সেটুকুও হারায়। তখন তার সামনে অনিশ্চিত মহাসাগর।

ওপরে ওঠা—উঠতে গিয়ে পিছলে পড়া—পড়ে গিয়ে নিজেকে দেখতে পাওয়া—এইসব নিয়েই আসলে এই ওঠাপড়ার পৃথিবী ও জীবনের সাইনবোর্ড।

এরকম একটা জীবনে আমি ট্রেন থেকে নেমেছিলাম। আমি আর আমার স্ত্রী। তখন আমাদের হানিমুন করার কথা। বন্ধুরা গালুডি থেকে ফিরেছেন। কবি হলেন। লেখক হলেন। রেসপেকটেবল হয়ে যাচ্ছেন। ওপরে উঠতে চাইছেন। কেউ পিছলে পড়ছেন। কেউ বাংকে জায়গা পেয়ে গেলেন। তবে সবাই উনিশ-বিশ র‍্যাডিকাল, ক্রুদ্ধ, বিয়ে করবেন-করবেন—আবার কেউ করে ফেলেছেন। আমার প্রথম দু'খানি উপন্যাস পাণ্ডুলিপি থেকে বই হয়েছে। সেসব বইয়ে শহর, মানুষ, হাসপাতাল, বেকার, প্রেম, প্রেমহীনতা, অবিশ্বাস ও হতাশার অব্যর্থ পরিণাম—ক্রুদ্ধ কাম মোটা দানার চিনি হয়ে দেখা দিয়েছে। এসব কথা বলতে পারছি—কারণ তারপর তো তিরিশ বছর পেরিয়ে এসেছি।

ট্রেন থেকে নেমে দেখি প্ল্যাটফর্মের বাইরের এক কোটি বছরের পুরনো পৃথিবী ঘট হয়ে বসে আছে। আমায় ডেকে বললো, এখানে থাকো শ্যামলবাবু?

ভাড়ায় ছিলাম একজন প্রাক্তন ডাকাতের বাড়িতে কিছুদিন। তখন তিনি ঘোর

গৃহস্থ। এঁকে আমার লেখক-বন্ধুরা দেখেছেন। আমার চেয়ে বছর পঁচিশের বড়। তখন অত্যন্ত সজ্জন। ট্রানজিস্টার নিত্যসঙ্গী। বেগুনক্ষেতে গ্যামাকসিন দেন। বড় ছেলে বিয়েতে পালংক পেল। মেজো ছেলে বন্দুক দিয়ে ডৌখোল পাখি মেরে আমায় খেতে দিলো। ছোট ছেলে দাড়ি রাখছিল। একমাত্র মেয়ে প্রাইভেট টিউটরের সঙ্গে প্রেম করছিল।

ওদের বাবা আমাকে নানা প্রকারের লোভের কথা জানালেন। মাছ, ধান, জমি। জানালেন—মাঠের ভেতর খুন করলে বডি কিভাবে পিস করতে হয়। শকুন সম্পর্কে সাবধান। ওরাই সেসব টুকরো বয়ে এনে রেলের প্ল্যাটফর্মে ফেলে—আর শোরগোল ওঠে। সেই সময় দেখলাম সুদখোর। বাসন বন্ধকী। জাল বন্ধকী। জমি লিখে দেওয়া। এওয়াজি বদল। ভজিয়ে দেওয়া। ভুজুং মারা। হাল আর সাবেক দাখিলা। ঈশাদী সাক্ষী। ফলের বাগান। ডাঙা জমি। এজমালি পুকুর। বাপ ঠাকুর্দাকে ভাগে ভাগে দাহের জন্যে শতাব্দীর চেয়ে বড় বুনো তেঁতুলের বড় বড় ডাল টেকে রাখা।

তখন উনিই বলেছিলেন, খুন করে কক্ষনো সারেন্ডার করবে না শ্যামলবাবু। উকিলকে টাকা দে পাইলে যাও। সে জামিনের ব্যবস্থা করুক। তারপর হাজির হও। নয়তো পয়লা দফাতেই লকআপে পিটে 'কনফেস' আদায় করে নে সদর আলিপুরি চালান দে দিলি মহা মুস্কিল। তখন জামিন পেতি মোটা টাকার ধাক্কা।

আমার অবশ্য খুন করার দরকার পড়েনি।

আবার বলা যায়—পড়েও ছিল। আমি একটি খুন করি। শ্যামল গাঙ্গুলীকে। যে কিনা এতদিন সিমেন্টে বসবাসকারী ছিল। তার কিছু গেঁথে যাওয়া ধ্যান-ধারণাকেই আসলে আমায় খুন করতে হয়।

যেমন, অভাবী মানুষ মাত্রেই সরল ও সৎ—এ কথাটা যে কত মিথ্যে নিজের চোখে দশ বছর ধরে দেখলাম। আবার সারল্য ও সততা—সবই যে চাপের ওপর নির্ভর করে—তাও দেখলাম। তখন রোজ ট্রেনে কলকাতায় আসি যাই। পুলিশ পাহারায় শিল্পীদের মিছিল—পরদিন সকালের কাগজে ছবি। বঙ্গ সংস্কৃতিতে স্টল। হুইসিল দিয়ে ওভারটুনে কবিসভা। ভিয়েতনামে বোমা একটু বেশি পড়লে কিংবা পরমাণু বোমা ফাটালেই আমরা সই দিচ্ছি। দীপেন সই যোগাড় করছে। পরে অবশ্য রাশিয়া আর চীন ফাটাল। তখন ওই বাবদে সই-সাবুদ কমে গেল। বেশ যাচ্ছিল। চমৎকার। দু'জন সম্পাদক দেখা হলে বলেন, শ্যামল, তোমার গরু এবেলা ওবেলা কতটা দুধ দেয়? কিংবা এবার বিঘে পিছু কতটা ধান পেলে? ধানের মণ কত করে? কেউ জানতে চান না—কি লিখছি। কেউ লেখা চান না।

আমি হাঁ হাঁ করি। আসলে তখন আমি একখানা পাকা বাঁশের বয়স জেনে

ফেলেছি। বর্ষার আগে বড় ডেয়োপিঁপড়ে কেন বেরিয়ে পড়ে তাও জানি। লতা আদি বুকে হাঁটা প্রাণীর আহারের টাইম নিশুতি রাত। লোকাল পঞ্চানন অপেরা, বন্ধকের কারবারী, নাদু শী, রেসুড়ে অনন্ত বাঁড়ুজ্যের সঙ্গী হয়ে যাচ্ছিলাম। কালচে সবুজ ধানচারায় ঠাসা মাঠের তীরে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার বিন্ বিন্ শব্দ পাই। চারাগুলো অবিরাম বেড়ে চলেছে। এসব দিয়ে কি সাহিত্য হয়? পৃথিবীর যে কোন দিগন্তই তো একখানা বড় পেন্সিল স্কেচ। রবার ঘষে ঘষে অনর্গল নতুন ছবি হয়ে যাচ্ছে।

এইসব দেখেশুনে আমিও আমার সময়, মানুষ এবং লেখকদের চলতি স্রোত থেকে উথলে বাইরে পড়ে যাচ্ছিলাম। আসলে ওদের থেকে আমি ডিক্লাসড্ হয়ে যাচ্ছিলাম। অথচ এই চলতি স্রোত থেকে আমার তো ছিটকে বেরিয়ে যাবার কোন কথাই নয়। আমার সময়কার মানুষজন—যাঁরা লেখক হচ্ছেন—হয়েছেন—এঁদের আমি জানি। পরিবেশ, পটভূমি, পারিবারিক গঠন যা—তাতে আমারই স্রোতের ভাসা ফেনায় মাখামাখি হয়ে থাকার কথা। আমার অজ্ঞাতে আমি উথলে বাইরে পড়ে গেছি। সেজন্যে দায়ী আমার দেখাশুনো—আমার জীবনযাপন - সেই জীবন থেকে পাওয়া আলোয় দেখতে শেখা এবং জানা।

এই শ্রেণীচ্যুত হওয়াটা আমার খুবই দরকার ছিল। 'অলীকবাবু'তে একজন লোফার, লায়ার এবং লুম্পেনের কথা বলেছিলাম। ওভারল্যাপিং সীমান্তে সাবধানে দাঁড়িয়ে একজন হয়ে যায় লেখক—অথচ একই ধাঁচের আরেকজন হয়ে যায় লোফার, লায়ার, লুম্পেন। একজন আরেকজনের পরিপূরক। কিংবা আয়নার প্রতিচ্ছবির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আসলের আইডেনটিটি ক্রাইসিস। সেই অলীকবাবুকে একদিন দেখলাম শতকোটির ওপর ব্যবসাদার এক কোম্পানী চেয়ারম্যানের সঙ্গে প্রাইভেট পুলে। তারপরই তাকে দেখি ভূমিহীন এক ফুড-গ্যাদারের সঙ্গে। একদা তাকে দেখেছি ওপেন হার্থ ফারনেসে স্যাম্পেল-পাসার হিসেবে। আবার তাকে পাই খবরের কাগজের নিউজরুমে সদ্য প্রয়াত প্রখ্যাতজনের নামের আগে 'মনীষী' কথাটা বসাবে কি না—এই নিয়ে মহাভাবনায় ভাবিত অবস্থায়।

এই তো ফক্কিকারির দুনিয়া। এখানে স্ট্যাটাস, ঠাটবাট, সংবিধান, গণতন্ত্র সবই তো অধিকারী, ভোগী, প্রপার্টিওয়ালার ভোগ দখলে বজায় রাখতে আমরা কিছু বি এ, এম. এ পাশ প্রফেসর, ব্যারিস্টার, ডক্টর, লিটারিয়েটর, এঞ্জিনীয়র কিংবা কমিশনার, ভ্যালুয়ার, অ্যাডমিনিসট্রেটার হয়ে বসে আছি। কিংবা পঞ্চায়েত, বিধানসভা সাজিয়ে ওয়েট করছি। সবাই তো আসলে আমরা পাহারাদার। কোমরে গণতন্ত্র, ধনতন্ত্র আর সমাজতন্ত্রের বেল্ট। বুকে প্রফেসরের জ্ঞান। মাথায় ব্যারিস্টারের যুক্তি। বচনে এ্যাডমিনিসট্রেটরের বুদ্ধি। কয়েকটি মুদ্রার বিনিময়ে। বিরাট পাহারার কাজে নিযুক্ত। কখনো স্বেচ্ছায়।

কখনো অজ্ঞাতে। কখনো ধ্বজাধারীর বিশপ-মার্কা কট্টর গর্বে। আসলে আমরা গর্বেট বলেই তো! কি করিতেছি জানি না।

এসব কথার কাছাকাছি আমি কিছু লিখতে চাই। তাই চন্দনেশ্বর জংশন। এত বড় পৃথিবীর সবটাই তো সভ্যতা নয়। সবটাই তো শারদ উপন্যাস নয়। তার বাইরেই তো সূর্যকিরণে জীবন। কয়েক কোটি বছরের। বিশাল পেন্সিল স্কেচ। কল্পনার রবারে মুছে চলেছি। নতুন ছবি হয়ে যাচ্ছে। মনুষ্যত্বের চেয়ে বুদ্ধ, মার্কস এঁরা বয়সে বেশ ছোট। তেমনি জীবনের চেয়েও।

সফিসটিকেশন, সূক্ষ্মতা, বাঁধানো কলতলা, ফাইভ-স্টার হোটেল, বিদেশের রাজধানীতে মন্ত্রীর সঙ্গে ককটেলে, নোবেল লরিয়েটের চালানো গাড়িতে বসে মহানগর দেখতে বেরিয়ে, সেনেটরের সঙ্গে লবিতে দাঁড়িয়ে, অজিতেশের গলায় ক্রেয়নের ডায়ালগে যা বার বার শুনতে পাই—যে একটি কথা—তা হোল ডিক্লাসড্! ডিক্লাসড্! পড়তে পড়তে নিজেকে দেখতে পাওয়া। সেজন্যে নিজেরও অনেকদিনেরও অভ্যস্ত ধ্যানধারণাকে নিজের হাতেই খুন করার দরকার পড়ে। এটা যদি 'কনফেস' হয়ে থাকে তো জানি না—জামিন পাবো কিনা। অবিশ্যি ঘাতক ও নিহত—দু'জনই একজন—সে হোল শ্যামল গাঙ্গুলী! নয়তো বার বার কেন শুনি—আমি নিইচি—তুই দেকেছিস? আমি লোফার। জাত লোফার।

এসব কথা সরাসরি বললে পাছে লেকচার-লেকচার লাগে তাই আমি একটা এলেবেলে কাহিনী বেছে নিয়ে তাতে মাটি লাগাই। এজন্যে একটা পটভূমি, একটি প্রকৃতির দরকার পড়ে। তাই শুখো পিয়ালীর বুকে রেলপোল কাজে লাগাই। লাগাই পাশেরই বাঁশবন—বাঁশড়ার বিখ্যাত বাঁশবনকে। রেলপোলের নিচে পাথরের বড় বড় চাঁই সত্যিই একসময় নদীর ঢেউ ভাঙতে নিচে ফেলা হয়েছিল। নদী চলে গেছে। এখন পাথরগুলো পড়ে আছে। এই পড়ে যাওয়া পাথরগুলোও নিজেদের দেখতে পেয়ে স্থির হয়ে আছে। ওরা কতকাল অরিজিন্যাল পাহাড় থেকে উথলে বাইরে পড়ে গেছে।

বিরাট বিশ্ব। কাল অনন্ত। তার মাঝে মানুষজন দেখি। দেখি গাছপালা। নদী মেঘ পাহাড় আলো। দেখতে দেখতে কোনো ব্যাপারকে মনে হয় বুঝিবা গতজন্মের। কী এক অজানা ইশারায় আমাকে সব মনে করিয়ে দিতে গিয়ে পারছে না। আবার কোনো জিনিস বা মনে হয়—খুবই আগামীর। তার জন্যে আমি এখনো তৈরি হয়ে উঠতে পারি নি।

পুরনো আসবাবের খাঁজে ধুলো ঝাড়তে গিয়ে সোনার গুঁড়ো পাই। পাই রুপোর গুঁড়ো। রূপের গুঁড়ো। মানুষের যে কত রূপ! কী বিস্ময়কর এই মানুষ! অবিরাম অনুসন্ধানেও এ মানুষ ফুরোবার নয়। এ এক অনন্ত খনি।

ভালবাসারও নানা চেহারা। একটা বয়সে যে মন নিয়ে কাউকে ভালবেসেছি—বেশি বয়সে পৌঁছে দেখি সে মন আর নেই। হাঁটুর পুরনো ব্যথার মত ভালবাসার স্মৃতিটুকু শুধু পড়ে আছে। ভালবাসা আর নেই।

তখন অনুসন্ধানে নামি, এমন কেন হল?

এক ডাক্তারবন্ধু বলল, তুমি যখন ভালবাসায় পড়েছিলে—তখন যেসব কোষ দিয়ে তোমার শরীরটি তৈরি ছিল—সেসব কোষের বহুকাল মৃত্যু ঘটে গেছে। সেখানে নতুন নতুন কোষ এসে তোমার দেহকে নিরন্তর নতুন রাখার চেষ্টা করে চলেছে।

তাই বল! সেই তখনকার দেহটাই আর নেই। তার মানে শুধু মনে হয় না। আধারও চাই। সেই দেহের ভালবাসা এ দেহে থাকবে কোত্থেকে!

আধার বদলায়। কোষ বদলায়। মনও তো বদলায়। বোধি এবং মেধা অবিরাম স্নায়বিক সংঘর্ষে নতুন নতুন দৃষ্টি পায়। মনের দেখবার প্রকৃতিই তাতে পালটে যায়। এই নব নব দেখার ভঙ্গি মনকে পুরনো ব্যথা থেকে আনন্দে এনে তোলে। আনন্দ থেকে ব্যথায়।

এইসব কথাই গল্পে লিখতে চেয়েছি। কতটা পেরেছি জানি না। কেননা আমার কোনো লেখার পাণ্ডুলিপি ছাপতে দেওয়ার পর কোনোদিন ফিরে পড়ে দেখিনি। নতুন লেখায় চলে গেছি।

তাই কেউ যখন আমার লেখার প্রশংসা করেন—বুঝতে পারি না।

কেউ যখন সমালোচনা করেন—বুঝতে পারি না।

কারণ লেখাটা তো আর মনে নেই। কার কোন্ লেখার কথা বলছেন—বুঝতেই পারি না।

জীবন থেকে—আশপাশের মানুষের ভেতর থেকেই লেখার বীজ পাই। সে বীজ নানান অভিজ্ঞতা—কল্পনা—স্বপ্নের আলোয় অঙ্কুরিত হয়। গল্পের পা থাকে তাই জীবনের মাটিতেই। অভিজ্ঞতা, কল্পনা, স্বপ্ন—এই ত্রি-শিরার কিশলয়ে ভাষালক্ষ্মীর বারিধারা নিয়ে আমি কোনোদিন ভাবি নি। মাথাই ঘামাই নি।

কারণ ভাষা আমার কাছে মনের ভেতরকার অস্ফুট, অসম্পূর্ণ স্বগতোক্তির মতই। যা কিনা মনে মনে আপনা-আপনি ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। তাই আমি একটা একটা করে তুলে এনে কাগজে বসিয়ে দিই। আশ্চর্যবোধের আগে সম্পূর্ণ বাক্য।

বছর চল্লিশ আগে একদিন জ্বরগায়ে জীবনের প্রথম গল্পটি লিখে ফেলেছিলাম। অবাক হয়েছিলাম তখন—যখন দেখেছিলাম—চরিত্ররা নিজেরাই নিজেদের পথ ঠিক করে নিয়ে হাঁটাচলা করছে—কথা বলছে—কথা বলছে না।

এরপর তিরিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ—নানারকম বয়স পেরিয়ে দেখছি—সামনেই

ষাট। কিছুই যে করা হয় নি। কিছুই তো থাকবে না। কিছুই তো করা হল না।

যে গল্প সতের বার কেটেছি—কপি করেছি—ভেবেছি না-জানি কী লিখলাম—সে গল্প ছাপা হতেই সবাই একযোগে মন্দ বলেছেন। আবার যে-গল্প খবরের কাগজের নিউজ ডিপার্টমেন্টে টেলিপ্রিন্টারের অবিরাম ক্ষুরধ্বনির মধ্যে—হাজারো লোকের জিজ্ঞাসার ভেতর—খবরের চাপের মাঝখানে পড়ে মরিয়া হয়ে লিখেছি—পাছে ভুলে যাই বলে—সে গল্প পাঠক ধন্য ধন্য করেছেন। সমালোচক তাতে খুঁজে পেয়েছেন মনীষা।

ছোটগল্প বাঙালীর প্রায় কুটীরশিল্প। সবাই কিছু না কিছু ভাল গল্প লিখে গেছেন এই ভাষায়। আমি কি করেছি আমি জানি না।

পাঠক জানেন।

আমি জানি শুধু আমায় কি করতে হবে। ছিপ ফেলে পুকুরে ঠায় বসে আছি। মাথায় গামছা। আকাশে সূর্য। ছায়া নেই কোথাও। ফাৎনা ঠোকরালেই কাৎ করে ছিপে টান দেব। জলের নীচে বঁড়শি।

এইভাবে বসে বসে দিন যায়। মাস যায়। কদাচ বড় মাছ পাই। পেলেও স্বস্তি নেই। তাকে ঠিকমত পরিবেশন করতে হবে। নিজেকে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত রেখে। যদিবা আমি গল্পে সামান্য উঁকি দিই—তবে তা হবে অতি নিচু পর্দায়। দীনহীন ভাবে। গল্পের প্রয়োজনটুকুই সেখানে রাজকীয়। বাদবাকি সবকিছুই ম্যান অন দ্য স্ট্রীট।

গল্প আমার অনেক সময় আমার কাছে নিজের পায়ে হেঁটে চলে আসে। আমার শুধু তুলে নেওয়া। আমি তখন অনেকদূর দেখতে পাই। এক প্রৌঢ় গীতাচণ্ডী বেদ বেদান্ত পুরাণ উপনিষদ পড়ে ঈশ্বরে পাড়ি দিয়েছেন। আর এক অতি প্রৌঢ় ফুলের পরাগ, গাছের পাতার হিন্দোল চিনতে শিখেছেন সারাজীবন ধরে। তিনিও এই মহাপ্রকৃতির মূলে যাবার যাত্রী। সেখানে যদি ঈশ্বর বলে কেউ থাকেন তো ভাল। সেই ঈশ্বরই অজান্তে তার কাম্য। এই দুই প্রৌঢ়কে কাছাকাছি এনে একটি গল্প লিখেছিলাম। প্রথাসিদ্ধ পথে ঈশ্বর। অপ্রথানুগ পথে ঈশ্বর। দুই মানুষকে কাছাকাছি আনায় এক নতুন গল্প হয়ে গেল। শুনতাম—বুড়ো হলে ছেলে দেখে। ছেলে না থাকলে টাকা দেখে। একজনের ছেলে ছিল। টাকা ছিল। বাড়ি ছিল। কেউ তাকে দেখল না। মেয়ে সব সম্পত্তি লিখিয়ে নিয়ে বোধ-হারানো বৃদ্ধ বাবাকে অজানা মেল ট্রেনে তুলে দিল। ট্রেনটা বাঁশি দিয়ে ভারতবর্ষের ভেতর হারিয়ে গেল। এই তো জীবন। সব কিছুর সাক্ষী হয়ে থাকল একটি নির্বাক ডুমুর গাছ।

এরকম নানান গল্প নানান সময়ে কলমে এসেছে। সেসব গল্প জীবনকে দেখার এক একটা সময়কে ধরে রেখেছে। পরবর্তী মানুষ যদি কখনো পড়েন তো

মনে করবেন—ওর সময়ে পৃথিবীটাকে ও এইভাবে দেখতে পেয়েছে। এর বেশি আর কি আশা করতে পারি।

পৃথিবীতে এক এক সময় মনে হয়—কোনো ঘড়ি নেই, দিন নেই, নাম নেই, বন্ধু নেই, আত্মীয় নেই। এ কোথায় এসে পড়লাম আর কতদিন এখানে থাকতে হবে কে জানে। আবার নিশুতি রাতে ঝমঝম বৃষ্টির ভেতর মশারিতে আর কেউ নেই। সন্তানরা বড় হয়ে চলে গেছে। বৃষ্টির ধারায় পাশের পুকুরটাও মুছে গেছে। পুরনো ক্যালেন্ডারে বাদুলে পোকা বসলো থপ করে। বর্ষীয়সী স্ত্রী আত্মীয়বাড়ি বেড়াতে গিয়ে ফেরেন নি। তখন বিছানায় শুকনো কাঁথা জড়িয়ে টের পাওয়ার চেষ্টা করি—বিশ পঁচিশ বছর আগে সন্তানদের এ্যা-করা ভিজে গন্ধ কাঁথায় আছে কিনা। ভাবতে ভাবতে সেই কাঁথা জড়িয়েই ঘুমিয়ে পড়ি। ভাবি আর যেন বেঁচে না উঠি। একদম মরে যাই।—এসব কথা তো লিখতে পারি নি।

আবার ভাইবোন বন্ধুবান্ধব ছেলেমেয়েতে ভরা বারান্দা আনন্দে টলটল করছে। এক একটা কথায় হৃদয়ের ভেতরকার মানুষকে ছুঁয়ে থাকার মানুষী সুখ তিরতির করে বয়ে যায়। সবাই সবার ওমের ভেতর রয়েছি। পরদিন দুপুরে সেই বারান্দাই একটি ডেয়োপিঁপড়ে আড়াআড়ি একা পার হচ্ছে। কী শূন্য—একথা তো লিখতে পারি নি।

কত কথাই যে লেখা হয় নি। লিখতে পারিনি। চোখ খুলে যতটা দেখা যায়—তার চেয়ে বেশি দেখা যায় চোখ বুজে। আর যেটুকু দেখা যায় দেখার জিনিস তার চেয়ে অনেক বড়। যা দেখি—তারই বা কতটুকু তুলে ধরতে পারি। একজন লেখক সামাজিক রিপোর্টার হলেও শিল্পসম্মত তুলে ধরার একটা সীমা আছে।

কোথাও—দেখা-পথ হারায়। কোথাও—ভাষা পৌঁছতে পারে না।

এত অপটু, অশিক্ষিত লাগে নিজেকে। তারপর আছে গল্প হারিয়ে ফেলা। মানে গল্পের বীজ হারিয়ে ফেলা। একদিন একটা ডবলডেকারে এসপ্ল্যানেড যাচ্ছি। ফাঁকা বাস। একটা মিনিবাস এসে কম্পিটিশন বাধালো। রেগে গিয়ে ডবলডেকারের ড্রাইভার মিনিবাসটাকে ধাক্কা দিল। মিনিবাসটা চার চাকা শূন্যে তুলে বিড়লা তারামণ্ডলের কাছে উলটে গেল। ডবলডেকার বেআইনী-ভাবে চলতে চলতে নিষিদ্ধ পার্ক স্ট্রীটে ঢুকল। রাস্তার লোক চেঁচাচ্ছে—ড্রাইভার পাগল হয়ে গেছে। একটু স্পিড কমতেই আমি প্রাণ নিয়ে বাসটা থেকে টুক করে নেমে গেলাম। এ ঘটনা যতদূর জানি—একদিন মে জুন মাসে বেলা বারোটা নাগাদ আমার জীবনে ঘটেছিল। বছর দশেক আগে। কাউকে বললে বিশ্বাস করে না। সবাই বলে—আপনি হয়ত স্বপ্নে দেখেছেন। আমি বলতে চাই—না, স্বপ্নে নয়—স্বচক্ষে বেলা বারোটার সময় দেখেছি। এখন মনে

হয়—স্বপ্নে? হবেও বা! পার্ক স্ট্রীটে ঢুকে পড়ে টালমাটাল ডবলডেকারটা আরশোলা থ্যাতলানোর মতই প্রায় ফট্ মত শব্দ করে এক একটা অ্যামবাসাডর ফিয়েট গাড়িকে থেঁতলে ছিবড়ে করে দিচ্ছিল। হয়ত স্বপ্নেই দেখেছি। ওলটানো মিনিবাসের যাত্রীরা আশ্চর্যভাবে বেঁচে গিয়েছিল। আমি স্বচক্ষে দেখেছিলাম। এই স্বপ্ন ও জাগরণের দেখা—এ আমার প্রায়ই ঘটে। দুই দেখা গুলিয়ে গিয়ে এক আলো-আঁধারির সত্য তৈরি হয়। নানান গল্পে এ জিনিসটি এসে গেছে। আবার কোথাও বা হারিয়েও ফেলেছি। স্মৃতি গলে বেরিয়ে গেছে।

এইসব নিয়েই আমি এবং আমার লেখা।

॥ চৌদ্দ ॥

সেই নারীই প্রিয় হয়ে ওঠেন—যার জন্যে অপেক্ষা থাকে—থাকে সাধনা। যে সাধনার সঙ্গে মিশে থাকে আমাকে দিয়ে মানবজীবনের রহস্যের দুয়ার খুলে ফেলার দৈবী পাগলামি। এক নারীর জন্যে এই অপেক্ষা—তার জন্যে সাধনা—তাকে পাওয়ার পাগলামি যখন মানুষের রহস্যের দুয়ারে এনে আমাকে দাঁড় করিয়ে দেয়—তখন সেই নারীই হয়ে ওঠে সুন্দরবন, প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশ, সুদূর ছায়াপথে আলোকণার স্বেদ। সে তখন হাজরা পার্কে কর্পোরেশনের পাথরে বসে পাতাল রেলের হ্যালোজেন আলোয় আনমনা তাকালেও মনে হয়—না-জানি ওই দুটি চোখ কত জানে, কত ভাবে, কত বোঝে, কত অনুভবে কাঁপে তিরতির করে। সে যে তখন ভীষণ প্রিয়। মনে হয় ওর ভিতরে গেলে প্রথমে পড়বে বনপথ—তার শেষে পাহাড়ের সানুদেশ। যেখান থেকে আচমকা পা হড়কে গড়িয়ে গিয়ে আমি কয়েক শতাব্দী ধরে জমিয়ে রাখা মৃগনাভির এক গোপন গুদামে সেঁধিয়ে যাব! এইসব সময়েই সব ভুলে গিয়ে আমি খুব আহ্লাদে ভেড়া হয়ে যাই। ভেড়া হয়ে লিখতে থাকি।

শঙ্করাচার্য, বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণদেব, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, মাণিক, বিভূতিভূষণ এ ক'জন যে ক'বছর বেঁচেছেন তার থেকে বেশি আমার বাঁচা হয়ে গেছে। এঁদের নারী ছিল, কবিতা ছিল, ঈশ্বর ছিল, উপন্যাস ছিল। আমার কী আছে? আমার প্রিয় নারী আমার মা। তাঁকে আমি খুব কমবয়সে দেখেছি। আমার যখন চার বছর বয়স তাঁর তখন ৩২। যেমন গায়ের রঙ, তেমনি মাথা-ভর্তি চুল, হাসি-গায়ে নীলাম্বরী কাঁধের কোণে ব্লাউজের ফাঁপানো ঢেউ যেন পাখির ডানা। টেনিসনের কবিতার বঙ্গানুবাদ আবৃত্তি করতেন। ভদ্রমহিলার বিয়ে হয়েছিল এক তালুকদারের ছেলের সঙ্গে। তিনি সম্পর্কে আমার বাবা। তালুকদার মশাইয়ের অনেক গুণ ছিল। তাঁর নেশা ছিল যাত্রাদলে অভিনয়,

ঘন ঘন বিয়ে আর বৌমার হাতের রান্না। সেই বৌমাটি আমার মা। যিনি বরিশালের গ্রামের খালে গামছা দিয়ে চিংড়ি মাছ ধরে নারকেল ফাটিয়ে চিংড়ি মালাই রাঁধতেন। বছর দশেক বয়সে আমাদের ছোট মফঃস্বল শহরে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ নেমে এল, এল ঠিকাদার, ব্ল্যাকআউট। সেই সময় কলকাতা পালানো মানুষজন ছোট শহরে চলে আসতে লাগল। এরা দিনের বেলা পুকুরে সাঁতার শিখত, সন্ধ্যে হলে ছাদে শাড়ি টাঙিয়ে থিয়েটার করত। আমি আর ছোট ভাই থিয়েটারের জন্য টেবিল বেঞ্চ টানতাম।

সেই সময় কলকাতা থেকে আসা একটি ফ্রক পরা মেয়েকে মনে হয়েছিল পরী। সে ওই থিয়েটারে অভিনয় করত, তার ফ্রকে আঁকা ফুলগুলো মনে হত গায়ে আঁকা। ও পুকুরে গলাজলে নেমে বলত, 'এই খোকন, সাবানটা দে না।' দিতে গিয়ে হাত কেঁপে জলে পড়ে যেত সাবান। 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম'এর আংটিটি রুইমাছ গিলে ফেলেছিল আমি কিন্তু ডুব দিয়েই সাবান খুঁজে পেতাম। ভুশ করে ভেসে ওঠার মুখে জলের সঙ্গে মিশে থাকা ওকে দেখতে পেতাম। কোনও ভয় করত না, কেননা জল তো স্বাধীনতা।

মা থেকে এসেছিলাম পরীতে। দেশভাগের মুখে মুখে কৈশোরের শেষ দিকে এক কলেজে পড়া দিদি এলেন দিল্লী থেকে। মাসতুতো। কলকাতা ফিরে যাবার মুখে স্টেশনের লাল কাঁকরের ওপর তিনি নীল রঙের একটি সুগন্ধি রুমাল ফেলে যান। সেটি ইন্সট্রুমেন্ট বাক্সের ভেতর ১২ বছর সুগন্ধিই ছিল।

অনেক পরে আমি বিয়ে করি। তখনই স্ত্রীর সরু কোমরে গোঁজা রুমালটি মনে হয়েছিল কিছু ছোট। সেটি আসলে একজন ম্যাজিশিয়ানের রুমাল, কেননা ওই রুমাল দিয়ে আমার বউ আমাকে ত্রিশ বছর ভুলিয়ে রাখে। আমি বউকে বলেছিলাম, 'তুমি আমার গলা জড়িয়ে ধরে আমায় 'হ্যাঁগো', 'ওগো' ওসব বলো না কেন?' বউ বলেছিল, 'আমার ওসব আসে না।'

একটি মেয়ে এল বিয়ের ৩১ বছর পরে। সে এসেই গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'হ্যাঁগো', 'ওগো'।

আমি বললাম, 'তোমাদের ওসব আসে?'

সে বলল. 'আসে'। শুধু তাই নয় সে বলল, 'তোমার মতো আমি আর দেখিনি কো।'

এই 'কো' শুনে আমি জ্ঞান হারালাম। প্রায় ৩০/৩৫ বছর কেউ আর আমাকে নাম ধরে ডাকে না। কাকা-না হয় দাদা—কিম্বা জেঠু অথবা দাদু বলে সবাই। ও এসেই বলল—'শ্যামল, দেখে হাঁটো, আছাড় খাবে।'

শুধু শ্যামল বলায় এত ভাল লাগল কী বলব। আমিও তাকে বললাম, 'সাবধান।'

সে বলল, 'আমি কি খুব বেঁটে?'

আমি বললাম, 'না, মোটেই না।'

সে বলল, 'তোমার বউ কত লম্বা ?'

আমি দেখলাম, শান্তিকে লম্বা করার জন্য বউকে তো বেঁটে করা যাচ্ছে না। তাহলে প্রেমটা কোন্ দিকে ? ভাল লাগা কোন্ দিকে ? মুখে বললাম, 'তোমার হাঁটাটা কী সুন্দর ! ভি ডি ও ক্যামেরা থাকলে তুলে রাখতাম।'

সে বলল, 'আমি তো স্প্রিন্টার ছিলাম, ১০০ মিটার-এ ফার্স্ট হতাম। তাই আমার থাই মাস্‌ল অন্য মেয়েদের চেয়ে অনেক স্টাউট।'

কথা বলতে বলতে আমরা একটা রেস্তোরাঁয় বসলাম। ওর সর্দি হয়েছিল, নাকের ডগা লাল। কৈশোরের আতঙ্ক সেই একই একটি ছোট্ট লেডিজ রুমাল ৩০ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ভাঁজ করে এক অভিনব ভঙ্গিতে নাকের ডগা মুছতে লাগল। যতবার মোছে ততবার ভাল লাগে।

ভাল লাগার মেয়ে হাইটে কিছু যায় আসে না। গায়ের রং কিম্বা কানের দুল, কিংবা ম্যাচিং ব্লাউজ, কোনওটাই পৃথিবীর কোনও ছেলে খুঁজে দেখে না। দেখে যা, তা হল রসিকতা বোঝে কিনা, মাথায় জিজ্ঞাসা জাগাবার মতো কথা বলে কিনা। কথা বলতে বলতে নিজের বুকের দিকে তাকায় না তো ? হাঁটাটি ভাল হওয়া চাই। চা বোঝে। লেডিজ সিটের জন্য বাসে ছোটাছুটি করে না। কথা বলার সময় গলা যেন চিরে না যায়। গান না জানলেও পুরনো দিনের গান যেন ভালবাসে। গজদন্ত থাকলে খুবই ভাল। রান্নাটাকে সে যেন আবিষ্কারক এডিসনের দৃষ্টিতে দেখে। মাঝে মধ্যে ভীমসেন, বিলায়েৎ, বিসমিল্লা, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত শুনলে খুব খুশি হই। নিজের থেকে।

কলকাতার এত কাছে এত সুদূর সব জায়গা আছে তা না দেখলে—সেখানে না থাকলে বিশ্বাস হবে না। সব দেশেই সিমেন্টে বাঁধানো জায়গা কম। বেশির ভাগটা মাটি। তাতে গর্ত থাকে। গর্তে সাপ থাকে। গাছে আতা ঝোলে। বর্ষায় কচুপাতা অঝোরে ভেজে। ট্রেন-ফেল মানুষ কলকাতা না গিয়ে জুতোর দোকানের বেঞ্চে বসে দই-চিঁড়ের ফলার করে। অথচ দু-পা হেঁটে গেলেই বাড়ি। ধরা যাক—এমন একটা জায়গা, কলকাতা থেকে ইলেকট্রিক ট্রেনে চল্লিশ মিনিট। লেভেলক্রসিংয়ের একদিকটায় ফাঁড়ি, ডাক্তারখানা, কাপড়কল, ডাকঘর, ছবিঘর, বাঁধাইখানা। আরেকদিকটায় গমকল, ধানের গোলা. খাল, কাঠের পোল, ইরিগেশনের বাঁধ।

দুটো দিকই কিন্তু খানিক এগিয়ে বড় বড় ধানকাটা মাঠের ভেতর হারিয়ে বসে আছে। সেখানে দিগন্তে সেই বনরাজিমালা—আসলে তাল নারকেলের মাথায় মেঘের পটি দেওয়া আকাশ। তার নিচে মাটির ঘর, খড়ের চাল। সে চালে হলুদ রংয়ের বুড়ো লাউ। বিচি রাখার জন্যে কাটা হয় নি। খোল দিয়ে গুবগুবি হবে।

এখানে হাসপাতালের নাম কলেজ। হাতুড়ে ডাক্তারের নাম বদ্যি। দুর্গাপুজোর নাম বড় পুজো। গোহালে খয়াটে গাই। এঁড়ে বেশি। বাড়ির বউরা আর গাই সমানে পোয়াতি হয়। লোক বাড়ছে। গরু-বাছুর বাড়ছে। মাঠে ঘাস কম। ধান কম। গাদ সমেত তেলো তাড়ি খেয়ে তিরিশ বছরের জোয়ানের চেহারা পাকিয়ে যাচ্ছে। লিভার জখম। কাজ নেই। জমি নেই। উৎসব বলতে পঞ্চানন-তলায় বোশেখ মাস জুড়ে হরিনাম।

অথচ চাহিদা সামান্য। খাটতে চাই। বর্ষা চাই। দুটো ধানচারা রুইতে চাই। গাইটা বাচ্চা দিয়ে দুধ দিক। পুকুরের মাছ বাড়ুক। বেগুনে যেন পোকা না লাগে। কেরাচিন না হলেও আপত্তি নেই। ক-ফোঁটা সর্ষের তেল খুব জরুরী। সরকার বাহাদুর একটা মিষ্টি জলের টিউকল বসিয়ে দিন। বাঁধের নোনা মাটি জল মিশিয়ে ফোটালেই নুন পাওয়া যাবে হাড়ির তলানিতে। দৃশ্য বলতে চলে-যাওয়া ট্রেনের লেজ। আর আড়ে-বহরে এলানো মাঠের ওপর দিয়ে আগুপিছু দৌড়ন্ত বৃষ্টির কায়দাকান্ড।

জুতোপায়ে বাবুরা শহরে গিয়ে চাকরির ক্যাশ নিয়ে ফেরে। ভাগচাষীর কাছ থেকে ভাগের ধান পায়। ভালো ডাক্তার স্কুটার চড়ে। নিরাপদে বিয়োনোর চুক্তিতে তুখোড় কম্পাউন্ডার লেবার কেসের কলে যায়। বিয়ের বর মোজাপায়ে পাম্পসু গলায়। সারা স্টেশনের রিক্সা সাইকেল সেদিন তার ভাড়ায়। পঞ্চানন অপেরার বাজনদাররা দ্বিরাগমন অব্দি দম্পতির পেছনে নাছোড়। ভালোমন্দ দুটো খেতে পাবে বলে।

পাতাল রেল, কমপিউটর, সত্যান্বেধ অভিযান ইত্যাদির পনের মাইলের ভেতর এই আমাদের প্রাচীন মাটির ব্যাকরণ এবং ছন্দ। রবীন্দ্রনাথের নাম কেউ শোনে নি। রামকৃষ্ণদেবের কথা যাত্রায় আর ধান উঠলে সিনেমায় গিয়ে জেনেছে। অনেকেই ভিটের ভেতর মৃত্যুকে পোষে। বিষধরকে বড় একটা ঘাঁটায় না।

এখানেই খগেনকে দেখে অবাক হয়েছিলাম। গায়ের রং ফর্সা। তখন গাঁয়ে টিউবওয়েল বসাচ্ছি। হাতে পয়সা নেই। পুরনো টিউবওয়েল তুলে বসিয়ে দিচ্ছিলাম। ফিলটার চাঁদা করে কিনে নিয়ে। জল নোনা। বার বার একটা লেয়ারে এতো বালি যে ফিলটার জখম। রাজনৈতিক দল বললো, শ্যামল বাঙাল ভোটে দাঁড়াবে।

বললাম, এটা তো রিজার্ভ সিট। গাঙ্গুলী দাঁড়াতে পারে না।

ওরা বললো, দিল্লীর জন্য দাঁড়াবেন নিশ্চয়।

অত টাকা থাকলে তো মিষ্টি জলের ১২০০ ফুট টিউবওয়েল বসাতাম।

তাহলে আপনি সি. আই. এ.!

ভালো কথা। তাহলে তোমরা টিউকল বসাও।

সে আমরা বুঝবো। টিউকল বসানোয় আপনার স্বার্থ কি?

আমার ভালো লাগে।

নিশ্চয় কোনো মতলব আছে।

চুপ করে রইলাম। গাঁয়ে যাদের কিছু নেই তারাই আমার সমর্থক। তারাই খগেনকে এগিয়ে দিল। এ সত্যবাদী লোক। রাতে পাইপ পাহারা দেবে।

তখন এক দঙ্গল ভাগচাষী আর ক্ষেতমজুরের সঙ্গে উঠি বসি। ঘড়িচাঁদ, ভবেন, শরৎ, পালান, পঞ্চানন, হাজরা, বেচো, ঘটি, নাদু, বজরা, কালো—আরও কত নাম। এদের না আছে গায়ে দেওয়ার জামা, না আছে পয়সা। একসঙ্গে বসে চিঁতি কাঁকড়া ভাজা, তাড়ি, মুড়ি, জিলিপি, ওলের ডালনা খাই। ক্ল্যারিওনেটের পাশে বসে যাত্রা দেখি। পাতলা পায়খানা হয়। খুকির মা বলে, সাবান দিতে পারো না গায়ে? একদম বাঘের গন্ধ বেরোচ্ছে!

সাবান তো মাখি।

এই মাথার ছিরি! শার্টের কলারের অবস্থা দ্যাখো। শুধু ময়লা বেরোয়।

কি আর করা! আমার সঙ্গী-সাথীরা তো দাঁতই মাজে না। চুলদাড়ি কাটার রেওয়াজ কম। হাতেপায়ে বাঘের নখ। আমি তবু নখ, চুলদাড়ি কাটি। দু-তিন দিনে একবার দাঁত মাজি। আর ওদের সঙ্গে জলে ঝাঁপাই। ফলা ধানের মাঠ দেখতে বারো মাইল হাঁটি। পয়োস্তি চর জমি কেমন—তাই দেখতে আকাশতলায় হাঁটতে হাঁটতে দিগন্তকে শুধুই পিছিয়ে দিই। চাকবেড়ে গাঁয়ে বর্ষা হচ্ছে। গাবতলায় এক বুড়ো পচা মাদুরের ওপর কাদায় মাখামাখি। বাড়ির লোকজন চেঁচিয়ে বলল, ওদিকে যাবেন না বাঙালমশাই।

তোমাদেরই চাচা! ভিজে-ভিজে মরে যাবে?

তুলে এনে লাভ নেই। ক্ষয়কাশে শেষ অবস্থা। এ বিষ্টিতে যদি এন্তেকাল ঘনায়ে আসে—

এরকম এক মহাভারতে দেখি। পরদিন সকালে একজন মেয়েমানুষ প্রকাশ্য রাস্তায় দুধভর্তি কেঁড়েতে পাম্প করে টিউকলের জল মেশাচ্ছে। সে আবার গর্ব করে বলল, আমি মাসকাবারী খদ্দেরদের দুধে পরিষ্কার জল ছাড়া মিশোই নে—

এই হলো গিয়ে খগেনের বউ। হাজরা বজরা ঘটির মা।

একদিন হাঁটতে হাঁটতে খগেনের বাড়ি গেলাম। আমাদের বাড়ির পরে দ্বারিক-পোতার চারশো বিঘের মাঠ। তারপর মিস্ত্রিপাড়া। জ্ঞানো মিস্ত্রি। জিতেন মিস্ত্রি। মান্য মিস্ত্রি। কেউ গণকমিটির প্রেসিডেন। সপ্তাহে চার বস্তা চিনি ব্ল্যাক করে। মিষ্টির দোকানে সবচেয়ে ছোট রসগোল্লা চার আনা পিস বিক্রি করে। কেউ তালের মোচ কেটে রস পাড়ে। আর জাল বোনে। কেউবা সন্ধ্যেরাতে হেরিকেন জেবলে বন্দুক নিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে। পাশে পাঁচ ব্যাটারির টর্চ। যদি ডাকাত আসে। ঘুমোয় দিনে দিনে।

এখানেই খগেনদের বাড়ি। কমন উঠোন। সবাই আলাদা। ঘটি শুধু খগেন

আর বেম্পতির ভাগে। হাজরা সপরিবারে একখানা ভাঙা ঘরে থাকে। পাশের ঘরখানায় বজরা একা। তার বউ সম্প্রতি আত্মঘাতী। চোখ কটা। চেহারায় একটা দুর্বিনীত ফর্সা ভাব। ঠোঁটে চাপা হাসি। গায়ে শহুরে শার্ট। ঠুগনী ঠুকে বিড়ি ধরায়। কব্জিতে হাতঘড়ি কখনো থাকে—কখনো থাকে না। ঘরের ছইয়ে পাইপগান গোঁজা। পায়ে রবারসোল বুট। তাতে জিভ ওলটানো। ফিতে নেই। ফিতের বদলে পাতায় নীল রঙের মোটা রগ সব সময় জাগন্ত। বাবুদের সঙ্গে ওঠে বসে। ব্যাপারীদের সঙ্গে হাসে কাশে। ফাঁড়ির সেপাইদের মুখে পড়ে গেলে বজরা হাত তুলে নমস্কার করে। সর্ষের ঘানিতে হাফশিশি ফ্রি পায়। বড় ভাই হাজরার দিকে ক্ষ্যামাঘেন্না করে তাকায়।

খগেন বাড়ি ছিল। সে দু-হাত ধরে খেজুরপাতার খোলপেতে এনে বসালো। বড় কাঁধ। ফতুয়া ঢাকা গা। পায়ের পাতা বাঁকা। একথা-সেকথা হল। বেশির ভাগ কথায় ফিক ফিক হাসে। আমার চেয়ে তা বছর আঠারো-কুড়ির বড় হবে। শোনে বেশি। বলে কম। তবু তারই ভেতর বলে দিল, বাতাসের ভিতরি আরেক রকম বাতাস থাকে। আলোর ভিতরি আরেক রকম আলো।

এ-বাতাস এ-আলো তখনো আমি চিনি নে। দেখিও নি তখনো। বললাম, সংসার নিয়ে তো তোমার কোনো ভাবনা নেই খগেন। [আমি বাবু-ক্লাসের লোক। তাই আমি বয়স্ক খগেনকে তুমি বলতে পারি। ওর কিন্তু আমাকে আপনি বলতে হচ্ছিল। অবিশ্যি ওর বড় ছেলে হাজরা আমার বয়সী কিংবা সামান্য বড়। সে ভালোবেসে আমায় কখনো কখনো তাড়ির ঝোঁকে তুমি বলে থাকে।]

একদম নেই। আমি তো ঝাড়া হাত-পা।

কেন ঘটি? তোমার বউ?

ঘটিটার জান্য কষ্ট হয় বাবু। ও এখনো বালক। বাকি সব তো প্রেথক।

তার মানে?

হাজরা আলাদা। বজরা আলাদা। ওদের মা আলাদা। আমি আলাদা।

আলাদা বাড়ী?

সব আলাদা বাবু। শুধু ঘটিটা কখনো আমার সঙ্গে খায়। কখনো ওর মায়ের সঙ্গে খায়। আর আমি তো গাছের রস ফলপাকুড়টা দিয়ে পেট ভরাই। একটা শোলমাছ ধরলাম খালে। সেটারে পোড়ায়ে খেলাম। হলুদ লঙ্কা ডলে। বেশ খেতি।

আমি খাইনি কোন দিন।

খাবেন তো পোড়াই একদিন!

চুপ করে আছি। গাছের রস মানে তাল আর খেজুর রস। ফলপাকুড় মানে বুনো আতা। গাছেই পেকে ঝুলে থাকে। বাদুড়ে খায় আর খগেন খায়। ভেতরটা মিষ্টি-টক-বালি। অনেকে বলে নোনা।

কোনো কাজ করো না খগেন ?

কে দেবে ? আমার পা যে বাঁকা। ভালো করে র‍ুইতি পারি নে।

ও। তাহলে চলে কিসে তোমার ? ওদের গর্ভধারিণীর টাকায় ?

সেখানে হাত দিই নি কোনোদিন। বেস্পতি টাকা জমায়। নতুন গাই কিনবে। আমি সূর্যকিরণ চন্দ্রাকিরণ গায়ে লাগাই।

তাতে তো পেট ভরে না খগেন।

এই আপনাদের মতো লোক বিশ্বেস করে ডেকে নে যান। টিউকল পাহারা দিই। ভিয়েনে বসে চিনি-ছানায় নজর রাখি।

দ্বারিকপোতার মাঠ অব্দি পেঁছে দিতে হাজরা এগিয়ে এলো। খগেনদের পুকুরপাড়েই মাটির দেওয়াল-ঘেরা একখানা বড় উঠোনের মেঠো বাড়ি।

ভাঙনদশা। কে থাকে গো ?

কেউ না। এটাও আমাদের বাড়ি।

দুখানা বসতবাড়ি ?

না। মাইতিমাসি এটা বাবারে দিয়ে যায়।

তোমরা থাকো না ?

মা থাকতে দেয় নি।

পরে একটু একটু করে যা কানে এলো—খগেনের যুবা বয়সে, নিঃসন্তান অল্পবয়সী মাইতি-বেধবা খগেনকে ভালোবেসে এ বাড়িটা দান করে যায়। দান করেছিল—আরও কিছু জায়গাজমি। ভাগচাষীরা সে জমিতে খগেনকে উঠতে দেয় নি। ও বাড়িতে খগেনকে ঢুকতে দেয় নি বেস্পতি।

একদিন সন্ধেরাতে—বৈশাখ মাসের পুর্ণিমাই হবে—জ্যোৎস্নায় সব ভেসে যাচ্ছিল—খালের জল ছেঁচা হচ্ছে। ঘাপটি-মারা মাছগুলো আটল পেতে ধরা হচ্ছিল। খগেন অন্ধকারে আটলে হাত গলিয়ে মাছ ভেবে যাঁকে বের করে আনলো তিনি আসলে মাছখোর একটি মাদি কেউটে। জ্যোৎস্নার ভেতর ঝাঁকুনি দিয়ে অসাড় সাপটাকে খগেন সিমেন্ট বাঁধানো বারান্দায় ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে বাতাস আঁশটে গন্ধে ভরে গেল। আমাদের বাড়ির ছোট বউমা খেতে বসেছিলেন। তিনি চেঁচিয়ে উঠে বললেন, কী ঘেন্না! এক্ষুনি নিয়ে যাও!

খগেন অপরাধীর ভঙ্গিতে সেটাকে কুড়িয়ে নিল। মন্দাটাও ধরা দেবে—

ওরা কথা বলতে বলতে জ্যোৎস্না ধরে খালপাড়ে উঠে গেল। কথার টুকরোয় বোঝা গেল, সাপটার দাম কত হতে পারে তাই নিয়ে কথা হচ্ছে। বিষের দাম। চামড়ার দাম। জ্যান্ত বিক্রি করলে কত দাম। খগেনের মুখে কোন কথা নেই। সবাই যেন মানিক কুড়িয়ে পেয়েছে।

বাঁধে উঠে আবছা আলোয় খগেন নস্কর হাতের লতাটাকে আরেক ঝাঁকুনি দিয়ে

খালের ওপারে ছুঁড়ে দিল। বুঝলাম, মন্দাটাকে ধরার ইচ্ছে নেই খগেনের। অন্ধকারে আছাড় খেয়ে মেছুনী আবার কোমরে জোর ফিরে পাবে। পেয়েই আবার খালের জলে নামবে। এখন সেখানে হাঁটুজলে মাছ খলখল করে। তাতে গোড়ালি টিপে টিপে খগেনরা গুলেমাছ ধরছে।

স্কুল কোড্ বিল নিয়ে মিছিল করার জন্যে শ্যামাপ্রসাদের কলেজ ফোর্থ ইয়ারে টেস্টের সময় ডিসকলেজিয়েট করে দিয়েছিল। শ্যামাপ্রসাদ ছিলেন সম্ভবত ওই বিলের প্রণেতা। কিংবা বোর্ডের সভাপতি। ঠিক মনে নেই। চাকরি খুঁজছি। এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। সেই সময় পরাগদা—পরাগ চট্টোপাধ্যায় (বেদ নিয়ে বই লেখেন, আমাদের লেখালেখির শ্রোতা ও উৎসাহদাতা) তন্ত্র সাধনায় মাতেন। খ-পুষ্প ব-পুষ্প তাঁরই মুখে শুনি প্রথম। রাস্তায় এক রাজজ্যোতিষের সাইনবোর্ড দেখে ভেতরে ঢুকলাম। সেখানে সুগন্ধী এক ভদ্রলোক—খালি গা, পরণে ফিনফিনে ধুতি—পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ হবেন। বললেন, আজ রাতে আমার সঙ্গে ইছাপুর শ্মশানে দেখা করুন। একটা বস্তা হাতে নিয়ে যাবেন।

শেয়ালদা থেকে লাস্ট ট্রেনে গিয়ে হাজির। হাতে বস্তা। শ্মশানে তখন গোটা দুই চিতা নিভু-নিভু। শ্মশানবন্ধুরা ঢুলছে। ভদ্রলোককে পেয়ে গেলাম। অন্ধকারের ভেতর একটা ফাঁকা চিতায় দড়ির খাটিয়ায় শয়ান। কাছে যেতেই নাম ধরে ডাকলেন।

সেখানেই থেকে গেলাম তিন সপ্তাহ। দুর্গন্ধ ভৈরবী. নদীর জল ফুটিয়ে চা আর অবরে-সবরে মাঝনদীতে ভাড়ার পানসীতে বসে গুরুদেবের শ্যামাসঙ্গীত। ফুরফুরে বাতাসে সে-গান ভাসে। শেষদিকে আমিও গুরুদেবের হাতের তুড়িতে পায়রা নামাতে দেখি। বটের ঝুরি সাপ হয়ে যায়। ভালো বাংলায় ভৈরবী আমায় আকর্ষণ করে। সায়া সেমিজের তো বালাই ছিল না। আর নদীতে সে কি বাতাস! ঘটিগুলোয় জল ভরে রাখতে হতো। নয়তো জায়গা নড়ে যেত।

তো খগেনের কথায় ফিরে আসি। ফণিমনসা একা-একা ফাঁকা টিলায় বৃষ্টিতে ভেজে। তারই গায়ে আকাশ ভেঙে বাজ পড়ে। লোকে তাই ফণিমনসাকে বাজবরণ বলে ডাকে। এই বাজবরণের আঠা পাহারাদার কুকুরকে খাইয়ে দিয়ে চোর-ডাকাত কুকুরের পেট পচিয়ে দেয়—তাকে বোবা বানিয়ে ফেলে। সে বোবার কাটান দিয়ে দিতো খগেন। শেকড়বাকড়ের গুণে। কুকুর আবার ভুগ্-ভুগ্ করে ডেকে উঠতো।

লোকে যে বদমাইসি করতো—তাতেও সরল বুদ্ধির ছিটে লেগে থাকে। স্বর্গের আগের স্টেশনে একদম কাঠ হারামজাদা খুঁজে পাওয়া কঠিন। হৃদয়ের চেম্বারে রক্ত যদি আবেগে বা রাগে গাঢ় হতে চায় তবেই মুশকিল। সে রক্ত

পাম্প করা যায় না। হৃদ্‌রোগ দেখা দেয়। সেজন্যে রক্তকে মাত্রা বেঁধে তরল রাখতে হয়। এই তরল রাখা ওষুধের নাম ডিন্ডিভেন। ডিন্ডিভেন তৈরিতে চাই গোখরোর বিষ। রক্ত জল হয়ে যাওয়াই তো সাপে কাটা রুগীর আসল প্রবলেম।

খগেন কাজ পায় না। তবু বেস্পতির দুধ বেচা টাকায় ভাত খাবে না। বজরার ওয়াগন ভাঙার পয়সায় ওষুধ খাবে না। এক যদি হাজরা তার ব্যাঙ বেচা পয়সায় কিছু দেয় তা নেবে। তাতেও আপত্তি। জগতের ব্যাঙ সাবাড় করে দিলি!

বলেছিলাম, মানুষের কাজে সাপের বিষ লাগে। সাপ ধরে বিষ বেচে দাও। বিষ গালাতে জানো তো?

তা জানি। কিন্তু অমন ধারায় ওদের সব ধরে ধরে অপমান করা কি ভালো?

তাহলে তো হাত পা গুটিয়ে উইয়ের ঢিবি হয়ে থাকতে হয় খগেন। আর শুধু ধ্যান করা ছাড়া পথ থাকে না।

আমাদেরও তো বিষ আছে। আপনারে আমারে ধরে ধরে যদি পুর্ণিমে অমাবস্যেয় বিষ ঢালায় তো ভালো লাগবে?

আমরা তো আর সাপ নই খগেন!

গোখরো চন্দ্রবোড়ার কাছে তো আমরাও এক ধাঁচার সাপ!

এ লোককে বুঝিয়ে লাভ নেই! কপালে কষ্ট আছে। এখানকার ছবিঘর, ডাকঘর, স্টেশনঘরের মাথায় এক প্রকারের মায়া আছে। তাতে দুঃখী লোক সুখী হয়ে যায়। গরু হয় ছাগল। চোর হয় সাধু। সেই আকাশের সাদা কাজল এই মহাভারতের মানুষজন যুগ যুগ ধরে চোখে দিয়ে আসছে। খগেনও দেয়। তাই কোনো কষ্টই ওর কষ্ট নয়। ঠিক থাকার জেদে—সঠিক থাকার স্বাদে—আমরা যাকে বলি মানুষ হয়ে ওঠার সংকল্পে কোনরকম নাটকীয় ঘোষণা ছাড়াই এসব মানুষ দিনে দিনে নিঃশব্দে পালটাতে থাকে। খগেনও পালটাচ্ছিল। বেঁচে থাকার জন্যে আমি ওকে হাবা গোসাপ ধরে চামড়া চালান দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলাম। তাতে ও বললো, ও কাজটা লুভী লোকের। শেষে কি কোনোদিন মাটি চালান দেওয়ার কাজে নেমে দুনিয়াটা রসাতলে দেবো!

অ্যাতো যার আপ্তজ্ঞান তার মেজো ছেলে ওয়াগন-ব্রেকার। বউ দুধে জল মেশায়। তবে পরিষ্কার জল। বড় ছেলে হাবা। অপদার্থ। হাজরা নস্কর তাই ব্যাঙ ধরে ধরে বেচে দেয়। ঘটি রস চুরি করে খায়। ভাগ্যিস বুদ্ধ থেকে মার্কস্ সবাই-ই মনুষ্যত্বের চেয়ে বয়সে ছোট। আর মনুষ্যত্বই আমাদের বড়দা বলে খগেন নস্করের মতো মানুষ এখানে-সেখানে থেকে যায়। আমি লক্ষ্য করছিলাম—খগেনের জীবনে ইচ্ছে কমে আসছে। 'রথের রশি' নাটকে রবীন্দ্রনাথ

গৃহাবাসী ইচ্ছাহীন সাধুর একটা দিক নিয়ে রসজ্ঞ মানুষের কটাক্ষ করেছেন। এ খগেন সেরকম নয়। তার আর ইচ্ছে নেই। সে তার বুদ্ধিকে কোনদিন উসকে দিয়ে ব্যায়াম করায় নি। তাই সবকিছু সে তলিয়েও বোঝে না। মৃত্যুর আগে আগে আমায় বলেছিল—আকাশ থেকে আকাশ তার শরীর অব্দি নেমে এসেছে। আকাশ এত দয়ালু। তাকে আর কষ্ট করে ওপরের আকাশে উঠতে হবে না। নেমে-আসা আকাশেই সে মিশে যাবে।

মরেছিল অবশ্য এই সাধারণ আমাদের মতো। দম ফুরিয়ে। আকাশের সঙ্গে মেশামিশি তো এ চোখে দেখা যায় না।

তার ওয়াগন-ব্রেকার পুত্র কাছারিবাজারের কু-পল্লীর খদ্দের। আলিপুরে মামলার আসামী। তার বউ আলুর চপে ফলিডল ঢেলে আত্মঘাতী। তবু সে টেরি বাগায়। তার আসক্তির আর শেষ নেই।

এরকম সময় আমিও কিছুদিন কাজের ইচ্ছে হারিয়ে বসি। আমার বাড়ির উল্টোদিকে যুদ্ধের সময় ইঁটখোলা হয়েছিল। তাতে এখনো যমজ ঝামার পাহাড়। সে পাহাড় থেকে বিকেলবেলা হয়তো কোনো প্রবীণ চার্বওয়ালা চন্দ্রবোড়া হাওয়া খেতে বেরোলেন। চোখে কম দেখেন। স্মৃতিতে কয়লার ইঞ্জিনের কু-ঝিক-ঝিক এখনো টাটকা। মাথাখানা বিশাল। তাই দেখে বেজিদের কুচোকাঁচা ছানাপোনা এদিক ওদিক দৌড়ে পালিয়েছে। দৌড়নোর সময় একখানা ঝামা ইঁট সরে গিয়ে চাঁদবুড়োর মাথায় পড়লো। শরীরটা ভার। মাথায় আরও ভার। ভেবেছিল সামনের পূর্ণিমায় বুনো আতাগাছের গোড়ায় দংশাবে। তাহলে বিষ ঝরে গিয়ে মাথাটা হালকা হবে। বিষ হলো গিয়ে সর্পজাতির সম্ভ্রম। মস্তকের মুকুট। ও কি যখন-তখন যেখানে-সেখানে ঢালা যায়! না উচিত? সুন্দর পৃথিবী মানুষ নামে সাপে ভরে গেল।

ফেলা আর হয়নি। ইঁটের চাপে মাথাটি থেঁতলে চাঁদবুড়ো ওখানটায় মরে রইলো। তার গায়ের মাংসে বেজিদের পিকনিক! তারপর বর্ষার এক শুকনো বিকেলে দেখা গেল—শুধু মাথাটা রয়েছে। বর্ষার জলে ধুয়ে ধুয়ে সাদা। একদিন শীতের সন্ধ্যায় খেয়াল হলো—সামান্য শুকনো মুণ্ডুটার গর্ত দিয়ে আকাশের ভারি নীল গল-গল করে বয়ে যাচ্ছে। এইভাবেই আকাশ একদিন নেমে আসে। এর ভেতরেও ফুর্তিবাজ বেজিগুলো হালকা পায়ে দৌড়োদৌড়ি করে।

নতুন বসতির নতুন বউটি বিকেলের পুকুরে কড়াই নিয়ে মাজতে বসেছে। আজই সন্ধ্যেবেলা ঠাকুরজামাই আসবেন। বড় রসিক মানুষটি।

আসলে দুনিয়া তো কখনো রেস্ট নেয় না। আমরা তার সঙ্গে দৌড়চ্ছি। দম ফুরোলে বসে পড়ছি। আসক্তি না থাকলে এই দৌড় অনেক আগে থেমে যায়। তখনই আকাশের সাদা কাজল চোখে দেখা যায়। কিন্তু জায়গাটা ভোগবাসনার। অভাব-দুঃখের। সুখ-আহ্লাদের। ঠগানো-ভোগানোর।

দুনিয়া দৌড়চ্ছে। আর তার জানলায় বসে এসব দেখা যাচ্ছে। কেউ বলে জীবন দ্যাখো। ভালোবাসা দ্যাখো। উল্টো বেঞ্চে আরেকজন বসে টিটকিরি দিচ্ছে—ন্যাকামি দ্যাখো। ফক্কা দ্যাখো।

এরকম দুই ভাবনা দুটো নদী হয়ে ছুটে এসে কাছাকাছি হয়। তারপর কোনদিন না খেলার দুই পথে চলে যায়। আমরা রং মেলান্তি খেলতে বসে ওদের মেলাতে চাই। না মেলাতে পেরে দুঃখ পাই। এই দুঃখে খানিকটা ভাষা, খানিকটা রহস্য, দেড়শো গ্রাম জীবন ভালো করে থেঁতলে নিয়ে চ্যাপ্টারে ভাগ করে সাজিয়ে দিলেই উপন্যাস। লোকে পড়তে বসে বই বন্ধ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। যদি আকাশের নেমে-আসা চোখে দেখা যায়। কিন্তু সাদা কাজল চোখে না টানলে তো দেখা যাবে না !

এই কাজল খগেনের চোখে ছিল। তাই মাইতি-বেধবার কথা নিয়ে সে কোনোদিন বাড়াবাড়ি করে নি। ইচ্ছে মরে গিয়ে সে কোনো বড় বাণী দেয় নি। শোষণ, অভাব, খিদে, লড়াই তো সম্রাট অশোকেরও আগের আমলের জিনিস। মানুষের ইতিহাসের নিত্যসঙ্গী। তাকে বাদ দিয়ে খগেন চলতে চায় নি। তাকে নিয়েও পড়ে থাকতে চায় নি। বরং জীবন-রহস্যে কে যেন আসে নি—এই কথাটা জানতে পেরে মাদী কেউটেকে ছেড়ে দেয়।

আমারও বোধহয় ইচ্ছে মরে গিয়ে স্বর্গের আগের স্টেশনের সঙ্গে দেখা—আর এই নিয়ে লেখা।

॥ পনের ॥

কবে যে প্রথম অপমানিত হয়ে মনে মনে চুপ করে যেতে শিখেছিলাম—তা এখন আর মনে নেই। তেমনি অনেক আশা করে একদম কিছু না পেতেও আস্তে আস্তে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম। আঠারো উনিশ বছর বয়সেই আমার নিজের মুখ আমি নিজেই দেখতে পেতাম। কোনও আয়না লাগত না ! কারণ সে মুখ আমি জানি তখন।

সে-সময় জেদ নামে একটি মদে আমার ভীষণ নেশা ছিল। জানতাম, লিখতে জানি না। বানান জানি না। ইতিহাস, ভূগোল জানি না। তবু নতুন নতুন অপমান এবং নতুন নতুন নৈরাশ্যের কারণ ঘটিয়ে একখানা কোদাল হাতে সে অন্ধকারে ড্রেন কাটতে নেমে পড়তাম ! অনেক খোঁড়াখুঁড়ির পর একটু-খানি পথ পেতাম কি পেতাম না !

স্কুলে পড়ার সময় মিত্রপক্ষ, শত্রুপক্ষ দুটো কথা শিখেছিলাম। আর সৈন্য বোঝাই দশ-চাকার লরি দেখেছিলাম। দশ আনায় যুদ্ধের গ্যাস মুখোশ নীলামে বিক্রি হতো দেশবিভাগ এলো ক্লাস টেনে।

তারপর ট্রেনে একদিন কলকাতা। মিছিল। গুলি। ছাত্র-রাজনীতি। কলেজ থেকে বিতাড়িত। কোনোটাই মনে বিশেষ দাগ কাটলো না। দাগ কাটলো ইস্পাত কারখানায় কাজ করতে গিয়ে সেখানকার শীতের রাতের শীত, মজুরি এবং মুনাফা।

এই সময় সেনেট হলে একটি কবি সম্মেলন হয়। তাতে আমাদের বয়সী অনেকে কবিতা পড়ল। তারা ধুতি-পাঞ্জাবি বা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে। একে অন্যকে আপনি,—বাবু বলে ডাকে। একসঙ্গে কথা বলতে হলে চায়ের দোকানে গিয়ে বসে। সিগারেট ধরায়, পকেট থেকে কবিতা বের করে।

এদের দেখা পাবার জন্যে মর্নিং শিফটের পর হাওড়া লাইনের সেই কারখানা থেকে কলেজ স্ট্রীটে যেতাম। ওদের সঙ্গে বসে আত্মীয়তা বোধ করতাম। যদিও এখন জানি—কোন কারণেই আত্মীয়তা বোধ করে পুলকিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু তবু হতাম। যদিও কোনদিন একটি কবিতাও লিখিনি।

দেশবিভাগের মুখে মুখে কলকাতায় এসে অনেক জিনিস দেখেছিলাম। যেমন ঃ পুকুর, যৌথ পরিবার, পাড়াতুতো দাদা, শবযাত্রী (এখনকার মত তারা এত মদ খেত না) এবং পারস্পরিক সম্প্রীতি। মানে বলতে চাই, একজনকে না দেখলে আরেকজনের ঘুম হতো না।

এই সময় একটা দুটো লেখা ছাপা হতে থাকে। তার চেয়ে বেশি অমনোনীত হতে থাকে। তারও চেয়ে বেশি হারাতে থাকে। তখন কিন্তু সেগুলো সবই নয়নের মণি। এখন জানি, আজ যা মণি, কাল তা ঘুঁটে। কেননা সাহিত্যে রথী এবং মহারথী—দুটিই আসলে বিজ্ঞাপনের ভাষা মাত্র। কলকাতার একটি বিখ্যাত মিষ্টির দোকান একদা তাদের বিজ্ঞাপনে সাহিত্যিকদের 'মনীষী' করেছিল।

ট্রাম লাইনের ওপর দোতলায় ফ্ল্যাটবাড়ি। পুব পশ্চিম খোলা। বেলা দুটো আড়াইটেয় লিখতে বসলে গরমকালে একরকমের রাগী রোদ্দুর পিঠে এসে পড়ত। তাতে জেদ আরও বাড়ত। আরও লিখতাম। লিখে সারাদিন পরে বুঝতাম—কিছুই হয়নি। তবু লিখতাম। জেদে দুই চোয়ালের নিচে কষ জমছে টের পেতাম। কার ওপর রাগ? কার জন্যে ক্ষমা? কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না!

দু-একখানা বই ভীষণ ভাল লাগতে লাগল। দু-একটা গল্প। একটি দুটি ঘটনা। দুটি একটি মানুষ। একবার জ্বর থেকে উঠে আন্দাজে খাতায় কাটাকুটি করতে করতে লিখতে লাগলাম। খানিক পরে দেখি—আমি জানি না এমন সব জিনিস লিখছি। কতকগুলো চরিত্র নিজেরা বানিয়ে বানিয়ে কথাও বলছে। খেলাটা মন্দ না তো!

এরকমভাবে শেষ করা প্রথম লেখাটি পরে ছাপা হয়েছিল। খুবই সাধারণ

লেখা। কিন্তু লিখে ফেলে অবাক হয়েছিলাম। জানতে পেরেছিলাম—ও! তাহলে এইভাবে লেখে?

দেশ-বিভাগের দিনেও বুঝতে পারিনি—আমাদের সাজানো বাড়ি, সুন্দর সম্পর্কগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রথম দর্শনে কলকাতাকে বড় নিষ্ঠুর লেগেছিল। ভাবতেই পারিনি—পরে এমনভাবে কলকাতার প্রেমে পড়ব। এখন জানি—যদি কোথাও কিছু হয়ে থাকি—তার মূলে কলকাতা। এতবড় শিক্ষয়িত্রী খুব কম দেখা যায়।

একজন লোক তখনই লেখে—যখন লিখতে বসে তার বিশ্বাস হয়—এমন জিনিসটি আগে আর কেউ লেখেনি। পরে হয়ত সে বিশ্বাস ভুলও প্রমাণিত হয়। কিন্তু লেখার সময় ওই বিশ্বাসটুকু চাই-ই চাই। নয়ত লেখা যায় না।

কিন্তু আমার তো তেমন কোন বিশ্বাস ছিল না। থাকবার কথাও নয়। কারণ সত্যিই দাবি করবার মত আমি তো তেমন কোন জিনিসই জানি না।

সেই সময় একটি জিনিস আমাকে সাহায্য করেছিল। সব দিক থেকে অপমানের ঝাপটা। সবদিক থেকে ব্যর্থতার বাতাস। বেসরকারী কলেজের অধ্যক্ষ ছাত্র-রাজনীতির জন্য আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে স্বচ্ছন্দে ফোর্থ ইয়ারের শেষে ডিসকলেজিয়েট করলেন। তখন আর কিছুই করার নেই। এর কিছু আগে আমার এক সহোদরকে পটাসিয়াম সায়ানাইডে শেষ হতে দেখলাম। নিম্নবিত্ত পরিবারে একটি গ্রাজুয়েট মানে কিছু আশা। তা হওয়া গেল না। কলকাতা তখনো কলকাতা। খালাসীর চেয়ে কিছু ওপরে—ফার্নেস-হেলপার হয়ে তিরিশ টনের ওপেন হার্থ ফারনেসে ঢুকলাম। সে-কারখানায় সেদিন যিনি টেকনিক্যাল ম্যানেজার ছিলেন—পরে তিনি দুর্গাপুর ইস্পাতের এম ডি হন।

অনেক পরে একদিন গ্রাজুয়েট হয়েছিলাম। জিনিসটা এত বাজে তায় আগে জানতাম না। গ্রাজুয়েট হয়ে গেলাম—অথচ গায়ে একটা ঘামাচিও বেরোল না!

কারখানায় একরকমের হিন্দি শিখলাম। হিন্দি ছবি দেখে আরেক রকমের হিন্দি শিখেছিলাম তার আগে। এখানে আমার সহকর্মী—ফৌজদার সিং, অযোধ্যা সিং, গুণ্ডু রাও, সুব্বা রাও, মায়ারস্। ফারনেস বেড থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে বিলিতি ছবির মত। শেডের নিচে ম্যাগনেটিক ক্রেন এসে ঝুপ করে স্ক্র্যাপ দাঁতে কামড়ে তুলে নিয়ে যায়। সেই ক্রেনকে নামতে বলার সময় বলতে হয়—আড়িয়া, আড়িয়া। তুলবার সময় বলতে হয়—হাফেজ, হাফেজ।

একখানা উপন্যাসই লিখে ফেললাম। নাম দিলাম: আড়িয়া হাফেজ। ছাপানো হয়নি। একরকম ইচ্ছে করেই হারাই। এখানে আমার কাজ ছিল বিচিত্র। ফারনেস যখন চালু—তখন বেলচায় করে চুন, ডলোমাইট, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি চোখে নীল চশমা পরে গলন্ত ইস্পাতের ওপর ছুঁড়ে দিতাম। ফার্নেস

ডোর তুললে দেখা যেত—গলন্ত ইস্পাতের ওপর স্ল্যাগের সর। লোহার লম্বা চামচে করে এক চামচ গলন্ত ইস্পাত এনে সিলিকা প্লেটের ওপর ঢালতে হতো। এ-কাজ যখন পেলাম—তখন আমি স্যাম্পেল-পাসার। এভাবে অভিজ্ঞ হতে হতে একদিন আমি ৩০ টন গলন্ত ইস্পাত ট্যাপ করে উপযুক্ত তাপে. ক্রেন থেকে ঝুলন্ত 'ল্যাডেলে' ঢেলেছিলাম—যে-ইস্পাত ছাঁচে পড়ে 'ইনগট' হয়েছিল। আমারও মনের ছাঁচ পালটাচ্ছিল। কোথায় ছাত্র-রাজনীতি! অবশ্য তখনকার পলিটিকস্ মানে এত খুনোখুনি ছিল না। আর কোথায় ইস্পাত ঢালাই! একদিন ঢালাই ঘরে গিয়ে দেখি—ইলেকট্রিক ফারনেস থেকে ১২ টন ইস্পাতের একটি ল্যাডেল ক্রেনে চড়ে আসছে। কি হবে? তাকিয়ে দেখি—চিত্তরঞ্জন কারখানার প্রথম ইঞ্জিনের কয়েকটি বড় চাকার ছাঁচ। পর পর ঢালাই হবে।

ফারনেসের ভেতরের ইঁট পালটাবার জন্যে ফারনেস নেভানো হত। তখন আরেক রূপ। মাটির নিচে সিলিকার ইঁট এমন কায়দায় সাজানো যে—তার ভেতর দিয়ে কয়লা পোড়া গ্যাস যত যাবে—তত গরম হয়ে উঠবে। এসব পরে 'নির্বান্ধব' উপন্যাসে এসে গেছে।

এই কারখানায় ওয়াটসন নামে একজন অ্যাংলো জেনারেল ম্যানেজার ছিল। বেহারীবাবু নামে একজন পিটসাইড ফোরম্যানও ছিল। ছিল রোলিং ডিপার্টমেন্ট। যার ফোরম্যান শর্মা পেঙ্গুইনের বই হাতে কারখানায় আসতেন।

আর এখানেই একটি সস্তার খাবারের দোকান ছিল। নামটি অদ্ভুত। মহাকাল কেবিন। মাটির মেঝে। সেখান থেকে একটি নারকেল গাছ ক্যানেস্তারা টিনের ছাদ ফুটো করে আকাশে উঠে গেছে। নারকেল গাছটির গায়ে পেরেক মেরে তাতে কাপ ঝোলানো থাকতো। দোকানদার অনিল মালখণ্ডী খদ্দেরের অর্ডার অনুযায়ী স্লেটে লিখে যেত—আলুর দম—দু' আনা। চা—এক আনা। তখন তাই ছিল।

ওই নামে একটি গল্প লিখে ফেললাম। মহাকাল কেবিন!

ইতিপূর্বে সেই জ্বরের ভেতর লেখা একটি গল্পের কথা বলেছি। সেই গল্পটির নাম ঃ চর। পরে ছাপা হয়েছিল অগ্রণী কাগজে।

এই দুটি গল্পের ভেতর সময়ের ব্যবধান বছর দুই অন্তত। গল্প হিসাবে হয়ত এমন কিছুই না। কিন্তু অন্য কারণে—কিছু।

'চর' গল্পটি এক জায়গায় হাতে করে পড়তে নিয়ে গিয়েছিলাম। সভাপতি ঃ তখনকার যুবক প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র। সেখানে পড়বার পর রোগামত বয়স্ক এক ভদ্রলোক বললেন, কাল সকালে গল্পটি আমার বাড়িতে নিয়ে যেও।

আপনার ঠিকানা?

ফোনগাইডে পাবে।

আপনার নাম?—এ প্রশ্নে সবাই দেখলাম আমার দিকে তাকিয়ে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

পরদিন অনেক সময় নিয়ে তারাশঙ্কর সে গল্প কাটাকুটি করেছিলেন। আমার প্রথম গল্প। তারাশঙ্কর তখন সঞ্জীবন ফার্মেসিকে আরোগ্যনিকেতন করছেন। নাও তো সময় দিতে পারতেন তিনি সেদিন। আমার মত অর্বাচীনকে তিনি অনেক কথা বলেছিলেন সেদিন।

'মহাকাল কেবিন' গল্পটি নিয়ে দুজনের মতান্তর হল। একজন তারাশঙ্কর অন্যজন প্রেমেন্দ্র মিত্র। মতান্তরের কথা শুনেছিলাম সুনীল ধরের মুখে। পরে প্রেমেন্দ্র মিত্রও বলেছিলেন। গল্পটি হারিয়ে গিয়েছে। ছাপা হয়েছিল তরুণের স্বপ্ন কাগজে। তারাশঙ্কর প্রেমেন্দ্র মিত্র দু'জনই সম্পাদকমণ্ডলীতে। সুনীল ধর ছিলেন অফিস সম্পাদক। গল্পটি ছাপা হওয়ায় দশ টাকা পেয়েছিলাম। প্রেমেন্দ্র মিত্রের ইচ্ছায় গল্পটি ছাপা হয়েছিল।

কিন্তু এই গল্পই বৃত্তি পালটে দিল। মানে পালটে দেওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াল। ছিলাম কারখানায়। আবার কলকাতায় এসে সিকরেটলি গ্রাজুয়েট হতে হল। অনেক ভালমন্দ লোকের সঙ্গে আলাপ হল। অনেকগুলো টিউশুনি করতে হল।

এই সময়ে আমার পরের ভাই একজন চিত্র-পরিচালকের বাড়িতে পড়াতে যেত। তাঁর দুটি ফুটফুটে মেয়ের ছোটজনের নাম ছিল রতন। আমিও সে-বাড়িতে যেতাম। চিত্র-পরিচালক ভদ্রলোক অন্তত একখানি বিখ্যাত বাংলা ছবি করেন—যা কিনা উত্তমকে উত্তম হতে ভীষণ সাহায্য করেছিল। তখন উত্তম যশোপ্রার্থী ছিলেন। সুমধুর হাসির অধিকারী। সব সময় চা হচ্ছে চিত্র-পরিচালকের বাড়িতে। স্ক্রিপ্ট শোনা হত। চিত্র-পরিচালক হোমিওপ্যাথি করতেন। আমার মাকেও কয়েকবার ওষুধ দেন। রতনের বসন্ত হল। স্মলবসন্ত। বাবা হয়ে রতনকে চিকিৎসা করতে যাওয়া ঠিক হয়নি তাঁর। স্মলবসন্ত খুব খারাপ টাইপের। রতন মারা গেল। এই রতন আমার কাছে গল্প শুনতো। বানিয়ে বানিয়ে বলতাম। রতন মারা গেছে। শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে। তখনো বাড়ির চাকর অভ্যাসবশত সবাইকে চা দিয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করছে—চিনি হয়েছে তো? আরেকটু দেব? খানিক পরে রতনকে আমরা ক্রিমেটোরিয়ামে নিয়ে যাব।

প্রায় ভূতে পাওয়ার মত একটি গল্প লিখলাম—তারা গুনতির দেশে।

গল্পটি সবাই ফেরত দিলেন। এক জায়গায় ফেরত দেওয়ার সময় সন্তোষ-কুমার ঘোষ বসেছিলেন। প্রত্যাখ্যাত লেখাটি পড়লেন। ওঁর লেখার সঙ্গে পরিচয় ছিল। মানুষ হিসাবে পরিচয় হল।

ফাইনাল পরীক্ষার মত লেখার দিকে কখনোই গম্ভীর হয়ে তাকাইনি। আবার একথাও সত্যি—কিছু লিখতে পারি না বুঝে প্রতিনিয়ত হাতড়ে বেড়াবার ব্যাপারটি সর্বদাই মনে মনে টের পাই। এক সময় ডেলিপ্যাসেঞ্জারির জীবন,

চাকরি খোঁজার জীবন গল্পে চলে আসতে লাগল। চাকুরে মেয়ের গল্পও দু-একটা লিখে ফেললাম। সন্ধ্যার মুখে মুখে আগাছা ঢাকা প্রাঙ্গণে সাপখোপ দেখা দিলে আমরা সিওর হওয়ার জন্যে থ্যাঁতা করে বাঁশের বাড়ি মারি। তাতে নিষ্ঠুরতা এবং নিশ্চয়তা থাকে।

এরকম বিষয় নিয়ে গল্প লিখে ফেললাম। বৃহন্নলা উপন্যাসে সুধা নামে একটি চাকুরে মেয়ে এসে গেল। সে ওরকম আহত অবস্থায় প্রত্যাখ্যাত হল। তার যন্ত্রণা আমি নিজে টের পেলাম।

মৃত্যু, দম্ভ, শোক, অসুখ এবং ওষুধ—এরা পাশাপাশি বাস করে। তা দেখতে পেয়েছিলাম কোন নিকটজনের দীর্ঘ হাসপাতাল-বাসের সময়। বড় ডাক্তার অপারেশন করতে করতে বাইরে এসে ফোন করছে। গবেষণার জন্যে মানুষ আলু-পটলের মত কাটা পড়ছে শল্যচিকিৎসকের ছুরিতে। মৃত্যুর শত্রু একটি সাদা বাড়িতে স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করছে। বই লিখে ফেললাম। লেখার সময়টাও বিচিত্র ছিল। বেলা তিনটে নাগাদ। বউবাজারে ব্যোমকেশবাবুর প্রেসে। আনন্দবাজারের সকালের শিফটের পর ওখানে গিয়ে লিখতাম। প্রকাশক রবি রায় মশায় তা ছোট ট্রেডলে ছেপে বের করেছিলেন। অনিলের পুতুল।

দু'একখানা দশ ফর্মা বই। গোটা কয় গল্প। কেউ ভালো বলছে, কেউ কিছু বলছে না। কেউবা মন্দ বলছেন। এই সব নিয়েই বোধহয় সাহিত্য। তাই শেষ না ভেবে যখন মনে যা এসেছে তাই লিখেছি। এখনো লিখি।

ঘুরে ফিরে যার কথা লিখতে চেয়েছি সে আমারই জানাশুনো একজন লোক। তার নাম শ্যামল গাঙ্গুলী। তার মজা। তার আনন্দ। কল্পনায় তার গুলি-চালানো কিংবা স্বপ্নে তার ডানা মেলে ওড়া। এই লোকটিকে কখনো সস্তার ফার্নিচারের দোকানদার হিসাবে গাঁয়ের বুনো তেঁতুলগাছ কিনতে পাঠিয়েছি। এই লোকটিই খুনের বাড়ি ভাড়া নিচ্ছে। আবার এই লোকই গাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তার হিসেবে অভাবী তাড়িখোর মাতালের বউকে সংসার থেকে ভেগে চলে আসার পরামর্শ দিচ্ছে। একবার অনেকদিন আগে জনসেবক অফিসে বসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিল, তুই নিজের কথা লিখে যা।

আমি কিছু পড়িনি। কিছু জানি না। তাই সুনীল যা বলেছিল—তাই করি।

এইভাবে খানকয়েক উপন্যাস ও ডজন কয়েক গল্প লিখবার পর শ্যামল গাঙ্গুলী সত্যিকার একটা ব্যাপারে জড়িয়ে গেল। ব্যাপারটা আর ভাড়াবাড়িতে থেকে গল্প লেখা নয়।

জমি। এর সঙ্গে জড়িত—দখল। এর সঙ্গে জড়িত—আশ্রয়। এর সঙ্গে জড়িত—অঙ্কুর। কিংবা নবজন্ম। আর জড়িত—লোভ।

সামান্য একটুখানি দিয়ে শুরু হয়েছিল। তা বাড়তে থাকল। সে কি নেশা! অফিসে যাই না। জমি দেখে বেড়াই। একবার মনে আছে—কোন এক বিখ্যাত চৌধুরীদের বড় কাছারিতে গেছি। সেখানে গেট লাগানো একটি বিশাল ঘরে শুধু দলিল থাকে। বাবুরা সাদা হাফ শার্ট আর ধুতি পরেন। ও'রা এস্টেটের দারোয়ান সঙ্গে দিলেন। এক লপ্তে আশি বিঘা বিক্রি করবেন। জলে ডোবা জমি। শস্তায় দেবেন।

বৃষ্টি হচ্ছিল। বৃষ্টির ভেতর দিয়ে কোমরজল ভেঙে রেললাইনের পাশে পে'ছিলাম। কয়েকমাইল জায়গা জলে সাদা হয়ে পড়ে আছে। বাতাস উঠলে সেখানে ঢেউ খেলে। স্টেটের দারোয়ান দূরের একটি ধ্যানস্থ মাছরাঙা দেখিয়ে বলল—পূবে চৌধুরীবাবুদের জমি ওই পর্যন্ত। পশ্চিমে আর মাছরাঙা পেল না বেচারা। জল ভাঙছি তো ভাঙছিই। এ-রকম নেশা।

আকাশের নিচে নির্জনে কত মাঠ পড়ে থাকে। তাদের ওপর দিয়ে হাঁটবার সময় অদ্ভুত লাগে। প্রান্তরের সাতটা তালগাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। এরাই এই প্রান্তরের রক্ষক। ধানক্ষেত খ‍ুঁড়ে লোকে কচ্ছপ বের করছে। পুকুর কাটতে গিয়ে বারো হাত নিচে নৌকোর গলুই পাওয়া গেল। একদা তাহলে এখানে নদী ছিল। জমির অনন্ত রহস্য। তার সঙ্গে কোর্টকাছারি। দলিল দস্তাবেজ। উকিল মুহুরি। লোভ। শরিকানি। অন্তহীন।

আসলে পৃথিবীটা যেমন আছে তেমন থাকে। যুগে যুগে মানুষ এসে দখল দাবি করে। কখনো অর্থবলে—কখনো লোকবলে।

এই ব্যাপারগুলো লেখায় আসতে লাগল।

জমির সঙ্গে সঙ্গে আমার অজান্তেই আমি ফসলে চলে গিয়েছিলাম। একটি ধানচারা। তাকে বড় করে তার থেকে ধান তোলা। তার স্বভাব। সেই ধানের সঙ্গে আমাদের দেশের মানুষের কোন্ অতীত থেকে নাড়ির যোগ—সবই আমাকে ভাবাতে লাগল। সেই প্রথম দেখলাম—হাল দিতে দিতে চাষী বলদের সঙ্গে আপন মনেই জীবন, সংসার, বর্ষা, বউ, চাষবাস নিয়ে কথা বলে আর তার লেজ মোচড়ায়। চাষী ও বলদ একসঙ্গে ডোবার জলে মুখের ছায়া দেখে। চাষীবউয়ের হাতেগড়া রুটি গোহাটা থেকে ফেরার পথে চাষী খিদের চোটে নতুন কেনা বলদের সঙ্গে ভাগ করে খায়। এসব দেখে গল্প লিখলাম—'হাজরা নস্করের যাত্রাসঙ্গী', 'যুদ্ধ' ইত্যাদি। এর পাশে সোফিস্টিকেটেড ইস্পাত কারখানা, ফানুস গড়িয়াহাটার মোড়, এককালের ছাত্র-রাজনীতি—সবই তুচ্ছ লাগতে লাগল। পাগলা নদী দিয়ে জলপথে গিয়ে একদিন পরিত্যক্ত সুন্দরবনের দ্বীপে মেদনমল্লের দুর্গ দেখলাম দূরে থেকে। ছাদ নেই। শ্যাওলামাখা দেওয়াল। বিশাল দীঘি দামে ঢাকা। বাঙালী নৌ-সেনাপতির নৌ-ঘাঁটি। কী করে যেন 'কুবেরের বিষয়-আশয়' উপন্যাসে এসব কথা এসে

গেল। ফসলেরও একটা নেশা আছে। সে নেশা আসলে দখলের। আরও কত আমার করায়ত্ত করা যায়।

এক এক বিপদে জড়িয়ে সেই বিপদের ঢেউয়ের চূড়ায় পাক খেয়ে আরেক বিপদে গিয়ে আছড়ে পড়ছিলাম। যখন পড়ছিলাম—তখন জানতামই না—এসব আসলে বিপদ। তখন ওদের মনে হচ্ছিল—স্রেফ খেলা। সেই সময়ে নদীর পাড়ে শনিবারের হাটবারে গোগাড়িতে খড়ের বিছানা পেতে চলমান গণিকাকে আসতে দেখতাম। গল্প লিখলাম—'অন্নপূর্ণা'। মহম্মদ বাজিকর অবিবাহিত কুমার কেউটেকে হাতে তুলে বলত—হাঁসা কেউটে। বড় ডাকাতির পর সন্তোষ টাকি হপ্তাদুয়েক ডাবওয়ালা হয়ে যেত। কলকাতার রাস্তায় নিরীহ মুখে ডাব কাটছিল—এই অবস্থায় পুলিশ শেষবার সন্তোষকে ধরে।

শৈশব যার পকেটে নেই—তার পক্ষে প্রতিভার নদীতে সাঁতরাতে যাওয়া অর্থহীন। আবার এই শৈশব যদি শুধুই নস্টালজিয়া হয়ে ওঠে তবে তা সাহিত্যের পক্ষে বিড়ম্বনা। সুন্দর শৈশব পরবর্তী জীবনে শক্তির উৎস। মা যখন 'দুধারে সরিষা ক্ষেত'—কবিতাটি আবৃত্তি করতেন—তখন সত্যিই আমাদের ছোটবাড়ির সামনের মাঠে সর্ষের ক্ষেতে হলুদ ফুল বোঝাই হয়ে থাকত। পাড়ার দিদিদের সঙ্গে কালীপুজোর আগের দিন কোঁচড় ভরে চৌদ্দ শাক সংগ্রহ করেছি। ভোররাতে তাদের সঙ্গে বকুল ফুল কুড়িয়ে বুনো লতায় মালা গেঁথেছি। বর-বউ খেলার সঙ্গিনীরা একদিন বড় হয়ে শাড়ি ধরল। তাদের কিন্তু ভীষণ একটা রহস্যময়ী মনে হয়নি কোনদিন। তাদের নিয়ে শরীরের রহস্য-মাখানো কোন কাহিনীও আমার কলমে আসেনি। তার কারণ, তাদের চেয়ে রহস্যের জিনিস আরও ছিল। যেমন—বিশাল স্তব্ধ দীঘি, মাঠ-ছাপানো বৃষ্টি, নদীতে ডুবসাঁতার দিয়ে উঠতে গিয়ে দেখছি—ঘাটে দাঁড়ানো নৌকোগুলোর তলায় গিয়ে মাথা ঠেকে যাচ্ছে—ভেসে ওঠার জায়গা পাচ্ছি না—অথচ দম ফুরিয়ে যাচ্ছে।

মানুষকে বোধহয় সেই সময় থেকেই চিনতে শুরু করি। ক্লাস ফোরে এক সহপাঠীর বিপত্নীক বাবার পুনর্বিবাহে আমরা সবান্ধবে সাইকেল-রিক্সায় চড়ে মহানন্দে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিলাম। বিয়ের সময়টায় আমাদের রসগোল্লা দিয়ে সরিয়ে রাখা হয়েছিল।

একসময় ধারণা হয়েছিল, বেকার যৌবন নিয়েই বোধহয় লিখে যাব। কেননা এ-বিষয়ে অন্তত দুখানি উপন্যাস এবং অনেকগুলো গল্প লিখেছিলাম। একসময় মনে হয়েছিল, সদ্যযৌবনের প্রেম-ভালবাসাই বুঝি আমার লেখার বিষয়। একদিন দেখলাম—এসব লিখতে গিয়ে তো মেয়েটির চেহারা-স্বাস্থ্য কেমন—তাও লিখতে হয়। এ জিনিস কতবার লেখা যায়। হঠাৎ দেখা হল সুজাতার সঙ্গে। তার পরনে বাসন্তী রঙের শাড়ি। মোটা বেণীটা বুকের

ওপর এসে পড়েছে। তারপর ? তারপর কি লিখব ? রিডিকিউলাস !

আরও মুশকিলের কথা—আমার কোন রাজনৈতিক বিশ্বাস নেই। কোনদিন মনে হয়নি—অমুককে ক্ষমতাচ্যুত হলে এবং সে-জায়গায় অমুক এলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি সর্বদাই জানি—রাষ্ট্র ও প্রশাসন মানে একটি অন্ধ কবন্ধ দানব। সেজন্যে কেউ ব্যক্তিগতভাবে দায়ী নয়। এটা একটা ব্যবস্থা বা প্রথা। একসময় ছিল যখন আমেরিকা পরমাণু বোমা ফাটালেই খবরের কাগজের প্রতিবাদপত্রে আমরা সই দিতাম। রাশিয়াও যখন ফাটালো—তখন কোন কোন সমসাময়িক রাজনৈতিক বিশ্বাসী সই দিলেন না। তারপর সময় যেতে বুঝলাম—লিখতে হলে এই সইসাবুদ সর্বৈব বাজে ব্যাপার।

বরং তার চেয়ে আরও বিরাট ব্যাপার আশেপাশেই আছে টের পেলাম। পাচ্ছিলাম। টের পাবার কারণও ছিল। ৩২।৩৩ বছর বয়সে এমন একটা গাঁয়ে গিয়ে বাসা বাঁধলাম যেখানটায় বিদ্যাধরীর বন্দী জল প্রায় চল্লিশ বছর আটক থেকে সব রকম গতি রুদ্ধ করে রেখেছিল। জল নিকাশের পর সেখানে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হচ্ছিল।

এমন জায়গায় একদিন শীতের বিকেলে বোরো ধানের বীজতলা করা হচ্ছিল। চাষী ফকিরচাঁদ ডুবন্ত সূর্যের দিকে মুখ করে তিনদিনের অঙ্কুরিত ধানবীজ হাতের বিশেষ প্রক্রিয়ায় পাঁক মাটিতে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। সেগুলিই পরে ধানচারা হয়ে দাঁড়াবে।

বললাম, এ-রকম শিখলি কোত্থেকে ফকিরদা ?

ছোট্ ঠাকুদ্দার কাছ থেকে।

আমি সেই বিকেলে পরিষ্কার দেখতে পেলাম—আমাদের বীজতলার খানিক দূরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ফকিরচাঁদের ছোট্ ঠাকুদ্দা, তস্য ছোট্ ঠাকুদ্দা—এরই নাম বোধহয় সভ্যতা।

এসব ব্যাপার বোঝা এক জিনিস, আর ফুটিয়ে তোলা আরেক জিনিস। বিশেষ করে পাঠকের মনে সঞ্চারিত করা।

তাই একটি একটি করে জিনিস ধরবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ধরা কি যায় ! লিখতে গিয়ে দেখি—গল্প অন্যদিকে চলে যাচ্ছে। বাঘ সাঁতরে নদী পার হওয়ার সময় লাইন বেঁকে গেলে রাগে তীরে ফিরে এসে আবার সোজা লাইনে এগোবার চেষ্টা করে। অন্যদিক থেকে ফিরে এসে আবার গল্পকে ধরতে হয়েছে। আসল গল্পকে। পথে অবশ্য ফাউ অন্য দু-একটা গল্প হয়ে গেছে।

এইভাবে লিখেছিলাম—'কন্দর্প', 'চন্দনেশ্বরের মাচানতলায়'।

অসীম রূপবান গণেশ। কিন্তু তোতলা এবং মিথ্যেবাদী। ঝোঁকের মাথায় গাইতেও পারে। বারম্বার বিবাহই একমাত্র নেশা। গাঁজা খেলে পঞ্চাননতলায় বৈশাখ মাস ভোর সংকীর্তন করে বাতাসা পায়।

এপ্রিল মাস। ফলন্ত বোরো ধান জলের অভাবে চুঁয়ে যাবে। পাম্পসেট খারাপ হয়ে গেছে। এক রিকশায় চড়িয়ে সারাতে নিয়ে গেলাম। সারিয়ে ফিরতে বেলা তিনটে। রিকশাওলাকে এতক্ষণ আটকে রাখার জন্যে অতিরিক্ত পয়সা দিতে গেলাম—নিল না। অবাক কাণ্ড! লোকটির সঙ্গে পরিচয় হল। লোকটিকে টাকা দিয়ে কয়েকখানি রিকশা বানিয়ে দেবার প্রস্তাব দিলাম। প্রত্যাখ্যান করল। বলল, বানাতে জানি। অনেক ছিল। থাকলেই ঝামেলা। এই বেশ আছি। স্টেশন প্ল্যাটফর্মে থাকি। কলের জল খাই। ভগবানের কথা ভাবি। মাঝে মাঝে রিকশা চালিয়ে ভগবান দেখতে বেরোই।

ভাবতে অবাক লাগল। একটা লোক ভগবান দেখতে প্যাডেল করে রিকশা নিয়ে উত্তরে যায়। দক্ষিণে যায়। গল্প লিখলাম—চন্দনেশ্বরের মাচানতলায়।

আমার একটা দুঃখ আছে। আমি গালুডি যাইনি। যাবার সময় কেউ ডাকেনি। চাইবাসা যাইনি। যাবার সময় কেউ ডাকেনি। সেদিকে নাকি পাহাড়ী ঝরণায় ৩০।৪০ জন সাঁওতালনী মাটি দিয়ে নিঃসঙ্কোচে উরু মাজে এক-সঙ্গে। গা পরিষ্কার করে। আমি দেখিনি। জানি, সে ছবিও নিশ্চয় আদি এবং অকৃত্রিম।

আমি কিন্তু আরেকটি ছবি দেখেছি। অবস্থাপন্ন ভূস্বামী স্ত্রীর অসাক্ষাতে চাষী রমণীকে রক্ষিতা রাখে। তার স্বামী কোথাও জমি পায়নি বলে হা-ঘরে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তারপর ইঁদুরের গর্ত থেকে ধান সংগ্রহের অনুমতি চায়। কিন্তু সেই গর্তের ভেতর থেকে সাপ ধরার জন্যে সাপুড়েও অনুমতিপ্রার্থী। অর্থাৎ ইঁদুর যে-গর্তে ধান চুরি করে রাখে—সে-গর্তে সাপ ঢুকে ইঁদুরকে বাস্তু-চ্যুত করে। সেই সাপকে ধরতে সাপুড়ে আসে। সেই গর্তের ধান চাইতে জলপাত্র চাষী রমণীর স্বামীও ঘুরে বেড়ায়। পাকা ধান খেতে এসে কাদাখোঁচা পাখি ধরা পড়েছে। চাষী রমণী শণের কাঠি পাখির এক চোখ দিয়ে ভরে অন্য চোখ থেকে বের করে এনে আধমরা অন্ধ পাখিকে জীইয়ে রাখে। কারণ, তার ভাষায়—বাবু খাবে। এই নিয়ে লিখেছিলাম একটি গল্প—ধান কেউটে।

লেখার উদ্দেশ্য একটিই। তা হল উন্মোচন। অনুসন্ধানের পথে পথে এই উন্মোচন। বিনা মন্তব্যে সরল বাক্য সাজিয়ে এগিয়ে যাওয়াই আমার পদ্ধতি। আমি বলতে চাই সবচেয়ে কম। আর চাই—আমার না-বলাটুকু পাঠকের মনে ক্রমিক পুনঃ সৃষ্টি হতে থাকুক। সে-ই পথ খুঁজে পাক। তাই সাধারণত আমার কোন রচনাতেই জটিল বাক্য থাকে না। কেউ বলেন—বড় কাটা-কাটা লাগে। আমি এটা ইচ্ছে করেই করি। কেননা এটাই আমার পদ্ধতি। সেই পদ্ধতিতে আমি 'টেবিল' 'চেয়ারের' মতই অনায়াসে উপযুক্ত ইংরাজি কথা ব্যবহার করি। কারণ জানি এই কথাগুলি আমরা অন্য সময়ে বাংলার মতই আমাদের বাক্যে ব্যবহার করে থাকি। নজর রাখি, একটা হেভি শব্দের বদলে যেন আটপৌরে শব্দ

খুঁজে পাই।

একদা সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় বলেছিলেন, হোয়াট ইজ লর্ফট ইন ইওর স্টেয়িং ইন এ ভিলেজ?

একজন কবি বলেছিলেন, হ্যাঁ, আপনি তো ওই লক্ষ্মীকান্তপুর লাইন নিয়ে গল্প লেখেন!

এর কোন কথারই জবাব হয় না। দিলেও বুঝবে না। কিছু দাবি করছি না। কাউকে ছোট করছি না।

বাঙালীর জীবনে সবচেয়ে বড় দুর্গাপুজোর নাম আমন ধান চাষ। এক কোটি একরে ৭০ লক্ষ কৃষিজীবী পরিবারের ৫।৬ মাস ধরে কর্মব্যস্ত কাণ্ড। ধান কবে আবিষ্কৃত হয়েছিল জানি না। তবে নিশ্চয় অনেক দিনের। আমরা যারা জুতো পায়ে দিয়ে শহরে বাস করছি—তাদের ঘরের কিনার দিয়েই এই কর্মকাণ্ড সারা দেশের মানুষ ও মন জুড়ে ব্যাপ্ত। রাজনৈতিক নেতারা চাষীর কথা বলছেন। শিল্প কারখানা কৃষিভিত্তিক হওয়ার চেষ্টা করছে। কবি লিখছেন—ধান করো, ধান করো। ধান একদা গণ-নাট্যের গান হয়েছিল। ট্রেনের জানলায় বসলে এই দৃশ্যই দেখা যায়। ধান, গরু, জল, মানুষ – এসব তো একই সুতোয় গাঁথা। একজন লেখক এ-ব্যাপারটি কি এড়িয়ে চলতে পারেন? তাঁর শিক্ষায় এটা কি অবশ্যপাঠ্য নয়? এই তো তাঁর টেক্সট বুক। এ কথা কোন এক আড্ডায় বলাতে আমার খুবই প্রিয় একজন সমসাময়িক লেখক বলেছিলেন, না, ও সম্পর্কে লেখকের একটা রিমোট ধারণা থাকাই যথেষ্ট। আমি জানি, এই টেক্সট বইখানা পড়া থাকলে ওই লেখকের বিষয়বস্তু এবং কলমের জাদু অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়াত। আমরা কেউ তাঁর সামনে এগোতে পারতাম না। দুঃখের বিষয়, এই লেখক একখানি শারদীয়া উপন্যাসের শুরুতে লিখলেন—আমি 'গেনু' ইত্যাদি দিয়ে গাঁয়ের কথা লিখতে জানি না। তিনি বাঙালী এবং বাংলায় লেখেন! তাঁর একটি কবিতায় নদী প্রতিবাদ হয়ে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে গিয়ে আছড়ে পড়ছে। আমার খুব দুঃখ হয়। কারণ জানি, ওই কবিতা স্রেফ ভাবালুতা। ইহা শিল্প নহে।

সন্দীপন বলেছিলেন, তুই একদম বানাতে জানিস না! তোর কোন ইমাজিনেশন নেই!

এ কথারও কোন জবাব দিতে পারিনি। কারণ দিয়ে কোন লাভ নেই। কোথায় বানাই— কোথায় আসলের সঙ্গে মিশেল দিই, তা বাইরের লোক কি করে বুঝবে? সৃষ্টিতে আমি দ্বিতীয় ব্রহ্মা—এমন কোন গর্ব আমার নেই।

আমাদের সময় কয়েকজন বিশিষ্ট সম্পাদকরূপে আলোকিত। যেমন ঃ সাগরময় ঘোষ। যেমন ঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এঁদের সাহস, এঁদের সুবিচার সুবিদিত—তবে এ কথাও ঠিক, সময়ের জিনিস সময়ে না হলে আর হয় না। পরে তার

কোন সংশোধনও নেই। এমন অনেক লেখাই ভালো ছাত্রের মত ভালো স্কুলে পড়াতে পারিনি বলে স্বল্প প্রচারের খুদে স্কুলে পড়ে সেই ছাত্র বা লেখা বিস্মৃতিতে তলিয়ে গেছে। এক জীবন দিয়ে তার দাম দিতে হচ্ছে। আর ফিরে আসার নয়। এখন চেষ্টা করলেও সে-রকম লেখা আর বেরোবে না। অবহেলা অনেক ক্ষতি করে। কোন সম্পাদকের সুবিচার যদি কারও প্রতি ওজন করে দেখা যায়—ওজনে দেড় মণ—সেই সম্পাদকের অবিচারের ওজন আমার বেলায়—ঠিক ততখানিই—দেড় মণ। এর নাম প্রতিবন্ধকতা না বলে আমি বলব—ভবিতব্য। এটাই কপালে ছিল।

প্রতিবন্ধক আরেকটি জিনিস আছে। আমি যাতে হাত দিই—তা শেষ পর্যন্ত টাকা দিতে থাকে। টাকা শেষ পর্যন্ত প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। অন্ততঃ আমার ক্ষেত্রে। তাই বাহুল্য বর্জন করে কী করে টাকা আয় না করা যায়—সে পথ আলস্য এবং অন্যান্য জিনিস দিয়ে আমি গত তিরিশ বছর খুঁজে আসছি। প্রায় পেয়ে গেছি। জীবনটাকে চুরুট করে পোড়ালে আগুনের মাথায় দেড় ইঞ্চি লম্বা ছাই লেখার অনুমান করা যায় কি? জানি না। তবে আন্দাজে চেষ্টা করে যাচ্ছি।

মানুষকে ভালোভাবে দেখতে জানলে—কঠিন দুঃখেও হাসি পায়। চিরন্তনতার মাপকাঠিতে শেষ পর্যন্ত প্রকৃতি প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। তখন সবকিছু সম্পর্কেই একটা হাসির দৃষ্টিকোণ তৈরি হয়ে যায়। সে হাসির ভেতর দুঃখের কণা ছিটানো থাকে। আলো পড়লে তা ঝিকমিক করে ওঠে। তাই আমার অনেক গুরুগম্ভীর লেখাতেও হাসি এসে গেছে। আমি এমন একটি লেখা লিখতে চাই—যা কিনা তিরিশ বছর পরেও পড়তে গিয়ে নতুন মনে হবে।

লেখা বড় হয়ে গেল। একটি গরু ও একটি ইঁটখোলা সম্পর্কে কিছু কথা বলে লেখা শেষ করতে চাই।

একবার একটি গরু পুষেছিলাম। আন্দাজে কেনা গাই। বাছুর সমেত। হরিয়ানা গাই। তার চোখে গাঢ় করে কাজল টানা। আমার বড় মেয়ের বয়সী। কুচো করে খড় কেটে দিতাম। মাসে চুনি ভুষির সঙ্গে গুড় খেত আধ মণ। রাত দুটোয় বাড়ি ফিরলেও কান লটপট করে রিসিভ করত আমায়। এক অমাবস্যায় ডাক নিল। পাল খাওয়াবার ব্যবস্থা করলাম। কী কৃতজ্ঞ দৃষ্টি! বাচ্চা হল। দশ সের দুধ দিত। চার বছর আমার কাছে ছিল। বড় গম্ভীর ও অহংকারী গরু। অভাবে পড়ে গাভীন অবস্থায় তাকে বেচে দিতে হল। আমি যখন পথ দিয়ে যেতাম—তখন ও গলা বাড়িয়ে খালের ওপার থেকে ডাকত। হাম্বা! আমি শুনতাম—শ্যামলবাবু বাড়ি ফিরছো? ছায়া দিয়ে হাঁটো। বড় রোদ্দুর। এ কথা 'নৃপেনদের বাড়ি' গল্পে এসেছে! এসেছে 'সরমা ও নীলকান্ত' উপন্যাসে। ওরই সুবাদে নানা প্রকারের গোবদ্যির সঙ্গে আলাপ হয়। গরুর হাড়ের চিকিৎ-

সকদের বলে—হাড়ো খাঁ। গরুর কৃত্রিম প্রজননের জন্যে রোজ এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে আইস বক্সে করে ওহিও ষাঁড়ের বীর্য আসে দমদমে। জগৎ বেঁধে রেখেছে গরু। ওর হাড় একদিন গুঁড়ো হয়ে সার হবে। ওর লাংস দিয়ে দামী ওষুধ হবে মানুষের। ওর চামড়া দিয়ে অনেকের কর্মসংস্থান হবে। ওর দুধ আর গোবরের কথা নাই-ই তুললাম। এসব আমায় ভাবায়।

একবার একটা ইঁটখোলা করেছিলাম। লক্ষ্মণ, পঞ্চানন হাজরা, শরৎ ইঁট কাটতে আসতো শেষরাতে। লাথগঞ্জের ইঁট। হাজার—চোদ্দ টাকা। পাঁজা বসালাম। হাজারে ৬ মণ কয়লা। মাসখানেক পরে পাঁজা ভেঙে ঝামা, ছাই, এক নম্বর ইঁট নীরেস ইঁট বেরোলো। ইঁটের গাছি দিলাম। ছাই ছেঁকে বস্তাবন্দী করলাম। তাই দিয়ে বাড়ি গেঁথে তুললাম। দেখলাম ইঁটখোলার কিছুই ফেলা যায় না। ঝামা ভেঙে খোয়া। ছাই হল গাঁথুনির মশলা। পৃথিবীর খানিকটা কেটে নিয়ে তাই দিয়ে পৃথিবীর গায়ে বাড়ি। গরুর মত।

কত মায়া এর মধ্যে। কিছুই ফেলার নেই। এসব আমায় ভাবায়। বড় বড় ইঁটখোলার গর্ত আমায় অন্ধকারে ডাকে।

॥ ষোল ॥

কিছু জিনিস আছে যা একই সঙ্গে দেখা যায়, শোনা যায়, আবার ছোঁয়াও যায়। যেমন আর কি ধারাবর্ষণ। খাবার সময় আওয়াজ হয় বলেই জিভেগজাকে কিন্তু আমি এ দলে ফেলছি না।

শুধুই দেখা যায়—কিন্তু শোনাও যায় না—ছোঁয়াও যায় না এমন জিনিসও আছে। যেমন উল্কাপাত। অবশ্য এর সঙ্গে আরও দুটি জিনিস যোগ করতে চাই। তা হল—দূরের পাহাড়ের নিঃশব্দ দৃশ্য। আর যাদের সঙ্গে কোনওদিন কথা বলা হয়নি—যাদের কোনওদিন ছুঁয়েও দেখিনি—সেইসব মেয়েরা যাদের আমি সারাজীবনের নানা সময়ে দেখেছি।

রোদ্দুর বা জ্যোৎস্নাকে শোনা যায় না—দেখা যায়। ছোঁয়া যায় বলব না। বলব টের পাওয়া যায়—মালুম হয়। আরেকটি জিনিসও টের পাওয়া যায়। তা হল বন্ধুত্ব। যা কেনা একটু একটু করে বেড়ে ওঠে। এমনিতে দেখতে পাওয়া যায় না। শোনা তো যায়ই না। ছোঁয়াও যায় না। টের পেতে হয় একটু একটু করে।

কী একদমই দেখা যায় না? শোনাও যায় না? এমন কি ছোঁয়াও যায় না?

সময়। বাতাস। হৃদয় খোঁড়া।

অথচ বন্ধুত্ব গড়ে উঠলে অর্ডিনারি সময় আস্ত একটা যুগ হয়ে যায়। পেছন ফিরে তাকালে সবই দেখতে পাই। শুনতে পাই। এমন কি ছুঁতেও পারি।

তখন নিজেকেও সে-যুগের একজন কুশীলব মনে হয়।

নানান সময়কে জুড়ে আস্ত একটি যুগ করে দেয় যে ফেবিকল, তাই-ই বন্ধুত্ব। নতুন নতুন তিরিশ পেরিয়ে তাই একদিন কলকাতায় অ্যানাউন্স করি—আয় মেশামেশি করি। ঘন ভালবাসাবাসি করি। আমিই লাভ লাভ অ্যান্ড লাভ কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর। খুব কনডেন্সড বন্ধুত্বর জন্যে অনেকদিন আগে সবাইকে ডেকেছিলাম—আয় আমার কাছে দুশো টাকা আছে, আমার সঙ্গে মিশবি ?

তখন শ'ব্রাদার্সের একদিকটায় বেঞ্চে বসতে হত। কমলদা ছিলেন কি ? মনে করতে পারছি না। মতিকে সেদিন পাওয়া যায়নি। সুনীল ছিল। বিমল রায়চৌধুরী, শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। সম্ভবত উৎপল। তারাপদ। দীপেন তখন খেত না। পরে একদিন টিভির প্রোগ্রামের পর আমার আর সুনীলের সঙ্গে বসেছিল মরে যাওয়ার ২।১ বছর আগে। আর ছিল সন্দীপন। হুইস্কি বোধ হয় দু'টাকার ভেতর পেগ ছিল। শক্তিও ছিল। তখন ও কোথায় কখন ভেসে উঠবে বোঝা যেত না।

আসলে পানীয়র চেয়ে সঙ্গটাই বড় ছিল। ঠিক এভাবেই আজকে বলতে পারি, লেখালেখিও ছিল একটা অছিলা মাত্র। আসল লক্ষ্য ছিল বন্ধুত্ব। মেশামেশি। ঘন ভালবাসাবাসি। একদম কনডেন্সড। যা দিলে অনেকগুলো হৃদয় একসঙ্গে একটি পায়েসে মিশে যায়।

সেই ঘন মেশামেশির জন্যে সারা কলকাতা একখানি কাঁসার থালা হয়ে তার ওপর আমাদের তুলে ধরেছিল। বালক বয়সটা যুদ্ধের ভেতর কৈশোরে ঢুকে পড়েছিল। কলেজে পড়তে যাব—যুবক হয়ে উঠব—এমন সময় দেশটা ভাগ হয়ে গেল।

মাঠকে মাঠ কলোনী হয়ে যাচ্ছে। মিছিল। গুলি। ভোরবেলা দোনলা পাজামা পরণে সত্যজিৎ শুটিংয়ের জায়গা দেখে হেঁটে বাড়ি ফিরছেন। পাজামায় চোরকাঁটা। আমরা চায়ের দোকান থেকে দেখতে পাচ্ছি—সুবেশ প্রেমেনদা ট্রামে চড়ে তাস খেলতে চলেছেন আনোয়ার শা রোডে—তারাশঙ্কর শারদীয় উপন্যাস সঞ্জীবনী ফার্মেসি রি-রাইট করে আরোগ্যনিকেতন করছেন—বিভূতিভূষণ নেই। আমরা পাস করে—ফেল করে—টিউশানি করে—পার্টি করে—প্রেম করে চাকরি খুঁজছি—পাচ্ছি না—আবার পাচ্ছিও।

এরই ভেতর এক এক জায়গা থেকে লিটল ম্যাগাজিন ফুঁড়ে বেরুচ্ছে। বাড়ির গ্যারাজ ঘরগুলো মাসিক তিরিশ টাকা ভাড়ায় কাপড় ইস্ত্রির দোকান হয়ে যাচ্ছে। কাগজের রিমও তিরিশ টাকা। এক ফর্মা ছাপতেও তিরিশ টাকা।

এর ভেতর হই হই করে বিমলের কবিতার কাগজ ইদানীং বেরুচ্ছে। এজেন্সি, কমিশন, হকার, ফর্মা, লেখা নিয়ে বিমল ব্যস্ত। বিমল রায়চৌধুরী। আমাদের

ভেতর একমাত্র বিবাহিত দম্পতি। ওরা খুবই কম বয়সে বিয়ে করেছিল। আমার সঙ্গে আলাপ ছিল। স্কুলের বন্ধু শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল। ওরা কবিতা লিখত। গল্প লিখত।

ওরা সবাই গরচা রোডের কাছে আলফা কেবিন নামে এক মোটর সারাইয়ের গ্যারেজের গায়ে বসত।

সময়টাকে এখন বড় মধুর লাগে। ভবানীপুর, টালিগঞ্জ, হাজরা, এলগিন—প্রায় বাড়িতেই মাধবীলতা, পাতাবাহার। দশমীর রাতে প্রায় মণ্ডপেই জলসা। ট্রামে বসার জায়গা পাওয়া যেত। একবার স্কুলের চাকরিতে অনার্স গ্রাজুয়েটদের খুব মায়না বেড়ে মাসে একশ পঁয়ত্রিশ টাকা হয়ে গেল। তখনই পাড়ায় পাড়ায় রবীন্দ্রসংগীতের চল বেড়ে গেল। সফল প্রেমিক-প্রেমিকারা বিয়ে করে ফেলতে লাগল। তাদের অনেকে এখন স্কুল-কলেজের বই লেখে। কেউ কেউ অনেকদিন হল প্রিন্সিপাল।

ঠিক কোন্ দিকে যাব—কি করব—সেদিন কি কেউ তা জানতাম! না ভেবেচিন্তে এগিয়েছিলাম! একদিন নতুন চালু স্টেটবাসের বেহালামুখো সাত নম্বরে ঘাম আর গরমের ভেতরে নেয়ে ওঠা এক ভদ্রলোককে দেখিয়ে শঙ্কর বলল, জীবনানন্দ। খদ্দরের ধুতিপাঞ্জাবি—পায়ে কালো পাম্পসু। সম্ভবত ওদিককার কোনও নতুন কলেজে ইংরেজি পড়াতে যাচ্ছিলেন।

কিছুদিন বাদে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এক পেট্রল পাম্পের গায়ে জীবনানন্দকে দেখলাম। খালি গা। দু-হাতে দু-বালতি জল। নিজেই বারান্দা ধুচ্ছেন। শঙ্কর আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। সন্ধ্যের মুখে লেকে বেড়াতে যেতেন। সকালে লেকমার্কেটে কোনও কোনও দিন বাজার করতেন। ব্যাগ থেকে লাউশাক ঝুলে আছে। একদিন দেখি বুদ্ধদেব উল্টোদিক থেকে হাঁটতে হাঁটতে এসে তাঁর সঙ্গে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে কী নিয়ে কথা বলছেন। এসব আমাদের কাছে দৃশ্য। আমি হয়ত তার আগেরদিনই শঙ্করকে নতুন একটি গল্প শুনিয়ে কয়েক ঘণ্টা হল লেখক হয়েছি। পরে জীবনানন্দের সঙ্গে হেঁটেছি। পরে বুদ্ধদেবের সহৃদয় ব্যবহার না পেলে নতুন খোলা বিষয়ে এম এ-তে কারখানা-ফেরত এই বাতিল আমার ভর্তি হওয়াই হয়ে উঠত না। প্রেমেনদা একটি গল্প পড়ে নিজের থেকেই একজন কর্তাব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত না করালে খবরের কাগজে আমার যাওয়াই হত না। সেই গল্পটিই তারাশঙ্করের খুব খারাপ লেগেছিল। গল্পটি হারিয়ে গেছে। কিন্তু তারাশঙ্করের আন্তরিকতা ভুলি কি করে? এই অর্বাচীনের পাণ্ডুলিপি কাটতে কাটতে তিনি দেখিয়ে দিয়েছিলেন—লেখায় সংযম কী জিনিস। একই ভাবে আলাপ হয় সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে। একটি ফেরত-গল্প নিয়ে পড়তে পড়তে। সন্তোষকুমার কাঁচা পেঁয়াজের ঝাঁঝ পেয়েছিলেন। আমি অনেক পরে নিজেও তো সাহিত্য-সাপ্তাহিকের সম্পাদক হয়ে শৈবাল মিত্র, অমর মিত্র—আরও আরও কাউকে

দেখিয়ে আবিষ্কারের আনন্দ পেয়েছি।

আজ যাকে পঞ্চাশের দশক বলা হয়—সেই তখনটা ছিল আমাদের কাছে অর্ডিনারি সময়। বন্ধুত্ব, ভালবাসা, অনুসন্ধান, আবিষ্কারের ময়াম গায়ে মেখে তা হয়ে গেল যুগ।

অনেকে লিখতে এসেছিলাম। বলা ভাল বন্ধুত্ব করতে। একঝাঁক ঝাঁঝালো যুবা। তার ভেতর লেখালেখিটা ফাউ। কখন যে এই ফাউ হয়ে দাঁড়াল আসল তা টেরও পাইনি কেউ। কারও বাবা কেরানী, কারও বা স্কুলমাস্টার, কারও স্বর্গত - আবার কারও নিষ্কর্মা, কারও প্লিডার।

ভাড়া বাড়িই নিজের বাড়ি। জ্বর, মাথাধর, চৌয়াঢেকুর তো ছিলই না। অসুখ বলা যায়—প্রবল উৎসাহ, খিদে, আশা আর ভালবাসা। এদের ভেতর যাদের বাবা উকিল, সওদাগরি অফিসে বড়বাবু ছিলেন—তারা সকালে বিকেলে বাড়িতে জলখাবার খেত। তখনও লুচি বিদায় নেয়নি। বাড়িতে ট্রামে বাসে অনেকেই ধুতি পরতেন। একখানি নতুন বই বেরোনো মানে একটি ঘটনা। সুবোধ ঘোষের এক-একটি গল্প আমরা গোল হয়ে শুনেছি। একজন পড়ত আমরা শুনতাম। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সন্তোষকুমার ঘোষ, বিমল কর, নরেন্দ্রনাথ মিত্র—পড়তে পড়তে মনে হত রাস্তার একটা স্টেশন পেয়ে গেলাম। এবার আমরা পথ চিনতে পারব।

কে কে লিখবে তখনও পরিষ্কার হয়ে ওঠেনি। ভবিষ্যতের মুখখানি তখনও কুয়াশায় ঢাকা। সেদিন সারা কলকাতা পেরিয়ে উত্তরে গেছি। ওরা সারা কলকাতা পেরিয়ে দক্ষিণে আসত। বন্ধুরা তখন যেন শ্যামবাজার থেকে বেহালায় তীর্থে যাচ্ছে।

মিহির মুখোপাধ্যায় পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলনে জেল খেটে কলকাতায় চলে এসেছিল। থাকত টালিগঞ্জ রেলপুলের গায়ে দিদিমার বাড়িতে। সেখানে সবাই আমরা গিয়েছি। শঙ্কর, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়। ওখানেই বিমল ভৌমিক, ক্ষেত্র গুপ্ত আসত। বিমল কবিতা লিখত। পরে চিত্র পরিচালক। ক্ষেত্র আজ সমালোচক। মিহির অনেকগুলো ভাল গল্প লিখেছিল। ও আমাকে প্রফুল্ল রায়ের অগ্রণী পত্রিকায় নিয়ে গিয়েছিল।

এক বর্ষার বিকেলে মিহিরের বারান্দায় বসে আমি, শঙ্কর, মিহির বিভূতি-ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রাণুর প্রথম ভাগ নিয়ে কথা বলছি। ঠিক এমন সময় বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় আমাদের সামনে এসে হাজির। বগলে জুতোর বাক্স।
—এখানে কবি কালিদাস রায়ের বাড়িটা কোন্ দিকে?

আমরা তিনজন তো চমকে উঠে দাঁড়িয়েছি। কী কাণ্ড! যাঁকে নিয়ে কথা বলছি—তিনিই চোখের সামনে? আশ্চর্য! জানতাম, উনি দ্বারভাঙায় থাকতেন। বাড়িটা দেখিয়ে দিলাম। কাছাকাছি—পরের গলিতে।

শঙ্করদের বাড়ির একতলায় ওর বাবার ঘরে আমরা দুপুরে বসতাম। তখন

ওর বাবা কোর্টে থাকতেন। শঙ্কর এক কেটলি জল নিয়ে বসত। উঁচু করে খেতে সুবিধে। সারাদিনে যে-যার সময় করে ওর ঘরে আসত। সবাইকেই বসতে দিত। অরবিন্দ গুহ, আলোক সরকার, বিমল, সুনীল, শীর্ষেন্দু, বরেন, দীপেন—কে নয়! শক্তি, দিব্যেন্দু, শরৎ।

এর ভেতর সিগনেটের সুন্দর ভাষায় ছাপা—ছোট্ট টুকরো কথা অবাক হয়ে পড়তাম। বইগুলোও বড় সুন্দর করে বেরোত।

আনন্দবাজারে গল্প লিখলে খুব কম লোকে পড়ত। উদ্বাস্তুর ঢল নামলে যুগান্তর কয়েকবছরের জন্যে কলকাতা দখল করে নিয়েছিল। কলকাতায় আনন্দবাজার খুবই কমে গিয়েছিল। যা চলত মফঃস্বলে। তিনআনা দামের সাপ্তাহিক দেশ হাজরার মোড়ের বড় স্টলের মাস্টারদা গাদা করে দড়ি বেঁধে ফেরত দিতেন।

একদিন উৎপল বসুর সঙ্গে বেলভেডিয়ারে সদ্য খোলা ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে দেখা। বললেন, কয়েকটা সংখ্যা বেরিয়েছে। এই আমাদের কাগজ—কৃত্তিবাস। লেখা দিন।

সেটা ছিল দুই কি তিন নম্বর সংখ্যা। সুনীল ওর সম্পাদক। একটু-আধটু জানি। খুব তেজি, সুন্দর দেখতে। দীপক মজুমদারের সঙ্গে কে আলাপ করিয়ে দেয় মনে নেই। তারপর তো শক্তি। তিনজনেরই সুন্দর গানের গলা। একদম খোলামেলা। ওদের কম চিনতাম। কিন্তু দেখা হলে কী যে ভাল লাগত। ওরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়ত। গালুডি, চাইবাসা—কত জায়গায়। ফিরে আসার পর খবর পেতাম। আপসোস হত। ওদের সঙ্গে সন্দীপন থাকত। তখন সন্দীপন ধুতির কোঁচা ঝুলিয়ে আদ্দির পাঞ্জাবি পরত। ওর বাঁ হাতে বোধহয় একটা আংটি ছিল। একবার এক জায়গায় সারারাত থাকতে হয়। ও সেই আংটিটা আমাদের সেখানে গচ্ছিত রেখে সকালে টাকা যোগাড় করতে বেরিয়েছিল। টাকা আসবে এই আশায়—যাদের বাড়ি তারা আমাদের জন্যে ভাত বসিয়েছিল। খুব খিদে পেয়েছিল আমাদের। কারণ শেষ শক্ত খাবার খেয়েছিলাম তার আগের দিন দুপুরে। বাড়িতে। তখনও আমাদের কারও বিয়েই হয়নি।

একদিন সন্ধ্যেবেলা কফি হাউস থেকে সুনীল ডেকে বাইরে নিয়ে গেল। তখন কথা ও কাহিনীর আশপাশে মাটির মেঝেতে চেয়ার টেবিল পেতে চায়ের দোকান। সেদিন কেন জানি লম্ফের আলো সেখানে। সুনীল তার প্রথম কবিতার বইখানি আমায় উপহার দিয়েছিল।

কলকাতায় তখন এক একদিন এক এক রকমের ঢেউয়ে ভেসে এক এক দিকে চলে যেতাম। পার্ক সার্কাসে—ঠিক কোন্ গলিটা মনে নেই—পয়গম অফিসে যেতাম। টাইপ কেস ভর্তি আটচালা ধবনের অফিস। সেখান থেকে মহম্মদীও বেরোত।

শুনেছি আক্রাম খাঁয়ের নাতি—গওসল ওই দুটি কাগজ বের করতেন। সেই গওসল—খুব ফর্সা—আমাদের চেয়ে বছর পনেরোর বড়—কিন্তু খুব মিশুকে ছিলেন। তাঁর অফিসে বসে নানা আড্ডা হত। দীপেন আসত। মিহির সেনও আসত।

এই সময় পান্ডুলিপি নিয়ে আমরা ডাক পেলেই গল্প পড়তে যেতাম। যে কোনও সাহিত্যসভায়। এ-বাড়ির ছাদে। ও-বাড়ির বারান্দায়। এভাবেই চলে যাই কংগ্রেস সাহিত্যসভায়। সেখানে গিয়ে দীপেনের সঙ্গে দেখা। এই ঘটনাটা দেখি গৌরীদা—গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য তাঁর বইতে লিখেছেন। সভায় ছিলেন প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেই সময় সাপ্তাহিক দেশের সম্পাদক হিসেবে সাগরময় ঘোষের নাম ছাপা হত না। তিনিই আসল সম্পাদক সবাই তা জানতেন। একটু বেলার ট্রামে উঠে তিনি একটি বিশেষ জায়গায় বসে অফিসে যেতেন। সাহেব বিবি গোলাম ধারাবাহিক বেরিয়ে দেশকে জনপ্রিয় করে তুলল। আমরা গল্প লিখতে এসে গেছি। সমীর সরকার—সুবোধ দাশগুপ্ত—সুধীর মৈত্র ছবি এঁকে গল্পগুলোকে মনোহর করে তুলল।

একদিন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মরে গেলেন। তাঁর শবযাত্রা এগিয়ে যাচ্ছিল। আমি আর দীপেন ওয়েলেসলিতে দাঁড়িয়ে।

কিছুদিন বাদে মানিক স্মৃতি পুরস্কার ঘোষণা করল উল্টোরথ। মতি প্রথম হল। তার গল্প পেলাম পরিচয়ে। বেহুলার ভেলা। কাছাকাছি সময়ে দেবেশ প্রায়ই দেশে গল্প লিখছে। আমরা পড়ছি আর চমকে চমকে উঠছি। দীপেন দিল অশ্বমেধের ঘোড়া, চর্যাপদের হরিণী। সুনীল লিখল মহাপৃথিবী। সম্ভবত নৈহাটির সোমনাথ ভট্টাচার্যের গল্পের কাগজে। ভুল হতে পারে। আশ্চর্য ভাল গল্প! বরেন লিখল বজরা, কানি বোষ্টমীর গঙ্গাযাত্রা। শীর্ষেন্দুর প্রথম গল্প সম্ভবত দীপেন ছেপেছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পত্রিকায়। গল্পটির নাম সম্ভবত বিড়াল। ভুল হতে পারে। প্রফুল্ল রায় সাপ্তাহিক দেশে লিখল মাঝি। ও তখন তপন থিয়েটারের উল্টোদিকে এক স্বর্ণকারের সামনের ঘরে থাকত। কী উৎসাহ। ন্যাশন্যাল লাইব্রেরি যাবার পথে জিরাত পুলে দাঁড়িয়ে ওর প্রথম উপন্যাসের খসড়া বলল। অতীনের নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে তখন আলাদা গল্প করে নানান কাগজে বেরুচ্ছে। কে আর ওকে তখন ধারাবাহিক লিখতে বলবেন! আশ্চর্য মুন্সিয়ানায় সেই গল্পগুলো জুড়েই ভবিষ্যতের নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে বেরোয়। দেশ ভাগের ওপর শিল্পসম্মত সেরা লেখা। প্রথম খণ্ডটি তো অবশ্যই। আমি বিষয়টি লিখতেই পারিনি। সুনীল লিখেছে—অর্জুন। প্রফুল লিখেছে—কেয়াপাতার নৌকো।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশী স্টিমার কোম্পানী খুলে যাত্রী যোগাড়ের

জন্য যাত্রীদের উপহার দিতেন টিকিট কিনলে। মহাত্মা শিশিরকুমার অমৃতবাজার পত্রিকার গ্রাহক বাড়ানোর জন্য পাঠকদের গামছা ইত্যাদি উপহার দিতেন।

স্টিমার, থিয়েটার, খবরের কাগজ ব্যবসা হয়ে দাঁড়াতে সময় নিয়েছে। হবার পর উপহার উঠে গেছে। আমাদের লেখা বিক্রিবাটার দশায় উঠে এলে যেটা উঠে গেল—তার নাম বন্ধুত্ব।

দেশে ধারাবাহিক সাহেব বিবি গোলাম লিখে বিমল মিত্র পান পাঁচশ এক টাকা। পারাপার লিখে শীর্ষেন্দু পায় পাঁচশ এক টাকা। কুবেরের বিষয়আশয় লিখে আমি পেয়েছিলাম হাজার টাকা। এমন কিছু নয়।

লিখে বাড়ি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, সমরেশ বসুও করেছেন। বাড়ি কিনেছেন বিমল মিত্র। পরে তো বাড়ি, ফ্ল্যাট অনেকেই করেছে—অতীন, প্রফুল্ল, সুনীল, শীর্ষেন্দু। এরকম করায় একটা আনন্দও আছে। চাকরি আর লেখা মিলিয়ে আরও অনেকেই এসব করেছেন। বই থেকে বাড়ি—আশাদি, গজেনদাও আছেন।

এই ব্যাপারটা বলছি এই কারণে যে লেখার শুরু হয় যন্ত্রণা, আবেগ থেকে। তা থেকে বাড়ি-ঘরদোর হয়ে গেলে—লেখাটা প্রফেশন হয়ে গেলে তার ভেতর দক্ষতা যেমন আসে তেমনি হারাবার জিনিসও অনেক ঘটে। যার প্রথম বলি—বন্ধু। কারণ লেখককে ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়। বন্ধু আর লেখাকে মিলিয়ে মিশিয়েই তো আমরা হয়ে উঠছিলাম। তার ভেতর বন্ধু হয়ে গেল বাস্ত। কেজো। দরকারের কড়ি যোগাড়ে সে জড়িয়ে গেল। পড়ে থাকল লেখা।

আমরা কেমন বন্ধু ছিলাম? আজ থেকে ১৫ বছর আগে শঙ্কর মরে যেতে লিখেছিলাম, শঙ্করের পৈতের পর ন্যাড়া মাথায় স্কুলে এসেছিল। আমরা অনেকেই পালাজ্বরে ভুগতাম। সেজন্যে ক-দিন অ্যাবসেন্টের পর ক্লাসে এসে দেখি শঙ্কর ন্যাড়া। যখন শুনলাম পৈতে হয়ে গেছে এর ভেতর—তখন খুব অভিমান হল। আমি বাদ পড়লাম? ও আমার মন ভাল করতে ব্রত ভিক্ষার পয়সা দিয়ে মার্বেল লাগানো লেমোনেডের বোতল অর্ডার দিয়েছিল।

ওদের বাড়ির দিকটায় পিচরাস্তা থেকেই নদীর সাদা বুকখানা দেখা যেত। বাতাস উঠলে নদী ছুঁয়ে আসত বলে তা ঠাণ্ডা লাগত। ওদের বাড়ির সামনের স্কুল মাঠে পূর্ণিমা পূর্ণ চাঁদের মায়ায় ধরা দিত।

আমাদের এখন যা বয়েস—সম্ভবত মেসোমশায়ের তখন সেই বয়স ছিল। তাঁর প্রথম সন্তান শঙ্কর। মাসিমা তখন আমাদের এখনকার স্ত্রীদের বয়সী ছিলেন সম্ভবত। সাদা রঙের দোতলা বাড়ি। স্পোক লাগানো মোটরগাড়িতে কুকুরের ডাক হর্ন। রবীন্দ্রনাথ সদ্যগত। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন এসে গেল। জাপানীদের জন্যে ব্ল্যাক আউট। আমাদের বাবারা তখন প্রবীণ যুবা। পাকিস্তান হবে কি হবে না—তাই নিয়ে প্রায়ই তর্ক হয়। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র একদিন

আমাদের শহরে সভা করে গেলেন। পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে দেখলে সবটাই এখন রূপকথা।

শঙ্কর তখন দেবোপম বালক। প্রকৃত অর্থেই দেবোপম। যুদ্ধ এসে খারাপ কথা শোনাচ্ছে আমাদের। খারাপ কাজ। কারও বাবা চোর হয়ে যাচ্ছে। মত্ত মার্কিন সেনা শহরের দিঘিতে প্রকাশ্যে বারাঙ্গনা নিয়ে সাঁতার কাটছে! দিঘির চতুর্দিকে আধা শহর আধা গাঁয়ের মানুষের ভিড়। তার ভেতর শঙ্করের গায়ে শ্বেত পাথরের রং। কণ্ঠে পর্বত।

এসব জিনিসের ভেতর শঙ্কর কখনও পটু হয়নি। চতুর হয়নি। দলে পড়ে বালকোচিত কুকাজ করে সরলভাবেই স্যারের হাতে মার খেয়েছে! কখনও সফল ভাবে পালাতে পারেনি। আমরা তখন খারাপ কথাও শিখছিলাম। শঙ্কর কোনদিন একটিও খারাপ কথা বলেনি। কোনদিন না।

আমরা স্কুলসুদ্ধ ছেলে একবার সবাই মিলে হেডস্যারের মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম। তাতে কাননদেবীর ছবির গান ও সংলাপের প্রভাব ছিল। আসল প্রেম ছিল প্রেমাঙ্কদার। আমি আর শঙ্কর চরণদার মাত্র!

সেই সময়েই মনে হয়েছিল এই ঘটনায় শঙ্কর একটু একটু করে সুদূর এবং নিঃসঙ্গ হয়ে যাচ্ছে। আমার হিসেবে সম্ভবত ভুল নেই। তখন যে রোদ, বৃষ্টি, শীত এখনকার মতই প্রবল ছিল—তা বুঝিনি কোনদিন।

একদিন স্কুল-মাঠ থেকে ডিউজ বল ছুটে এসে শঙ্করের কানের কাছে লাগল। ও সেই প্রচণ্ড ব্যথায় নিঃশব্দে চোখ থেকে চশমা খুলল আগে। ঠিক যেভাবে দুঃসংবাদের চিঠি পড়ে আমাদের বাবারা চোখ থেকে চশমা খুলে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকত। এই ঘটনা আমি অবাক হয়ে দেখেছিলাম। কারণ আমি তখন ফিল্ডিং দিচ্ছি। আজও ভুলতে পারিনি সে ছবি। অনেক পরে শঙ্কর চেঁচিয়ে উঠেছিল।

একদিন ওকে পেয়েছিলাম—নদীর কাছাকাছি জেলখানার ঘাটে। যার গায়ে কয়েকদিনের বসানো ঝাউগাছগুলো দিনরাত দীর্ঘশ্বাস ফেলত। ওপারে একটা টিনের গুদামের গায়ে বড় করে লেখা ছিল—বরফ কল। বর্ষার দেওয়াল উঠলেও ওই অক্ষর দুটো ঝাপসা মত পড়া যেত। এই নির্জন পথে ক্লাস সেভেনের শঙ্কর কেন যে হেঁটে বেড়াত! কেন যে জেটির পাটাতনে একা অসময়ে থাকত—তা জানি না। তখন নদীর পাখিগুলো স্টীমারের ভোঁ বাজলে খুশিতে ছররা হয়ে ছড়িয়ে পড়ত। শঙ্কর একা দাঁড়িয়ে দেখত।

পরে টু অ্যান্ড টু করে বুঝেছি—শঙ্কর আমাদের সবার আগে একা হয়ে যাওয়া শুরু করে দিয়েছিল। ভীষণ কম বয়সে। যখন আর কি খেলে বেড়াবার দিন। রোদে পোড়ার আর বৃষ্টি ভেজার দিন। তখনই। একইভাবে অন্য বন্ধুরাও পরে পাল্টে যাচ্ছিল।

দেশ-বিভাগ এসে আমাদের বাবাদের মাথায় দুম করে এক ঘা হাতুড়ি কষাল। তখন তাঁদের মধ্য-সংসার। এপারে এসে ওঁদের আবার সবকিছু গোড়া থেকে শুরু করতে হল।

ফলে আমাদের জীবন যেমন চলছিল—তেমন আর চলল না। তাছাড়া আমাদের বদলে যাবার বয়স এসে গিয়েছিল। তখন কলকাতায় সপ্তাহে দুদিন গুলি চলত। পাঁউরুটির কুপন ব্ল্যাক করলে ভাল পয়সা পাওয়া যেত। বি এ পাস করলেই শহরতলির স্কুলে একটা কাজ পাওয়া যেত। শ-দেড়েক টাকা আয়ে অনেকেই প্রেম করে বিয়ে করে ফেলল। মাথা ধরে না, জ্বর হয় না, হাঁটতে ভাল লাগে। এই অবস্থায় শঙ্কর সমেত আমরা অনেকেই পকেটমার, ওয়াগন ব্রেকার কিংবা মাস্তান কেন যে হইনি সেটাই আশ্চর্য। হয়ে গেলাম কবি। কেউবা হল গল্প-লেখক—ঔপন্যাসিক।

তার বদলে শঙ্কর পূর্বাশায় গল্প লিখল। গল্পটির নাম ছিল ঃ কোকিল। একদিন ওর পাণ্ডুলিপি দেখলাম। অ-কার ই-কারের কী সুন্দর টান! আর তা পড়ে শোনানোর সময় ওর কণ্ঠ কী মন্দ্র।

আমি নিজেই বোধহয় শঙ্করের আয়ু থেকে এক বছর চুরি করেছিলাম। টানা পঁচিশ বছরে আমার যত পাণ্ডুলিপি ওকে পড়ে শুনিয়েছি—তাতে নিশ্চয় ওর কান এবং ধৈর্যের ওপর অসম্ভব অত্যাচার হয়েছিল। কোনদিন বলেনি, আর ভাল লাগছে না। বরং বলেছে, পড়ে যা—শেষ কর—সবটা শুনি।

আমার প্রথম গল্পটির প্রথম শ্রোতা শঙ্কর। ওর ঘুম ভাঙিয়ে দেশপ্রিয় কাননের শিশিরভেজা ঘাসে বসে খুব ভোরে ওকে শুনিয়েছিলাম। সব সময়েই বলেছে, থামিস না। পরে মতি বলেছে, ও দেশবন্ধু পার্কে মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে গল্প শোনাত।

নিজের লেখা পড়ে শোনানোর সময় ভয়ঙ্কর লাজুক হয়ে পড়ত। ও আসলে যত মনোযোগ দিয়েছে—তার চেয়ে আমি ওকে কম মনোযোগ দিয়েছি। তা পুষিয়ে দিতাম—ওর মুখে হাসি ফুটিয়ে। ওকে হাসিয়ে। আনন্দ দিয়ে। ও চলে যাবার মাসখানেক আগে একদিন রাত দশটার পর সপরিবারে ওর বাড়ি গেলাম। ওর মুখে হাসি ফোটাবার জন্যে আমি আর আমার বড় মেয়ে ওকে নেচে দেখালাম। কী হাসি! হাসতে হাসতে বিছানায় শুয়ে পড়ছিল। ও হাসলে যে কী সুন্দর লাগত আমার। আমার মা, স্ত্রী, ছোট দুই ভাই, বউমাবা ওকে দেখলে খুব খুশি হত।

ক্লাস ফাইভে ওর সঙ্গে একবার আমার বিয়ে হয়। মফঃস্বল স্কুলে আমরা লাস্ট বেঞ্চে বউ-বউ খেলতাম। 'শহর থেকে দূরে' আমাদের উল্লাসিনী সিনেমায় রিলিজ দিলে—ওকে আমরা ডাক্তার বলে ডাকতাম। ডাক্তার! ও ডাক্তার!!

ওর আনন্দের জন্যে আমি বহু সময় ভাঁড় হয়েছি। আমি, মিহির, শঙ্কর

খবরের কাগজ বেচে দীপ্তিতে হিন্দি সিনেমা দেখেছি। একজন চোর পর্দায় দর্শকদের মুগ্ধ করছে। শঙ্কর আমার উরুতে থাপ্পড় মেরে পর্দায় আঙুল দেখিয়ে বলছে, মিহির, ওই তো শ্যামল! আমাদের শ্যামল! যা কিছু অদ্ভুত, যা কিছু অসম্ভব—সেইসব ভূমিকায় আমায় ভেবে নিয়ে ও আনন্দ পেত। আমি কখনও কখনও ওর চোখে স্যার ওয়াল্টার মিটি হয়েছি। কারণ ও আমার চেয়ে ভাল লোক ছিল। আদৌ জটিল নয়। সরল, ব্যথা-পাওয়া মানুষ। আমি তা ছোটবেলা থেকেই জানতাম। পরে দেখেছি—সুনীল আর মতি আমাকে দেখলে আনন্দ পেত।

কলকাতায় বড় মার্ডার কেস, বিদেশে ব্যাঙ্ক রবারি, খবরের কাগজের কেপমারি কেস—ওর চোখে সবকিছুর কাল্পনিক নায়ক ছিলাম আমি। আমি আট মাস অন্তর নতুন নতুন প্রেমে পড়তাম। তাই ছিল বেকার জীবনের চকোলেট। প্রতিটি প্রেমের দু-তরফের ডায়ালগ ওকে আমার শোনাতে হত। শেষে একটা দুঃখের টাচ দিতাম। তাতে ওর মন ভারি হয়ে যেত।

আমাকে নিয়ে ও অনেকরকম পরীক্ষা করেছে।

যেমন ঃ—

এক ঃ ওদের বাড়ির একতলার ঘরে জল ও গ্লাস থাকবে। তৃষ্ণা পেলে সবাই জল খেতে পাবে—আমি পাব না। মনে করতে হবে আমি মরুভূমিতে আছি। এসব কথা মাত্র ২৬।২৭ বছর আগের। তখন শঙ্কর ডেজার্ট! ডেজার্ট!! বলে চেঁচাবে। এতে ওর আনন্দ ছিল।

দুই ঃ দোতলায় ওঠার সিঁড়ির ল্যান্ডিং-এ আমি পেছন ফিরে দাঁড়াব। ও পাছায় লাথি কষাবে। তখন আমি ঘুরে গিয়ে পড়তে পড়তে নামব। কিংবা ওই ল্যান্ডিংয়েই ও কুকুর লেলিয়ে দেবে। আমায় ভয় পেয়ে ছুটে নামতে হবে।

এই দুটো কাজ করে ওর মুখে হাসি দেখে আমি কী আনন্দ পেতাম! তার তুলনা নেই। একদিন বিদেশে যাবার দিন সকালে ওর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সেদিনই বিকেলের ফ্লাইটে ব্যাঙকক হয়ে হংকং যাব। বললাম, ফেরার পথে তোর জন্য কী আনব?

আমার জন্যে? কিছু দরকার নেই।

ওর এই অভিমানে আমি ভীষণ কষ্ট পেতাম। ওর কোথায় ব্যথা তাও আমি জানতাম। সেকথা লিখব না।

আমাকে ও পেটুক ভেবে আনন্দ পেত। দেখা হলে বলতে হত—সারাদিনে কী খেয়েছি। ও সেই স্বর্গসুলভ হাসি হাসবে বলে আমি বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতাম। এই তো সেদিন ওর বাড়িতে নারায়ণকে পাঠিয়ে লেকমার্কেট থেকে মাছ আনিয়ে ভেজে খেলাম।

আমার অনেকদিনের ইচ্ছে ছিল—শঙ্কর আর মিহিরকে আমার খামারবাড়িতে

বসিয়ে ৮।১০ রকম মাছভাজা খাওয়াবার। সঙ্গে নিট রাম। মাদুর থাকবে। শুয়ে পড়ব তিনজনে। সবাই গেছে। ওরা দুজন যায়নি। জানি, অভিমান ছিল। হয়ত তেমন করে বলতে পারিনি। সুনীল, মতি, শক্তি, শরৎ, সাগরদা, সন্তোষদা—সবাই গেছে। বিশ্বাস করেছি লেখার চেয়ে বন্ধু, বন্ধুত্ব, ভালবাসাবাসি অনেক বড় জিনিস। এখন দেখছি বুকবাইন্ডার বাংলা লিখছে। যে কোনদিন মারব—পারি না। কারণ লোকে তাহলে গুণ্ডা বলবে।

ও কোনদিন মেয়েদের কথা বলেনি। তবু আমি ১৯৪৬ এবং ১৯৫৩।৫৪ সালে টের পাই বা আঁচ করি—ওর কাউকে ভাল লেগেছে। সেকথা ও কোনদিন মুখ ফুটে বলেনি। তারপর একদম চুপচাপ। মরে যাবার বছরখানেক আগে একদিন বলেছিল—একটা ভাল কাজ পেলে এবারে বিয়ে করব, তা সে একবারই বলেছিল, তার বেশি না। ততদিনে আমরা সবাই বিয়ে করে ফেলেছি। বরেন বাদে।

আমাদের মফঃস্বল শহরের নদীতে বিকেলবেলা স্টীমার আর লঞ্চের ভিড় লেগে থাকত। গারো, ফ্লোরিকান, বালুচ, মাগুরা, কালীনাথ ইত্যাদি সব নাম। কয়লার বয়লারে লোহার কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খালাসীরা কয়লার ছাই ভাঙত। নদীর গায়েই রেল স্টেশনে বুড়ো ইঞ্জিনে তেমনি লোহার লাঠি দিয়ে ক্লিনার বয়লার খোঁচাত। তখনই আমরা 'স্টোকার' কথাটা শুনেছিলাম।

যেদিন চাকরি পেলাম—প্রথম চাকরি - বোধহয় ইস্পাত কারখানায়—শঙ্করের গায়ে সেদিন ফ্লানেলের শার্ট প্যান্ট ছিল—ও আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারখানা হাতে নিয়ে ট্রামলাইনে চেঁচাচ্ছিল—স্টোকার! স্টোকার !!

ওর মনে আনন্দ হলে কাবুলিদের বাংলায় কথা বলত। যেমন—১। এই বালো চেলে! কি কর্‌চো? আকরোট কাবে? কিসমিস্‌ কাবে? পয়সা আচে?

২। এই সুন্দর চেলে! লাথি খাবে? এই সময় ওর লাথি মারার সুবিধার জন্য আমি পেছন ফিরে দাঁড়াতাম।

একবার আমাদের এক বন্ধু তাদের ভাড়াটের মেয়ের প্রেমে পড়ল। মেয়েটির নাম ছিল বেলা। বন্ধুটি সপ্রেমে বলত, বেলু। বেলু দোতলায় থাকত। বন্ধুটি একতলার ঘরে বসে গীটার বাজিয়ে সুরতরঙ্গে দোতলায় প্রেম পাঠাত। মেয়েটির দিক থেকে কোনও সাড়ার চিহ্ন আমরা দেখিনি। শুধু ওদের অ্যালসেসিয়ান গীটার বাজলেই চেঁচাত।

শঙ্করের দৃষ্টিতে আমি স্যার ওয়াল্টার মিটি। শঙ্কর আমাকে ভার দিল, তুই কুকুর সেজে ওর লাভলেটার দোতলায় পৌঁছে দিবি।

কুকুর সাজব কি করে? সেরকম ড্রেস কোথায়?

কেন? চার হাতপায়ে হামাগুড়ি দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠবি। মুখে চিঠিখানা দাঁতে কামড়ে থাকবি। অ্যালসেসিয়ান তোকে নতুন জাতের কুকুর ভেবে কিছুই বলবে না। সেই ফাঁকে বেলুর কাছে চিঠি পৌঁছে দিবি। তখন ওর

দাদা আফসে। শঙ্করের প্ল্যানমত কাজ করতে গিয়ে সেদিন আমি অ্যালসেসিয়ানের খাবার হয়ে যাচ্ছিলাম। আহত শ্যামলকে শঙ্কর সেদিন খুব শুশ্রূষা করেছিল। আমার যে কি ভাল লেগেছিল। ওরও নিশ্চয়ই। এইভাবেই তো আমরা ঘামে ভালবাসায় মেশামিশি করে গল্প লিখতে আসি।

শঙ্কর নিজে সরে যাচ্ছে—প্রায় দশ বছর ধরে টের পাচ্ছি! একদিন দেখলাম, ওর ঘরে অনেক নবীন লিখিয়ের আড্ডা। খুব ঈর্ষা হয়েছিল; ওরা শঙ্করকে খুব ভালবাসে। লেখক শঙ্করকে শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ করে।

আমরা সম্ভবত কাছে থাকি বলে শঙ্করকে সম্যক বিচার করতে পারিনি। ওরা হয়ত পেরেছে। অনেক কবির তো এমন হয়েছে। তাই যেন হয়। তাই যেন হয়।

আমরা অনেকেই চতুর ও সময়োপযোগী। ও তা ছিল না। এরকম লোকই আগে যাবার জন্যে এখানে আসে। ধাক্কা খায়। কষ্ট পায়। সন্ন্যাসী হয়। আমরা অনেকেই পটু। ও ছিল অদক্ষ শিশু। আমাদের যুগে অনেক অদক্ষ শিশু হারিয়ে গেছে।

ভুল করে আমার ওপর রাগ করেছে অনেক সময়। আমিও করেছি। অনেকদিন আগে। এসব শোধরাবার আর কোনও পথ নেই। সেদিন মাসিমা আমাদের সবাইকে সপরিবারে ডেকে খাওয়ালেন। শঙ্করের তাই ইচ্ছে ছিল।

ওর মৃত্যু ঘিরে আমরা অনেকদিন পর আবার ১৯৫১, ৫৭, ৬৪, ৬৭ ফিরে পাচ্ছিলাম। এরপর এক হতে হবে কোনও বন্ধুর জন্যে শ্মশানে কিংবা তার ছেলেমেয়ের বিয়েতে—তাছাড়া নয়।

সবাই মনে মনে জানি খেলাধুলো ফুরিয়ে এল।

এসব তো গেল বন্ধুত্বের কথা। এবার বলি লেখার কথা। তিন বাঁড়ুজ্যে আমাদের মুগ্ধ করেছেন। নানাভাবে মজিয়েছেন জ্যোতিরিন্দ্র, বিমল কর, নরেন্দ্রনাথ, সন্তোষকুমার, সমরেশ বসু। এছাড়া অল্পস্বল্প ভাল লাগিয়েছিলেন প্রবোধকুমার, প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবং বড় দাগে অবশ্যই পরশুরাম আর সতীনাথ।

কিন্তু আমরা এসেছিলাম অন্যরকম লিখব বলেই। সবাই আমরা মানুষের নানান দিক দেখিয়েছি। নানাভাবে দেখিয়েছি। এবং সবসময় চেষ্টা ছিল আমাদের—আমরা যেন আমাদের মত হই।

সব যুগেই সবাই বলে তার সময়টাই সন্ধিক্ষণ। আসলে সময়ের যে কোনও মুহূর্তই সন্ধিক্ষণ। যে সেই সময়ের কেশর ধরে তার পিঠে টিকে থাকতে পারে সেই সফল সময়ারোহী।

প্রায় সবাই একসময় ছাত্র ফেডারেশনের সঙ্গে ছিলাম। অবিভক্ত পার্টিতেও কেউ কেউ। পরে যে-যার মত সরে এসেছি। মেলেনি। রাজনীতিতে প্রায় কেউ নেই। কিন্তু যত দিন গেছে ততই বড় দাগে গান্ধীজীর কথাবার্তা ভাল

লেগেছে। এক বাড়ি তার রান্নাটা পচা বলে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। আমরা তা আদর করে কুড়িয়ে নিয়ে খেয়ে কেন বলব—না না, পচা নয় তো! রান্নাটা তো ভাল আছে! মার্কসবাদ নিয়ে এখন তাই চলছে।

লেখা যার-যার মত এগোচ্ছিল। আজ মনে হয় বিশাল এক সময়ের ব্রড স্পেকট্রামের এক এক জায়গা আমরা এক একজন বেছে নিয়েছিলাম। অশ্বমেধের ঘোড়া, বিজনের রক্তমাংস, বেহুলার ভেলা, মহাপৃথিবী, সাতঘেরিয়া, কানীবোষ্টমীর গঙ্গাযাত্রা, নীলুর দুঃখ ইত্যাদির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। দেবেশ, কবিতা, অতীন, সিরাজ—যে-যার দুনিয়া খুঁড়তে শুরু করে দিয়েছে সেই ৫৪।৫৫ সনেই। যার-যার মত করে।

একদিন বিকেলের দিকে নতুন সাহিত্য অফিসে গল্প নিয়ে গেছি। সমরেশ বসুকে চিনতাম না। বড় সুশ্রী। ঝকঝকে দেখতে ছিলেন। একটি গল্প এগিয়ে দিলেন অনিলবাবুকে। এস্‌মালগার। আলাপও করিয়ে দিলেন অনিলবাবু। সেই বিখ্যাত গল্প। মানুষের জন্যে লেখকের সে কি মায়া—ভালবাসা!

আমরা কিন্তু সমরেশ বসুর মত লিখতে চাইনি। আরও কোনও জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। জীবনযাপন কঠিন হয়ে উঠছিল। যেমন সবারই হয়। সমরেশ আমাদের ভাবিয়েছেন। কোন্‌ পথে গল্পের যে জায়গাটা চাই—সেদিকে আলো ফেলেছেন, কিন্তু যে জায়গায় তিনি জোর দিতেন সেদিকে আমরা যেতে চাইনি।

গোরা, চোখের বালি আস্তে আস্তে ধূসর হয়ে গেছে আমাদের কাছে। সেখানে অনুবর্তন, ইছামতী, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা, তিতাস, পুতুল নাচের ইতিকথা, ঢোঁড়াই অনেক স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এঁদের পাশে গঙ্গা, বারো ঘর এক উঠোন কিংবা আরও যেসব উপন্যাস চল্লিশের দশক থেকে উঠে এসেছিল তা আমাদের কাছে তেমন জ্বলজ্বল করে ওঠেনি কখনও।

মতি মোটর মেকানিকস্‌ শিখেছিল। আমি ওপেন হারথ্‌ ফারনেসে তিনটি বছর ছিলাম। সুনীল অনেক টিউশনি করেছে। তাছাড়া ওর একটা বিশাল ঘোরাঘুরির জগৎ ছিল যার অনেকটাই আমি জানি না। ও উত্তর কলকাতার রস পেয়েছিল। সন্দীপন খুব কম বয়সেই কর্পোরেশনে এবং হাওড়ায়। কবিতা প্রায়ই চাকরি বদলাত। বরেন ছড়া থেকে গল্পে এসে গেল। অতীন জাহাজ থেকে গদ্যে। শীর্ষেন্দুকে প্রথম দেখি কলেজ স্ট্রীটের কাছে এক মেসে। খুবই শরীর খারাপ নিয়ে একদিন ওর মেসের বিছানায় এক কাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভেঙে উঠে দেখি সেই কাতের দিকে আমার কানটা রক্ত-চলাচল বন্ধ হয়ে একদম কালো হয়ে গেছে। শক্তি অন্ততঃ শরীরটাকে সব ঝুঁকিতে ঠেলে দিয়ে নুন দিয়ে সামনের তরল সুস্বাদু করে তুলত। শরৎ একটা বড় পেট্রল কোম্পানিতে কাজ করত। অফিসে অফিসের মত—বাইরে শরতের মত। কেউ

তিরিশ ছাড়াচ্ছি। কেউ পেরিয়ে গেছি। প্রফুল্ল নাগাল্যান্ডে চলে গিয়ে পূর্বপার্বতী লিখল। দেবেশ খুব কম বয়স থেকে ঝকঝকে গল্প লিখতে লাগল। পরিচয় করতে লাগল। ১৯৬৪-তে সাতরঙ কাগজের অফিসে উপন্যাস হাতে সিরাজকে পেলাম। এক একজন এক এক রকমের লোক। দীপেন ১৯৬২-তে একদিন বলেছিল—চীনের কমিউনিস্ট পার্টি আমার চোখের মণি। আমার সামনে বসেই বিখ্যাত গল্প চর্যাপদের হরিণী শেষ করেছিল। ওর বিয়েতে সম্ভবত জ্যোতিবাবু এসেছিলেন। তখন তো শুধু এম এল এ। কাকাবাবু এসেছিলেন কি? মনে নেই। দীপেনের বাবা দেশবন্ধুর অনুগামী ছিলেন। দিদি তো কংগ্রেসের মন্ত্রী। ভাল লেখা পড়লে ছুটে এসে বলত। হাবড়া কল্যাণপুর থেকে হই-হই করে ওর গলা নিয়ে এসে পড়ত তারাপদ। আমি ওদের আউটার পেরিফেরির বন্ধু ছিলাম। আমি কোনদিন কবিতা লিখিনি।

আমাদের ভেতর প্রথম গদ্যের বই বেরিয়েছিল অমলেন্দু চক্রবর্তীর। গল্প সংগ্রহ—সাহানা। কফি হাউসে কয়েকটি টেবিল জুড়ে সভা করে। সম্ভবত বীরেশ্বর সরকার বের করেছিল। প্রথম কবিতার বই আনন্দ বাগচির—স্বগত সন্ধ্যা।

তখন সবাই যেন কি সব লিখব বলে বিশাল এক মৃগয়ায় বেরিয়ে পড়েছি। জানি না কি লিখব। বরং জানি—কি খাব। কোথায় যাব। কার সঙ্গে ভাব করব। কাকে ভালবাসব। কার বুকে মুখ দিতে হবে। একটা ইলোপের চেষ্টা একটুর জন্যে ভেস্তে যায়।

এই সময়টায় দু'শ টাকা মাইনে হলে বিয়ে করা যেত। কিন্তু দু'শ টাকা পাওয়া বেশ কঠিন ছিল। এজন্যে অনেক মেয়ের সঙ্গে আমাদের বিয়ে হয়নি—তাদের সঙ্গে পরে দেখা হলে মনে মনে বলেছি—বাবা, খুব বেঁচে গেছি!

মতির শালীর ছবি দেখেই বিয়ে করে বসলাম। বিয়ে করে কোথায় যাই। সুনীলের অফিসে গেলাম। দুপুরবেলা। গরম। নতুন বউ নিয়ে গেছি। সুনীল বেরিয়ে এল। আমরা বেড়াতে গেলাম। কোথায়? পার্কসার্কাস কবরখানায়। মাইকেলের কবরে। কেন গিয়েছিলাম জানি না। কত কত পাথর ভেঙে পড়ে আছে। তার ভেতর দিয়ে সতেজ বুনোলতা—নাম-না-জানা ফুল। সাম্রাজ্য করতে এসে অসুখ-বিসুখ, যুদ্ধবিগ্রহে কত লোকের অকালবিয়োগ। তার ভেতর অবিবাহিত সুনীল, সদ্য বিবাহিত শ্যামল। আনকোরা ইতি।

এই যে মাইন্ডলেস, অকারণে পুলকিত কলকাতা—তার ভেতর কবন্ধ রাজনীতি, যে যার মূর্খ মুনাফায় মগ্ন—তার ভেতর জীবন বয়ে যায়—অবহেলায় যৌবন যায়—কারও বিরুদ্ধে কোন নালিশ নেই—তার ভেতরেও সুন্দর ভয়ংকর ওঠে—নিয়তি নিয়তির মতই ঘটতে থাকে। এই কথাগুলোই লিখতে চেয়েছি।

সবাই। যে-যার মত করে।

মতি লিখল—দেখতে আসা। সম্ভবত তাই নাম ছিল। গল্পে রেলের ইঞ্জিনের মুখ হাসছে, মতি লিখেছিল। কিংবা একটি মহাদেশের জন্য। সে কি খুন। বারান্দা উপন্যাসেও।

এই তো সেদিন শীর্ষেন্দু লিখল—গঞ্জের মানুষ। গেঁজেলরা গাইতি দিয়ে ছাইগাদা কোপাচ্ছে। ঠং করে আওয়াজ। গুপ্তধন নয় তো? আসলে পুরনো ওয়াগন মাটির নিচে চাপা পড়ে ছিল।

সন্দীপন লিখল—মীরাবাঈ। বিশ্বনাথদা আত্মঘাতী হয়েছিলেন। বিজনের রক্তমাংসে সাবান অন্য মেয়ে খরচ করে দেওয়ায় সাবানের মালিক আরেক মেয়ে ঘেন্নায়, দুঃখে থুথু ছেটাচ্ছে।

সুনীল লিখল—রানী ও অবিনাশ। ওঃ, কী গল্প! শাজাহানের নিজস্ব বাহিনী। আশ্চর্য! চূড়ামণি উপাখ্যান। মনে হয় ভূতে লিখেছে।

প্রফুল্লর সাতঘেরিয়া গল্পের সেই নারী। যার বার বার বিয়ে হয়। মানুষের জন্যে কী মমতা। গল্পের কোথাও কোন আবেগ নেই। পড়ার সময় বুকে ব্যথা করে।

বরেন স্কুলের শিক্ষকতার ফাঁকে ফাঁকে লিখল—কানি বোষ্টমীর গঙ্গাযাত্রা। টিফিনে খানিকটা পড়ে শোনাল। তারপর বাসে করে বিমলদাকে দিতে গেল। আমরাও তো বাসে করে কোথাও যাই। অমন গল্প নিয়ে যাই না কেন?

আমি, সিরাজ, বরেন শেষরাতে ফেরিতে গঙ্গা পেরোচ্ছি। ফরাক্কায়। কাজ তখনও শেষ হয়নি। মালদহের ফুটানিবাজারে সভা। মাইকে সিরাজের দানাদার গলা শুনে মনে হবে কোন কথকঠাকুর কথকতা করছেন। ওর গল্পেও এই কথকতা থাকে। কথা বলতে বলতে ও সড়াৎ করে গভীরে নেমে যায়। নয়ত গোঘ্ন লেখে কি করে?

যদি সবার লেখা ভাল লাগে তো লিখি কেন? গল্পে আমাদের সেই পঞ্চাশের দশকের সবাই যে-যার মত তাক লাগাচ্ছিলাম। কিন্তু যে-ই সবাই অজান্তে উপন্যাসে ঢুকে পড়লাম—তখনই ফারাকটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

আমরা সম্ভবত সবাই সবার উপন্যাস সম্পর্কে খুঁতখুঁতে। শুরুয়াৎ ঠিক আছে। কিন্তু যে-ই আমরা একজন অন্যজনের উপন্যাস পড়তে থাকি—তখন মনে হয়—এটা আমার ধারণা—এ জায়গাটা অন্যরকম হলে ভাল হত।

এই অন্যরকম হলে ভাল হত ভাবি বলেই আমরা যে-যার মত করে লিখে চলেছি। নিজের লেখা তো বটেই, অন্যের লেখা নিয়েও আমরা খুঁতখুঁতে।

তা লেখালিখিরও কম দিন হল না। বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে কম সময় লিখেছেন তিনজন। বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই তুলনায় আমরা অনেকেই ওঁদের চেয়ে বেশিদিন লিখছি।

কম লিখলেই লেখা খুব সরেস হবে, বেশি লিখলেই খুব নীরেস হবে—এর কোন মানে নেই।

বাঙালী তুমি বই কিনবে কম। দাম দিতে চাও কম। আর আমি লিখবও কম। তাহলে খাব কি? খিদে-তেষ্টা নেই? তোমরা যখন পরনিন্দা, পরচর্চা কর—সেই সময়টা আমরা লিখি।

গাভাসকার নই যে রান তুলে টাকা তুলব! চিমা নই যে ক্যাথিকে পেয়ে যাব। সঞ্জয় দত্তর মত আমার বাবা সুনীল দত্ত—মা নার্গিস নন। কিছু গিলে পরীক্ষার খাতায় মাপা সময়ের ভেতর সুন্দর হাতের লেখায় বমি করে দিয়ে রেজাল্টের জোরে ভাল চাকরি বাগাব—সে উপায়ও আমাদের ছিল না। বড়জোর কারও কারও হাতের লেখা ভাল ছিল। আমার অবস্থা আরও করুণ। হাতের লেখা তো খারাপই ছিল—সেই সঙ্গে ভীষণ বানান ভুল থাকত।

এইরকম যাদের দশা—তাদের কেন ভাবতে শেখালেন ভগবান! কেন তাদের মাথায় কল্পনার মেঘ গুঁজে দিলেন! এই সঙ্গে বয়সোচিত আরও কয়েকটি গুণ ছিল। যাকেই দেখি তাকেই সুন্দরী লাগে। ফলে মহা বিভ্রম।

বরেন, সন্দীপন, শক্তি চিরকালই ছিপছিপে ছিল। শীর্ষেন্দু হাড়ে-মাসে। কবিতা আকর্ষণীয় ছিল। তার ওপর চোখে চশমা। আমার একটি উপন্যাস ওকে উৎসর্গ করেছিলাম। সেই উৎসর্গের লাইনটি পড়ে একটি সংবাদপত্রের নবীন মালিক জানতে চেয়েছিলেন, আপনি প্রেমে পড়েছিলেন?

বোঝাই কি করে—কবিতার সঙ্গে প্রেমে পড়া কিছু অস্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু সেরকম কিছু হয়নি। কারণ আমরা প্রায় সবাই কবিতা এবং তার স্বামী বিমলের প্রেমে পড়েছিলাম। বিমল ইদানীং করত। গল্প লিখত। কাঁচা খিস্তি করত। কারও লেখা ভাল লাগলে বা খারাপ লাগলে এসে বলত, ওর বিশ্বাসমত। একবার খাট থেকে পড়ে গিয়ে এমনই ফ্র্যাকচার হল মেরুদণ্ডে যে মাথা, বুক, মুখ সবই প্লাস্টারের আড়ালে। সেই মহাকাশচারীর ঢঙে ও যখন প্লাস্টারের ভেতর থেকে শুধু চোখ দুটো বের করে শ'-র দোকানে ঢুকত তখন প্রথম দর্শনে চমকে উঠতে হত। গভীর রাতে হার্ট-অ্যাটাক হতে রিকশয় করে যদি না হাসপাতালে যেত—তবে ঝাঁকুনি হত না—বেঁচেও যেত হয়ত।

ব্যক্তিগতভাবে আমি বিমলকে দেখলে কেঁপে উঠতাম। আমার ওপরের ভাই কুড়ি বছর বয়সে পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মঘাতী হন। বিমলের মুখ, মাথার চুলের ধাঁচ, তাকানো, গায়ের রং অবিকল দাদার মত ছিল। তাছাড়া ওর মুখকে খুব ভয় পেতাম। যখন-তখন যেখানে-সেখানে যা-তা বলে দিতে পারত।

একবার বিমল-কবিতাকে খাওয়াবার ইচ্ছে হল বাড়িতে। মাকে বললাম, কবিতা এবার রবীন্দ্র পুরস্কার পেয়েছে মা। মা পুরস্কারের ধার ধারতেন না।

ওদের খুব যত্ন করে খাওয়ালেন। খেতে বসে পুরস্কারের কথাটা উঠতে ওদের গলা দিয়ে তো আর ভাত নামে না।

সব লেখকেরই প্রথম দিককার লেখার কিছু শ্রোতা থাকে। গল্প শোনাবার জায়গাও থাকে। মতি সম্ভবত দেশবন্ধু পার্কে বসে কবি শিবশম্ভু পাল আর নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়কে শোনাত। ওরা দুজন তখন শুধুই যুবক। পরে কবি আর নাট্যকার হয়েছে।

আমি শোনাতাম দেশপ্রিয় পার্কের ঘাসে বসে শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়কে। একটা লেখা শুনে শঙ্কর বলেছিল, কোত্থেকে টুকলি ?

বুঝলাম একটু বোধহয় উতরেছে।

আর শোনাতাম সোমনাথ ভট্টাচার্যকে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নাতি গল্পলেখক সোমনাথ নয়। সবার ওপরে, শাপমোচন—সিনেমার গল্পলেখক নিতাই ভট্টাচার্যের ছেলে সোমনাথ। ও পড়েছিল কমার্স। চাকরি পেয়েছিল সাউথ ইস্টার্ন রেলে। মালগাড়ি চেক করত। পরে মিউজিওলজি পাস দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রিডার। এইচ এম টি ঘড়ি কত ভাল তা জানার জন্যে কব্জিতে এইচ এম টি সমেত আমেরিকায় নায়াগ্রার জলে ডুব দিয়ে দেখেছিল।

সন্দীপন ওদের হাওড়ার বাড়িতে বসে আমায় গল্প পড়ে শুনিয়েছে। বাড়ির সামনে বিশাল দিঘি। ৩০/৩২ বছর আগে হাওড়ার বাঙালী গৃহবধূরা বেশি বেলায় কলসী উপুড় করে পা দাপিয়ে পুকুরে ভেসে থাকছে—আজও দেখতে পাই চোখ বুজলে। কী নিস্তরঙ্গ জীবন। তার ভেতর সন্দীপনের বাড়ির কলোনিয়াল লোহার থামে অযত্নের মরচে। সন্দীপন সারত্রের কথা বলছে। আমি এজ্ অব রিজিনের মাত্র ৮০ পৃষ্ঠা পড়েছি। কোন্ খণ্ড মনে নেই এখন। সেই যে একটি মেয়ে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়েছিল। তা এসব তো আমাদের লেখাতেও এসে গেছে তখন। রেজারেকশনেও ব্যাপারটা টলস্টয়কে আনতে হয়েছিল। এই ব্যাপারে আমরা ছেলেরা যতটা ভয় পেয়ে যাই মেয়েরা দেখেছি তা পায় না—বরং মনে হয়েছে—ওরা ব্যাপারটাকে ওদের নিজের কারখানার কারবার বলেই মনে করে। আমি যখন আতঙ্কে জানতে চেয়েছি, সত্যি ?

কি সত্যি ?

যা বলছ—

হ্যাঁ, হয়নি—বলে একগাল হাসি। তার সঙ্গে গর্বের ছিটে। এই পৃথিবীতে নারী আমায় সবচেয়ে বেশি অবাক করে। জাপান থেকে ফ্যাক্টরি-শিপ নানা দরিয়ায় ভাসতে ভাসতে—মাছ ধরতে ধরতে বে-অব-বেঙ্গল অবধি আসে। ফেরার পথে সেই জাহাজেই মাছ ট্রিট করে টিনের কৌটোয় ভরে নানান দেশে বেচতে বেচতে ফেরা। ওরাও জীবনে ভাসতে ভাসতে সন্তান আনে। রাখে বা নষ্ট করে। নষ্ট করার পর সে কি চাপা কান্না বা চাপা স্বপ্ন কুমারী মায়ের মুখে বা তথা-

কথিত অবৈধ সন্তানের মায়ের মুখে থমথম করে—তা আমি দেখেছি। যে আসেনি—যে আসতে পারত—তার জন্যে কী মায়া সারামুখে—না-হওয়া মায়ের মুখে।

ব্যাপারটা লিখতে পারিনি। এর ঠিক উল্টোদিক থেকে একটি গল্প লিখেছিলেন নরেনদা। নরেন্দ্রনাথ মিত্র। অনেকদিন আগে। একটি তরুণী তার বহুপ্রসবিনী মায়ের জন্য দাই ডাকতে গিয়ে দাইয়ের মুখে শুনল, তার জন্মের সময় অনেক চেষ্টা হয়েছিল—সে যাতে না জন্মায়। গল্পটির নাম ছিল—রাণু যদি না হত।

ওম্যানস লিব কথাটার দিকে আমি অবাক হয়ে তাকাই। যেন কথা দুটো কোন প্রাগৈতিহাসিক বাইসনের দুটো শিং। আমাদের জীবন জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি মেয়েরাই চালায়। পোশাক কি পরব—কি খাব—সংসার কিভাবে চলবে—গান কার দিকে তাকিয়ে লিখব—কার একটি ভ্রূকুটির জন্যে ছবি আঁকব—কী বাজার করব—জানলার পর্দা কেমন হবে—কোন্ রঙের বালিশের ওয়াড়ে মাথা রেখে ঘুমোব—মাইনে পেয়ে কার হাতে তুলে দেব—নাটক, সিনেমা, উপন্যাস কার দিকে তাকিয়ে তৈরি হবে—টিভি, রেডিও, হোর্ডিং, ডেইলি-উইকলির তাবৎ বিজ্ঞাপনের আশি ভাগ কার দিকে তাকিয়ে ?

এর পরেও ?

সব ব্যাপারেই নীরব থেকে ওরা বোকা আমাদের মনে এই প্রশ্নটি জাগায়—না-জানি কত বোঝে। না-জানি কত অবিচার হয়ে গেল। তাই আমরা ছুটে ছুটে ডবল ডবল করে ফেলি।

আমায় তো মনে হয় সারা দুনিয়ার সব দেশই মাতৃতান্ত্রিক। বহু বহু বছর ধরে সমাজতন্ত্র বিদায় নিতে চললেও মাতৃতান্ত্রিক ভিতে একটি ফাটলও ধরানো যায়নি। মেয়েরা আমাদের আনে। তাকে নানা বয়সে নানাভাবে আমরা জড়িয়ে শুয়ে থাকি। ওরাই আমাদের ঠেলে তুলে হাঁটতে শেখায়। কাজে পাঠায়। মাতৃবাদ সব বাদের চেয়ে পুরনো আর বনেদী।

সুনীল একদিন জনসেবকে বলল, একদল নতুন লেখক ইংরেজিতে এসেছেন। বারোজের নামটা ওর মুখেই শুনি। কাছেই খালাসীটোলা। কয়েকদিন গেছি। ওখানে কমলকুমারকে পাই। কত বিষয়ে সুন্দর করে বলতেন। গ্লাস কত যত্ন করে ধরতেন। কলেজ স্ট্রীট মার্কেটেও কমলদার সঙ্গে অল্পস্বল্প আড্ডা দিয়েছি। অন্তর্জলি যাত্রার ফাইল কপি সুতো দিয়ে আলাদা সেলাই করে উপহার দিয়েছিলেন। হারিয়ে ফেলেছি।

কমলদা লিখে দিয়েছিলেন—বাবু শ্রীশ্যামল গঙ্গোপাধ্যায় বরাবরেষু। অন্তর্জলিতে তাঁর নিজস্ব ভাষায় সেই সময়কার ছবি একটা একটা করে তুলে ধরেছেন। সতীদাহ নিয়ে পরে বার্নিয়ের ট্যাভারনিয়ারেরও চাক্ষুষ বিবরণ

পড়েছি। সেটাই কমলদা আগাগোড়া ঘোলা করেছেন। লেখক করতেই পারেন। এছাড়া আর তো কোন সোর্স নেই। দারাশুকো লিখতে গিয়ে পড়তে হয়েছিল। কমলদা সেই সব বিবরণ খুব উজ্জ্বল করে এঁকেছেন—মুগ্ধ হয়েছি, আচ্ছন্ন হয়েছি।

এখন মনে হয়—কমলদার ওই ভাষার আদৌ কী দরকার ছিল? সুহাসিনীর পমেটম সুনীল কৃত্তিবাসে ছাপল। বোধহয় আট ফর্মা। দাড়ি কমা নেই কোথাও। কী কষ্ট করে যে পড়তে হয়েছিল! ব্যাপারটা কি? এই বাংলা কেন? হয়ত ওঁর মনে হয়েছিল—এইভাবেই তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন।

কমলকুমারের বলার কথা কি ছিল? অন্তর্জলি যাত্রায় যা তিনি বলেছিলেন তা কি আরও সহজ করে বলা যেত না? ওই ভাষাই কি তাঁর সৌন্দর্যবোধ সবচেয়ে ভাল করে প্রকাশ করতে পারে? নান্দনিক বিকাশের পক্ষে ওই ভাষা কি বাধা নয়?

আমার আর সন্দীপনের প্রথম বই একই দিনে বেরিয়েছিল। সেদিন আনন্দ-বাজারে আমার নাইট ডিউটি ছিল। বেশ—বেশ রাতে সন্দীপন সিদ্ধেশ্বরকে নিয়ে এসেছিল। সিদ্ধেশ্বর সেন কবি মানুষ। কথায় ব্যবহারে অসম্ভব স্নেহশীল। আমরা তিনজন সে-রাতে কোথায় কোথায় যে হেঁটেছিলাম! শেষে তো গন্ধর্বের নৃপেনের মেসে অন্ধকারে মোমবাতি হাতে ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে রাত তিনটেয় তেতলায় উঠেছিলাম। ঘুমন্ত নৃপেনকে বের করেছিলাম ভোররাতে। নৃপেন একটুও রাগেনি কিন্তু। কী আহ্লাদ!

বঙ্কিমচন্দ্রের একটা দার্শনিক বিশ্বাস ছিল। তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল মানব-কল্যাণবোধ। সাম্য। মিল, বেন্থাম ছাড়াও ভারতীয় কর্মযোগের কথা তিনি এখানে-সেখানে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের কথার পাশাপাশি বঙ্কিমের মতই সংস্কৃত কাব্যের সৌন্দর্যবোধে রসাসক্ত ছিলেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইছামতীতে উপনিষদের কথা প্রধান চরিত্রের মুখে বসালেও আগাগোড়া নিসর্গের ভেতর ঈশ্বরকে খুঁজেছেন। ঈশ্বরের পৃথিবীতেই তিনি বাস করতেন। তারাশঙ্কর প্রথাগতভাবে ভারতীয় মৃত্যুচেতনা নাড়াচাড়া করেছেন। বাকিরা?

বাকি সবাই কোন কিছুই যেমন আছে তেমন গ্রহণ করেননি। নেড়েচেড়ে দেখেছেন সবাই, কিছুই বিশ্বাস করেননি। খুঁজে বেড়াবার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন। এর ভেতর জীবনানন্দ অনিত্যবোধে কষ্ট পেয়েছেন। নিসর্গের চরিত্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলেছেন। বিশেষ একটি কালে নিরন্তর স্নান করেছেন। তার ভেতর কী যেন বুঝতে পেরে গেছেন—এই ভাবটি আভাসে, সঙ্কেতে সারা রচনায় চারিয়ে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে ছিল সভ্যতার ইতিহাস-বোধ।

আমাদের কোন দার্শনিক বিশ্বাস নেই। প্রতীতি নেই। আমার তো পড়া-শুনোই নেই। যা দেখি তা মনের ভেতর রোদ জল খেয়ে—ছিল আম, হয়ে যায় আমচুর। এমনিতে কোন শিক্ষা নেই আমার। মূর্খ বড়···

আমরা বলতে চেয়েছি ঃ দ্যাখো পৃথিবীটা এমন। মানুষকে নানাভাবে খোসা খুলে দেখার একটা চেষ্টা সবার লেখাতেই। এর ভেতর শীর্ষেন্দু একটি ন্যালাক্ষ্যাপা চরিত্রকে সব লেখায় বার বার আনে। সে এই কাজের পৃথিবীতে কিছু অপটু। বিপন্ন। কিন্তু গোপন কোন ঢেউয়ে সে বুকের ভেতর টের পায় এই পৃথিবী ঈশ্বরশাসিত। শীর্ষেন্দু একজন মরণশীল মানুষকে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র বলে বিশ্বাস করে। ভালবাসে। তাঁর পায়ে সব বিশ্বাস সমর্পণ করে। তাঁর বিধান অনুযায়ী প্রতিলোম অনুলোম বিবাহ ইত্যাদি সঠিক মনে করে (পারাপার)। সেখানে তার মনে শান্তি আসে। অস্থিরতা কাটে। প্রসন্নতা ফিরে পায়।

ভগবান কি তা জানি না। তবে খুব বিরাট কিছু। কবি সাধকরা যদিও বলে গেছেন—মানুষই ভগবান। মানুষের ভেতরেই ভগবান। এই বাণী সত্য হলেও মন বিশ্বাস করতে চায় না। আমি শীর্ষেন্দুর মত বিশ্বাস করতে—ভালবাসতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতে পারতাম।

আমার মনে হয় শিল্পের বিষয় হল ঃ সংশয়। আর ভক্তের বিষয় হল ঃ সমর্পণ—নিবেদন। এই দুটি দু'রকমের জিনিসের ভেতর সংশয় নিয়েই সারা পৃথিবীর শিল্পের ইতিহাস। আমাদের আগে—আমাদের সময়ে এবং আমাদের পরেকার যাঁরাই লিখতে এসেছেন তাঁদের ভেতর শতকরা ৯৯ জন এই সংশয়ে দুলতে দুলতেই লিখে চলেছেন। শিল্প কোন মীমাংসা নয়। শিল্প একটি দোলাচল তর্কের ভেতর ছিন্ন দীর্ণ হতে হতে যা পাওয়া যায় তাই।

আমাদের কি কোন রাজনৈতিক বিশ্বাস আছে ?

নেই। হয়ত যৌবনে আবছামত কিছু একটা ছিল। কিন্তু বয়স বাড়তে বাড়তে—দেখতে দেখতে তা তলিয়ে গেছে। মানবচরিত্রের বর্ণচ্ছটার নিচে। গান্ধীজীর মনের চেহারাটাও যেমন—তেমনি হিটলারের মনের চেহারাটাও লেখার বিষয়। কোন মতবাদ সে-পথে বাধা বা প্রধান নয়।

তাহলে কি তুলসীদাস কবির যা লিখেছেন তা শিল্প নয় ? হ্যাঁ, শিল্প। সাধক কবীরের দাস্যভাবেও কী একটা ফুটে ওঠে। সত্যদর্শনেও ফোটে। কিন্তু সেই পৃথিবী অনেক বদলে গেছে কয়েক শতাব্দীতে। আজ আমরা তুলসীদাসের ভক্তিরসে ডুব দিয়ে প্রসন্ন হতে পারি। কিন্তু আধুনিক পৃথিবীর স্বভাব, ধারণায় তার কোন মিল পাই না। কেননা সেখানে কোন সংশয় নেই। খনন নেই। আবিষ্কার নেই। এত যে কথা বলছি—কিন্তু শীর্ষেন্দুর লেখা যে ভাল লাগে খুব।

আমাদের অনেকেরই কাগজের বউ। আমি তো বিয়েয় সাক্ষী না পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে ঢুকে আন্দাজে সাক্ষী যোগাড় করেছিলাম। এক যুবক এম এ পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। সমস্যাটা তাঁকে বললাম। তিনি সাক্ষী দিতে রাজি হয়ে গেলেন। এখন তিনি একজন উপাচার্য। শিল্প-সাহিত্যের

সমালোচকও বটে।

বিমল, মতি, অতীন, সন্দীপনেরও কাগজের বউ। বিমলের বউ আছে— বিমল নেই। দীপেন নেই। চিনু আছে। দেখা হয় না কতকাল। মতি আমার আর অতীনের বিয়ের বন্দোবস্ত করেছিল। বরেনের তো বউ নেই। বিয়েই করেনি। কয়েকবছর মর্নিংওয়াক করছে। ধরেবেঁধে ওকে দিয়ে ধারাবাহিক উপন্যাস লিখিয়েছিলাম। কারখানার চাকরির পর কিছুকাল স্কুলে ছিলাম। একদিন বরেনের সঙ্গে বাসে দেখা। বেহালার কোন্ স্কুলে জয়েন করতে যাচ্ছে। বাস থেকে নামিয়ে বরেনকে আমাদের স্কুলে জয়েন করালাম জোর করে। সেখানে শীর্ষেন্দুও কিছুদিন কাজ করেছিল।

আমাদের প্রথাগত ধর্মবিশ্বাস নেই। বাঙালী বা ভারতীয় বলে আলাদা কোন দেমাক নেই। কিন্তু ভূগোলের এই জায়গাটায় আছি বলে জায়গার জন্যে ভালবাসা আছে। রাজনৈতিক বিশ্বাস নেই। কেউ যখন বলেন—আমরা অমুক পার্টি করি—আমাদের একটা ডিসিপ্লিন আছে—আমরা অমন নয়—তখন ভাবি এর চেয়ে বড় ঔদ্ধত্য আর কি হতে পারে? কিংবা যখন পোস্টার দিয়ে বলা হয় অমুকবাদ সর্বশক্তিমান—কারণ ইহা সত্য—তখন গ্যালেলিওর আমলের চার্চকে মনে পড়ে। মনে পড়ে বিরাট চৌবাচ্চায় গরম খিচুড়ি ঢালা হয়েছে গুরুদেবের জন্মদিনে। এবার তিনি বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল একবার ডুবিয়ে দিলেই আমরা ভক্তরা সবাই প্রসাদী পেতে পারি। শ্রীশ্রী ১০৮ বাবাদের জন্মোৎসবেও একই ভাষায় বাণী লেখা থাকে।

মুক্ত চিন্তার পক্ষে এসব এক মস্ত বাধা। গণতন্ত্রে নেতা যায়—নেতা আসে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মতবাদ বদলে যায়। পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসই হল— একটি দর্শনের নতুন দর্শনকে জায়গা করে দেওয়ার ইতিহাস। কিছুই শাশ্বত নয়। কোন এক বিশেষ শ্রেণীর গদিতে একনায়কত্বের অগ্রাধিকার অগণতান্ত্রিক। এই অগ্রাধিকারের ব্যাপারটা যদি থাকবে তবে মেধাবীর একনায়কত্বে অগ্রাধিকার নয় কেন? নয় কেন প্রেমিকের? সব হারিয়ে একজন কী বা নেতৃত্ব দেবেন? বরং সব ত্যাগ করে যিনি এসেছেন—তিনিই তো সেরা নেতৃত্ব দিতে পারেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস তো তাই। স্বাধীনতার আন্দোলনের নেতৃত্বের ইতিহাস তো তাই। শিবের লক্ষ্মীছাড়া ভাব মানায়। যার কিছু নেই সে লক্ষ্মীছাড়া হলে কদর্য লাগে।

এসব প্রশ্ন মনে জাগে বলেই কারও পতাকাবাহী হওয়া যায়নি আমাদের বেশির ভাগের। ডিসিপ্লিনের নামে অসংযত নেতারা বার বার আমাদের সংযম শেখাতে চেয়েছেন। আমরা বিরক্ত হয়েছি। বিশ্বাস করিনি। সেই ধৃতরাষ্ট্রের আমল থেকে আজ অব্দি আমাদের রাজারা, শাসকরা, আমাদের নেতারা বাবা হিসেবে তাদের দুর্যোধনদের সামলাতে পারেননি। যারা দু'ভাই এক বাড়িতে বাস করতে

পারেন না—তারা আমাদের সাম্য শেখাবার ভার নিয়েছেন !

ফলে ব্যাপারটাই ছেঁদো হয়ে গেছে। তাই বলে একজন লেখক দেশের মানুষের পাশে না থেকে পারেন না। চাষীর আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে লিখতে পারলে সবচেয়ে ভাল হোত। কিন্তু ভোটের দিকে তাকিয়ে আন্দোলনটাকেই তো বাবুরা ভেজাল করে দিয়েছেন। লেখক তাই তার সাধ্যমত অন্য পথ নিয়েছেন। তার জীবনের ছবি আঁকছেন লেখায়। ভূমিসংস্কার হয়নি। মাঠকে মাঠ বিলি হয়েছে। ছোট জাতের মালিকই আমাদের এই বাংলায় সবচেয়ে বেশি। তাঁরা উৎখাত হয়ে শহরে এসে ভিড় করেছেন। এঁরা আর প্রবাসী বাঙালীরাই শহরের চার-পাঁচশো টাকা স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাটের খদ্দের। বিতাড়িত, উৎখাতের দল সব বেচে শহরে থানার কাছে ফ্ল্যাট নিয়েছেন। বিলি করা জায়গায় জল নেই, সার নেই, পুঁজি নেই। জোত বিভাজনই হয়েছে শুধু। আর ঝগড়া বণ্টন করা হয়েছে রায়তি অধিকার দেওয়ার নামে। এই কৃতিত্ব দেখতে দূর থেকে বিশেষজ্ঞরা আসছেন। অনেকে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন। সমাজতান্ত্রিক দেশ দেখতেও লোকে যেতেন এবং ফিরে এসে প্রশংসাও করতেন—এটা যেন ভুলে না যাই।

এসব কথা কেউ লেখেননি। সে লেখা লেখার যোগ্যতা আমার নেই। তা লিখলে কেউ ছাপানোর নেই। কত জায়গায় যে লেখক হিসেবে আমরা অক্ষম।

তাই রাজনৈতিক কোন বিশ্বাস না রাখতে পেরে আমরা এক একজন এক এক রকম রাস্তা বেছে নিয়েছি।

আমাদের লেখার বিষয় কি ?

১। যোজনার নামে নিম্নবর্গের মানুষকে বঞ্চনা। ঠিকাদারী। ধর্ষণ। হৃদয়হীন বিচারব্যবস্থা। পুলিশ মানে আইনসিদ্ধ ডাকাত।

২। নারী। প্রেম। প্রেমহীনতা। এবং অবাধ মুক্ত প্রেম।

৩। ছোটখাটো আশা-আকাঙ্ক্ষায় তিরতির করে কাঁপতে থাকা।

৪। ঈশ্বর এবং ঈশ্বরহীনতা।

৫। কলকাতা কত কঠিন।

৬। খুন এবং ঘৃণা।

৭। কল্পবিজ্ঞান।

৮। ইতিহাসকে পুনর্নির্মাণ।

৯। দেশভাগ ও নস্টালজিয়া।

১০। বিহারে অনুন্নত মানুষজনের ওপর নির্যাতন, অত্যাচার।

১১। বন্ডেড্ লেবার ও ধর্ষণ।

১২। ভ্রষ্টাচার।

ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিভাবে বলা হচ্ছে ?

খুব নিপুণভাবে। সেই কমপিটেন্স সবারই আছে। কিন্তু নিপুণতার পরেও একটা কথা আছে। তা হ'ল কল্পনা। দৈবী পাগলামো। ম্যাজিক রিয়ালিটি। যা না থাকলে পৌনঃপুনিকতায় সবই জীর্ণ হয়ে বাতিল হয়ে যেতে বাধ্য।

শুধুই নিপুণতার দরুণ ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী এখন পড়তে কষ্ট হয়! ঠাসা গল্প। সেই সঙ্গে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি। আরও কিছু কিছু জিনিস আছে। কিন্তু তারপর? তারপর কি?

ভাষা তো বিষয়ের অনুগামী। বিষয়ের জোর থাকলে ভাষা তার দাসানুদাস। আমি লেখার সময় কোনদিন ভাষার কথা ভাবিনি। ভাষা বোধহয় বেশি ভেবেছে দেবেশ। কিন্তু ওই ভাষায় আমি আরাম পাই না।

যেমন এসেছে—লিখেছি। এক-একদিন ভাবি আমরা এতজন মিলে এত যে গদ্য লিখলাম —তা কোন্ আদাড়ে যাবে? বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, প্রবোধ কম উপন্যাস লেখেননি। সেগুলো কোথায়? দেখা যায় না কেন আর? বিশ্বভারতী আর যদি গোরা বা নৌকাডুবি না ছাপায় তাতে কি খুব কোন ক্ষতি হবে শিল্পের? সন্তোষকুমার, নরেন্দ্রনাথ, বিমল কর, সমরেশ বসু,—এঁদের বহু উপন্যাসকে আর দেখতে পাই না। কোথায় গেল তারা? যা আছে তা কি আর বেশিদিন দেখা যাবে?

এইভাবেই কি অদরকারি বলে তারা হারিয়ে যায়? আর ছাপা হয় না? সব লেখকেরই থেকে যায় খুব অল্প কিছু লেখা। বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র, অচিন্ত্য, প্রবোধকুমার, বনফুল—অনেকেরই ছিটেফোঁটা পড়ে আছে। তাদের পরেকার—সেই চল্লিশের লেখকদের কীই বা থাকবে! আর আমাদের? আমার তো কিছুই থাকবে না। বন্ধুদের কিছু কিছু থাকতে পারে। অতি অতি সামান্য। কেন থাকে না? কেন থাকে? বহুল প্রচারিত ধারাপাত কিংবা বর্ণপরিচয় হয়ে থাকা নয়। ওজনে ভালবাসায় সম্মানে থাকা কী যে কঠিন!

মানিকবাবুকে যতটা বড় করে ভাবা গিয়েছিল—তিনি কি আজ ততটাই আছেন? এমন আলোচনায় একটা অসুবিধা আছে। কেউ কেউ রক্ষাকারী হিসেবে এগিয়ে আসেন। কিন্তু সময় বড় বলবান। সময় সবাইকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে চায়। জোর না থাকলে সবরকম প্রচারের গুষ্টি তুষ্টি করে—পুরস্কার, পার্টির মদত—সবকিছুর ওপর দিয়ে সময় তার রোডরোলার চালিয়ে গুঁড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে। শিল্পী বলবান হলে তাঁর কোন রক্ষাকারীর দরকার হয় না। পদ্মানদীর হোসেন মিঞা কিংবা পুতুল নাচের যাদবকে তো আমার সাজানো লাগে। রোমান্টিক। বরং জননী ধোপে টেকে। কিন্তু দিবারাত্রির কাব্য ফাঁপা লাগে। চতুষ্কোণ অপাঠ্য।

থাকা না-থাকার অঙ্কটার হিসেব ক'জন মেলাতে পারেন! যিনি মেলান তিনিও যেমন জানেন না কি করে মেলে—যিনি মেলাতে পারেন না—তিনিও

তেমন জানেন না কি করে মেলে।

আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের চারদিকে এখন দুয়ার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে গঙ্গাতীরের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক পার্টির ফতোয়া, খবরের কাগজের গার্জেনি, বীরভূমের মহকুমার গাছগাছালি ঘেরা তপোবন থেকে উঠে আসা বাণী আর সাইজের চেয়ে বড় করে দেখানো তথাকথিত বিশ্ববরেণ্য সব বটঠাকুর!

ভারতীয় ভাষাগুলোর জননী সংস্কৃত। সেই সঙ্গে রামায়ণ মহাভারতের মত মহাকাব্য। হিমালয়ের মত পাহাড়। আর ধান-গম চাষের অভিজ্ঞতা দিয়েই ভারতবর্ষ। এইসব দিয়ে আলগা বাঁধনে আমরা একটি নেশন। তা সবসময়ই হাওড়া স্টেশন, যুগান্তর পত্রিকা, কংগ্রেস ও হিন্দু ধর্মের মত অগোছালো দেখতে। দরকারমত এসব কষে বেঁধে আমরা একটি জাতি—একটি ভাবনা—একটি চিন্তা। তার ভেতর ইসলাম, আরবি, ফারসি শব্দসম্ভার, খ্রীষ্টীয় করুণা, ধর্মীয় খোলামেলা উদারতা দিয়ে আমরা পরিপুষ্ট। এর ভেতর ওই পাঁচটি দুয়ারের পাহারায় আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ, বটঠাকুর, মার্কস, সংবাদপত্রের নির্ভীক নিরপেক্ষতায় আমাদের কোন অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। হয়ও না। ওঁদের ঘিরে যাঁরা মাছের কাঁটার সফলতা পেয়ে সেই সফলতা পাহারা দিচ্ছেন—তাঁরাই মুশকিলের। চিন্তা ভাবনার পক্ষে। মুক্ত ভাবনার পক্ষে। কেননা ওঁরা সব সময়ই সন্ত্রস্ত। পাছে অন্য কেউ সেই কাঁটা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়।

প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই নিজস্ব 'ক্লোনি' থাকেন। নিজস্ব 'কোর্টজেস্টার' থাকেন। নিজস্ব গায়ক, নিজস্ব চিত্রকর, নিজস্ব সরোদিয়া, সেতারী, ঔপন্যাসিক, কবি, অর্থনীতিবিদ্, ফুটবলার এবং সমালোচকও। এঁদের সম্পর্কে প্রশংসাবাণীর ভাষাও এক।

একদিন পরীক্ষা করে দেখছিলাম—প্রশংসাবাণীগুলো কোন ধরনের। সরোদিয়াকে যে ভাষায়—যেভাবে তোলা হচ্ছে—সেই একই ভাষা, ভঙ্গিতেই ঔপন্যাসিককেও বলা হচ্ছে। বিশেষ ফারাক নেই।

শুধুই কি নিজস্ব সমালোচক! নিজস্ব পুরস্কারও আছে। সরকারী পুরস্কারকেও এই কাজে নামিয়ে দেওয়া হয়।

এরকম অবস্থার ভেতর দিয়েই এগোতে হয়। একটি সাপ্তাহিকে একজন সমালোচক গত দশ বছরের গল্প-উপন্যাস আলোচনা করলেন। তাতে আমার নাম নেই। একজন খুব নবীন নয় গল্পকার প্রতিবাদ করে পত্রাঘাত করলেন। জবাবে সমালোচক লিখলেন, আমি নাকি গত দশ বছরে লেখালিখি করিনি। সমালোচকের বয়স সত্তর হবে। এম এ পাস। দীর্ঘকাল অধ্যাপক। বাংলা সাহিত্য নিয়ে ঢাই ঢাই বই আছে। সেসব বইতে আমার কথাও আছে। যে পত্রিকায় এসব কথা লিখেছেন—সেই পত্রিকার পাতাতেই গত দশ বছরে আমার

অন্তত বিশখানি গদ্যগ্রন্থের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। কিছু বলার নেই।

আমি না-হয় ষাটের দিকে চলেছি। আশা-আকাঙ্ক্ষা নিভে এসেছে। পঞ্চাশ ষাটখানা অপাঠ্য বই লিখে ফেলেছি—যেগুলো দুর্গাপুর, শিলিগুড়ি, কোচবিহারের লাইব্রেরিতে চলে গেছে। কিন্তু যিনি নতুন লিখতে এসেছেন—ছবি আঁকতে এসেছেন—সরোদ বাজাতে বসেছেন—তাঁর কি হবে? এই ব্যূহ তিনি ভেদ করবেন কি করে?

তাঁর ভরসা জোটের বাইরের বিশাল মানবসমষ্টি। পাঠক, দর্শক, শ্রোতা তো জোটে নয়। তার কাছে যাও। একলা চল।

গত বিশ বছরে আরও এক ধরনের বিগ্রহ মাথা তুলে দেখা দিয়েছে। বিশ বছর আগের সেইসব এখন স্মৃতি। ব্যক্তিসন্ত্রাস, ব্যক্তিহত্যা জনসাধারণ বাতিল করেছে। প্রধান দুই সমাজতান্ত্রিক দেশ বিশ্ব ব্যাঙ্কের টাকা নেয়—রাজনীতির ওপর ব্যবসাকে জায়গা দেয়। দক্ষিণ চীনে মার্কিন আর পশ্চিমীরা দশ বছরের ওপর চুটিয়ে ব্যবসা করছে সবচেয়ে সুবিধাজনক শর্তে। গ্যারাণ্টর পেইচিংয়ের কেন্দ্রীয় সরকার। ভিয়েতনামে সরকারী সংস্থাগুলোকে চাঙ্গা করতে ফরাসী ব্যাঙ্ক আসরে নেমেছে। ক'মাস আগে বুশ রাশিয়া সফর শেষে বিদায়বাণীতে রুশ অঙ্গরাজ্যগুলোকে একসঙ্গে থাকতে বলেন। অনুরোধ করেন—তোমরা একসঙ্গে থাক—সোবিয়েতকে অখণ্ড রাখ।

এ যে পরশুরামের উলোট পুরান! ওপাশে যিব তো ডাণ্ডা খিবো!

আর এর ভেতর কলকাতার রিপ ভ্যান উইংকিলরা ঘুম ভেঙে জেগে উঠে বসেছেন। তাঁরা তাঁদের সেইসব মতবাদের স্মৃতির রোমাণ্টিক অগুরু মাখিয়ে ঝকঝকে ছাপার ঢাউস শারদীয় সাহিত্য করছেন। পেল্লায় পরিমাণে বিজ্ঞাপন। সাংগঠনিক শক্তি আছে। কিন্তু গত তিরিশ বছরের একজন মৌলিক লেখকেরও লেখা সেখানে নেই। বিপ্লবও নেই। সাহিত্যও নেই। আছে মোটা রেটের বিজ্ঞাপন। আর আছে গজ-গজ প্রবন্ধ। তাতে অনেক জানা যায়। কিন্তু কার কাজে লাগবে?

এসব কি বুদ্ধির ফসল? না যে জন্যে দক্ষিণীবার্তা—সেই একই কারণে কি?

এর সঙ্গে আমাদের কারও কোনও সম্পর্ক হয়নি। গত বিশ বছরে যাঁরা লিখে চলেছেন—তাঁদেরও ওখানে দেখলাম না।

আরও একটি জিনিস আমাকে আশ্চর্য করেছে। পাশাপাশি আমরা একঝাঁক মানুষ একসঙ্গে লিখতে এসেছিলাম। অনেকে আজ সেই ঝাঁকে নেই। ঝাঁক কিছু ফিকে হয়ে এসেছে। সেই সময়কার কেউ অন্য ধরনের সাহিত্যকর্মে লিপ্ত হয়েছেন। মন দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার গল্প উপন্যাস ইংরেজি থেকে বাংলায়

উপহার দিয়ে তাঁরা আমাদের উপকার করেছেন। কৃতজ্ঞ করেছেন। অন্য ভারতীয় ভাষার গল্প উপন্যাস তাঁরা বাংলায় অনুবাদ করেছেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়। তাঁদের মাতৃভাষার লেখক আমরা। আমাদের লেখা তাঁরা একটিও পড়েননি। সম্পূর্ণ নীরব আমাদের সম্পর্কে। এত সাহিত্যপ্রীতি যাঁদের তাঁরা আমাদের বাংলা লেখা না পড়ে থাকেন কি করে?

এখন শীতের সন্ধ্যায় একটি দৃশ্য আমার বড় ভাল লাগে। ইলেকট্রিকের আলোয় কাঠগোলায় কাঠের মিস্ত্রী কাঠের গায়ে র‍্যাঁদা চালাচ্ছে। কাঠের চোকলা স্তূপ হয়ে উঠছে। কাঠ একটা চেহারা পাচ্ছে। ইলেকট্রিক আলো কাঠগোলার গায়ে কচুবনে গিয়ে পড়েছে। শীতের আমেজের সঙ্গে নতুন আলুর ননীর শরীরের ছবি মনে ভাসে। ঘি-রং। তার পাশে কালচে সবুজ পেঁয়াজকলি মনের ভেতর দোলে। এ এক স্বাস্থ্যকর ছবি। সাহিত্যেও কি এই ছবি আসতে পারত না?

বিমল কর তিনজনকে প্রায়ই ছাপতেন। দেবেশ, শীর্ষেন্দু, বরেন। আমাদেরও ছাপতেন। কেউ কেউ বেশি বেশি। কেউ কেউ কম কম। যে-যার বুদ্ধি আর মেধা অনুযায়ী কাজ করেন। সময় বড় বলবান। ফের সেই কথা। সময়ের দূরত্ব—আজ পঁচিশ তিরিশ বছরের ব্যবধানে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে উঠছে।

সেই সময় বিমলদা খুব যত্ন করে একটি কাগজ বের করে তাঁর সময়ের চেয়ে অনেক এগিয়ে ছিলেন। ছোটগল্প ঃ নতুন রীতি। অনেকেই আমরা তাতে লিখেছি। অনেক ভাল লেখা সেখানে বেরোয়। বিমলদা গল্পগুলো নিয়ে একটি সংকলন করেন। উদ্যোগী হয়ে নিজে আলোচনা করে একটি ভূমিকা লেখেন। অনেক ব্যাপারেই তিনি অগ্রণীর কাজ করেছিলেন।

আজ থেকে বিশ বছর আগে সুনীল, শীর্ষেন্দু, মতি, আমার চারখানি গল্পগ্রন্থ বেরোয়। সেই চারটির ভূমিকা লিখেছিলেন সন্তোষকুমার ঘোষ। সন্তোষদা যে কাজ না করলেও পারতেন সে কাজ কিন্তু তিনি করেছেন। বাড়ি বয়ে গিয়ে ভাল লাগার কথা বলেছেন। চেষ্টা করেছেন—আমরা যাতে জীবনে জীবিকায় পা রাখার জায়গা পাই। মতির লেখা ওঁর একবার এত ভাল লাগল—মতিকে নিয়ে দীঘায় বেড়াতে চলে গেলেন। আমার একখানি উপন্যাস পড়ে ভাল লাগায় দোলের সকালে হাত-রিকশয় বসে ভবানীপুর থেকে সারাগায়ে রং মেখে টালিগঞ্জে আমার বাড়ি এসে হাজির। কী—না শ্যামল কী ভাল লিখেছো!

শুধু আমার বেলায় নয়। এমন যে কতজনকে, কত নবীনকে, কত অখ্যাতকে তিনি এগিয়ে গিয়ে ভাল বলেছেন—গুণগ্রাহীতার পরিচয় দিয়েছেন—স্নেহসিক্ত করেছেন—উৎসাহিত করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। অখ্যাত কাগজ থেকে অখ্যাত লেখককে খুঁজে বের করে তার আশার অতিরিক্ত প্রশংসা করেছেন।

আমেরিকা থেকে লেখা সুনীলের একখানি চিঠি তিনি বার বার পড়েছেন আমাদের সামনে—আর প্রতিবারই প্রশংসা করেছেন। সম্ভবত ১৯৬৪ সনে। পরে লেখক ও ব্যক্তি সুনীলের তিনি বহুবার প্রশংসা করেছেন। অন্যকে তিনি ভালবাসতে পারতেন। সেজন্যে দুঃখও পেতেন। আবার বাসতেন—আবার দুঃখ পেতেন।

এমন মানুষ কয়েক দশকে একবারই আসেন। নিজেও ছোটগল্পে - বাংলা সাংবাদিকতায় অগ্রণী কাজ করে গেছেন।

আবার একথাও সত্যি—অকারণে—অনেক সময় পুরো না জেনে জানা-অজানা—দু'রকমের মানুষকে মর্মান্তিক অপমান করেছেন। শৈশব-যৌবনে নিরাপত্তাহীনতা তাঁকে জীবিকায় সাফল্যের ভেতর অস্থির, উদ্ধত করে তুলেছিল। মনে হয় নিজের সাফল্যকে তিনি স্বল্পায়ু ভেবে নিয়ে অমন করতেন। ভেতরে ভেতরে নিরাপত্তার অভাব বোধ করতেন সবসময়।

এসব কথা মনে এল এই জন্য—সুনীলের কথা মনে করে। মতির কথা মনে করে। দীপেনের কথা মনে করে। প্রফুল্লর কথা মনে করে। অমিতাভ চৌধুরীর কথা মনে করে।

কৃত্তিবাসের একটি বড় সংখ্যা বেরোবে। সুনীল তখন মৌলালির মোড়ে চাকরি করে। আমি একটি বড় গল্প লিখেছি। সেই সংখ্যায় গিনস্‌বার্গ কবিতা লিখেছিলেন। বৃষ্টির বিকেল। সুনীল প্রুফের বাণ্ডিল নিয়ে প্রেসে যাচ্ছে। গম্ভীর থমথমে মুখ। লালবাজারের দিকে রাস্তা ভিজে কাই। সুনীলের পা কাদায় মাখামাখি। আমায় বলল, দেশে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিবি ?

নিজেকে খুব ছোট লেগেছিল সেদিন বিকেলে। ব্যাপারটা ভুলতে পারি না।

মতি এমনিতে খুব প্রেমিক লোক। ওঁর বউদি খুব ভাল মাংস রাঁধতেন। আমায় জোর করে নিয়ে গেছে। নীতিকে ও বিয়ে করেছে তখন। আমার কোন চাকরি নেই। ওরও নেই। সেক্সপীয়র অনুবাদ করতেন পল্টুদা। মতির পরিচিত। ওঁর কথায় মতি আমায় নিয়ে গেল বিদ্যোদয়ের ডিকসনারি লেখার কাজে। একটা ঘরে—কার বাড়ি আজ আর তা মনে নেই—মতি আর আমি দুই টেবিলে সারাদিন। ও বোধহয় N দিয়ে শুরু শব্দগুলো লিখছিল। আমি P দিয়ে লেখা শব্দগুলো।

আবার একদিন খাওয়াদাওয়ার পর রাত প্রায় তিনটে—ওর কেন জানি মনে হল আমার মাথায় জল ঢালা দরকার—রাস্তার পানের দোকানীর ঘুম ভাঙিয়ে দোকান খোলাল। কয়েকটা সোডার বোতল খুলে আমার মাথায় জল করে ঢেলেছিল—আমাকে ফুটপাতে বসিয়ে। তারপর নিজের ঘরে শুইয়ে রেখেছিল।

মতি, সুনীল—দুজনই খুব সুন্দর হাসতে পারে। বিমল, শঙ্করও পারত।

শক্তিও পারে। আমার হাসিটা সুন্দর নয়। হাসলে মন্দ খুনীর মত দেখায়। আয়নায় দেখেছি। সন্দীপনও খুব খারাপ হাসে না। হাসিতে এক-একজনের ভাগ্যই খারাপ।

সন্তোষদা তখন নতুন নতুন দিল্লি থেকে এসেছেন। দীপেনের খুব উৎসাহ—সন্তোষদার লেখা পরিচয়ে ছাপে। কিন্তু পারল না। ভেতর থেকে বাধা পেল। দীপেন খুব কষ্ট পেয়েছিল দেখেছিলাম।

অমিতদা—অমিতাভ চৌধুরী—সেই লোক যিনি আকাশের নিচে সব বিষয়ে আগ্রহী। নানান দেখা তাঁর। নানান জানা তাঁর। কোন লেখা ভাল লাগলে চেঁচিয়ে বলেন। পড়েন। হই-হই করে বলে বেড়ান। নিজেও লিখতে পারতেন। লিখলেন না।

প্রফুল্ল সফল গ্রন্থকার; নিজের কাজ ফেলে অন্যের বই প্রকাশ, অন্যের বিপদে পাশে দাঁড়ানো—মনে জোর দেওয়া ওর স্বভাব। কারও বিরুদ্ধে কোন নালিশ নেই। অন্যের সুখে সুখী। অন্যের দুঃখে দুঃখী। নিজের প্রয়োজন প্রায় সাধুদের মতই কমিয়ে এনেছে। হাঁটতে ভালবাসে। খায় কম। লেখে মেঝেতে বসে।

আনন্দবাজারে ডিসেম্বর মাসে রাতের ডিউটিতে লোক কম থাকত। আমার আর নরেন্দ্রনাথ মিত্রের পাশাপাশি টেবিল। গভীর রাতে নিউজপ্রিন্টে কবিতা লিখে আমার টেবিলে চাপা দিয়ে রাখলেন।

কি ব্যাপার নরেনদা?

আজ না তোমার জন্মদিন!

ওঃ, মনে রেখেছেন?

মুখে বিষাদ কেন? উৎসাহ রাখ। লেখ।

মার্কোজ এসে পড়ায় বাজারে খুব ম্যাজিক রিয়ালিটির কথা শোনা যায়। ব্যাপারটার নাম জানতাম। সেদিন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিশিরকুমার দাস বলল, ওটা নাকি আমার অনেকদিনই আছে। দেখলাম, হ্যাঁ। সেই বৃহন্নলা উপন্যাসের সময় থেকে—তিরিশ বছর আগে—যে উপন্যাসের নাম এখন অর্জুনের অজ্ঞাতবাস। অনিলের পুতুলে স্বপ্নের ভেতর ময়ূর এসে মৃত দাদার চোখ খুঁটে খাচ্ছে লিখেছিলাম। সেসব নাকি ম্যাজিক রিয়ালিটি। আসলে লেখার বীজে যখন ভাষা দিয়ে কিছুতেই পৌঁছতে পারি না, তখন অস্থির দশায় ওইসব পাগলামির জায়গায় পৌঁছে যাই। সন্দীপনও শিশিরের মতই একই কথা বলেছে।

আমাদের সময়ের সারা শরীর জুড়ে এমন ভাবেই সুনীল, মতি, সন্দীপন, শক্তি আছে যে ওদের কথা না বলে কোন উপায় নেই।

আমার বাবা শেষবয়সে আমার কাছে ছিলেন। বলা ভাল—আমি বাবার

কাছে ছিলাম। বাবার তখন আশি পার হয়ে গেছে। ভাল বাজার করতেন। বাজার করতে ভালবাসতেন। শক্তি খাবে বলে বাবা দুপুরে বাজার করেছেন। শক্তি অনেক বেলায় খেয়ে বিকেলের দিকে চলে গেল। তারপর রাত আটটা থেকে শক্তি রিকশায় করে ফিরে ফিরে আসতে লাগল। ঘণ্টা দেড়েক অন্তর অন্তর। আমি তখন রাসবিহারীর কাছে প্রতাপাদিত্য রোডে থাকি। বাবার ঘর ছিল রাস্তার ওপর। একই হাত-রিকশায় শক্তি ফিরে ফিরে আসতে লাগল।

রিকশাওয়ালার ভোগান্তি। সে বার বার বলে, মুঝে ছোড় দিজিয়ে।

শক্তি ছাড়ার লোক নয়। সিধে এসে বাবার ঘরের জানলায় ধাক্কা দেয়। বাবা কয়েকবারের ধাক্কায় রীতিমত ক্ষিপ্ত।

রাত তিনটে নাগাদ দেখি—রিকশাওয়ালা নিশুতি রাতের রাস্তায় বসে হিন্দিতে কাঁদছে। ঘরের ভেতর থেকে বাবা শক্তিকে ভেঙাচ্ছে। শক্তি বাইরে থেকে বাবাকে ভেঙাচ্ছে।

সেই রাতে ফের শক্তিকে রিকশায় তুলে রিকশাওয়ালাকে অনেক বলেকয়ে লেকের দিকে রওনা করিয়ে দিলাম।

প্রেমেনদা ৫৩।৫৪ সালে রীতিমত ফিটফাট সুপুরুষ ছিলেন। টালিগঞ্জের ট্রাম থেকে ফাঁড়ির মোড়ে নেমে বেহালার দিকে যেতে এক দিশীর দোকানে মাঝে মধ্যে যেতেন।

দোকানের মালিকের ছেলেটি আমাদের চেয়ে কিছু বড় ছিল। গোলগাল। বড়সড়। বেশি বয়স অব্দি হাফপ্যাণ্ট পরত। সে আমাকে নিয়ে রেলব্রিজ পেরিয়ে প্রায়ই চিলড্রেন্স্ লেকে যেত। সেখানে বাচ্চাদের চেয়ারে বসে কাঁদতো। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। কাকে যেন ভালবাসে। সে কোন পাত্তাই দিচ্ছে না। আমি তার হয়ে মেয়েটিকে চিঠি লিখে দিতে শুরু করি। সে চিঠি পাঠিয়ে ও ভাল রেজাল্ট পেল। বলল, কি খাবি বল্ শ্যামল ? যা চাস খাওয়াব।

তোদের দোকানে যাব।

সে তো বাবার দোকান। আর ও জিনিস খেতেও বিচ্ছিরি।

খাওয়াস যদি ও জিনিসই খাব।

তাহলে আসিস। কতই বা দাম ! বন্ধুবান্ধব নিয়ে আসিস।

একদিন সত্যি সত্যি বন্ধুবান্ধব নিয়ে গেলাম। মানস—কবি মানস রায়চৌধুরী আর সুনীলকে নিয়ে। সন্ধ্যেবেলা। আর সেদিনই দোকানের মালিকের ছেলে বাড়ি নেই। মালিকও নেই। কাউন্টারে বললাম। সঙ্গেও কিছু ছিল না। কাউণ্টারের লোক রাজি হল না।

আমার তো ধরণী দ্বিধা হও দশা। মানসের মুখে তাকাতে পারছি না ! সুনীলের মুখেও না। ভেবেছিলাম এমনিতে খাইয়ে একটা বলার মত কেরদানি হবে। কেননা তার অল্পদিন আগে মিহির আর শঙ্করকে নিয়ে বাকিতে

ভবানীতে সিনেমা দেখিয়েছি।

তারও আগে ট্রাম কোম্পানির ক্যাশে আছি এই পরিচয়ে কয়েকজনকে নিয়ে ধর্মতলা থেকে কলেজ স্ট্রীট বিনা টিকিটে গিয়েছি। পরে—অনেক পরে সুনীল বলেছিল, সেদিন রাতে দোকানে তোর মুখখানা কোন পরাক্রান্ত রাজার মত দেখাচ্ছিল—এত সুন্দর।

ও কোথায় কোথায় যে সুন্দরকে দেখতে পেত! পরে তো ছোটদের জন্যে লেখা একখানি বইয়ের আশ্চর্য নাম দিয়েছিল—ভয়ংকর সুন্দর!

আসলে সেই বয়সটায় পা দু'খানি ছিল স্প্রিং। যে জানত সে বাতাসের ভেতর লুকোনো দুটি ডানা খুঁজে নিয়ে উড়ে পড়ত। ঢাকুরিয়ার রেললাইন পেরিয়ে বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় থাকত। আমাদেরই সমবয়সী। অসম্ভব সাহিত্যপ্রেমিক মানুষ। ওঁর শ্বশুরমশাই সার্ভে জিনিসটি ভাল বুঝতেন। আমি তখন জমির নেশায় ডুবে আছি। বাসুদেবের অনুরোধে ওর শ্বশুরমশাই জমি মেপে দিয়েছিলেন। প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা।

বাসুদেব সাহিত্য পত্রিকা বের করল। তাতে সুনীল লিখল গল্প। খুবই ভাল গল্প। আমি লিখলাম ধারাবাহিক উপন্যাস। তিনটি সংখ্যা বেরিয়ে কাগজ বন্ধ হয়ে যায়। উপন্যাসের নাম ছিল—গণেশের বিষয়আশয়।

তখন ধান চাষ করছি। ইটখোলা করছি। গরুর নেশায় মজে আছি। এর ভেতর একদিন কলকাতার বাইরে আমার বাড়িতে সাগরদা—সাগরময় ঘোষ এলেন। সঙ্গে আনন্দ পাবলিশার্সের ফণীদা। বন্ধুবান্ধবরাও এল।

এর ক'দিন বাদে সাগরদা আমায় সাপ্তাহিক দেশে ধারাবাহিক উপন্যাস লিখতে বললেন। কিন্তু লিখব কি? তখন যে বাসুদেবের কাগজে গণেশের বিষয়আশয় তিন কিস্তি পড়ে আছে। আর আমিও জমি, পরচা, মৌজা ম্যাপ এসব নিয়ে পড়ে আছি। তার ওপর ট্রেনে করে কলকাতায় গিয়ে আনন্দবাজারে খবর লিখি।

ব্যাপারটা বললাম সাগরদাকে।

সাগরদা বললেন. ওইটেই লেখো।

লিখলাম। নাম দিলাম কুবেরের বিষয়আশয়। তখন সুবোধ—সুবোধ দাশগুপ্ত আমার বাড়িতেই থাকত। নতুন বাড়ি খুঁজে নিয়ে উঠে যাবে। ওর খুব কষ্ট হত আমার ওখানে থাকতে। অনেকটা হেঁটে রেল স্টেশন। ছেলেমেয়ে ছোট। আমার দুটিও ছোট ছিল। সুবোধের মেয়ে সুরঞ্জনা তখন ছোট খুব। কে জানতো পরে মাধব মালঞ্চী কইন্যায় অত সুন্দর করবে—প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী হয়ে উঠবে। আমি বাড়ির সামনের খাল থেকে মাছ ধরে আনায় ওরা খুব আনন্দ পেয়েছিল। খুশীও হয়েছিল।

সুবোধ আমাদের গল্পের ছবি আঁকত। আঁকতে গিয়ে গল্পটা ও-ই প্রথম

পড়ত। পরে আমাদের প্রায় সবারই উপন্যাসের প্রচ্ছদ এঁকেছে। একসময় কলেজ স্ট্রীটে ও-ই ছিল সেরা প্রচ্ছদ-আঁকিয়ে।

আমি লিখতাম এক ঘরে বসে। পাশের ঘরে ম্যানাসস্ক্রিপ্ট দিতাম সুবোধকে। সুবোধ ছবি আঁকত। দুর্দান্ত। আমার লেখার চেয়ে ভাল। তাই ছাপা হত দেশে।

একদিন বিকেলের ডিউটিতে অফিসে গিয়ে দেখি দেশের একটা খাম পড়ে আছে লেটারবক্সে। আমার নামে। সাগরদার হাতের লেখা। খুলে ভীষণ ঝাঁকুনি খেলাম। শ্যামল, চার সপ্তাহের ভেতর উপন্যাস শেষ করে দাও।

কি ব্যাপার? সবে ৩০/৩২ কিস্তি লিখেছি। রাত ন'টা নাগাদ ডিউটির শেষে সুনীলের সঙ্গে দেখা। বোধহয় শীতকাল ছিল। ও তখন সবে গাড়ি কিনেছে। ডি এল্ ডি-র পরে কি একটা নম্বর ছিল। কাঁহা কাঁহা ঘুরলাম মনে নেই। রাত দেড়টা দুটো নাগাদ আমরা বেলভেডিয়ারে। ঝকঝকে স্ট্রীট লাইট। কুয়াশা। কোন কুকুর নেই, লোক নেই। আমি তখন কলকাতার বাইরে থাকি। বাড়ি ফেরার ট্রেন নেই তখন। বেলভেডিয়ারে ছোটবোন থাকত। আমি সেখানে নেমে যাব।

সুনীল ড্রাইভার মহেন্দ্রকে ব্যাকসিটে বসিয়ে আমাকে পাশে নিয়ে গাড়ি চালানো শেখাতে লাগল। ফাঁকা রাস্তা। গাড়ির ডানদিকটা ফুটপাথে উঠে গেছে। গাড়ি এগোয় আর এক একটা পার্টস্ ভাঙার আওয়াজ কানে ঢোকে। পেছন থেকে মহেন্দ্র বলে, দাদাবাবু! দাদাবাবু!

এর বেশ ক'বছর পরে আমার গাড়িতে রাত দুটোয় সুনীল আর একবার গাড়ি চালানো শিখিয়েছিল আমায়। সেবার শুধু পিনিয়ন চেনটা কেটে যায়। তবে দু'জনই আমরা সেদিন গাড়িসুদ্ধ লেকের জলে নেমে যেতে পারতাম। কেননা একবার গাড়ি ব্যাক করার সময় পেছনে তাকিয়ে সে-রাতে দেখেছিলাম—জল আর মাত্র হাত দুই দূরে।

অনেক কিছুই আমি সুনীলের কাছ থেকে শিখেছি। যেমন: জল মেশাবি বেশি। তাতে লিভার ভাল থাকে। গান শুনবি। ওর কথা শুনে আমি গান শুনতে শিখি। বিশ বছরের ওপর শুনে যাচ্ছি। খাবার পর গাড়িতে জানলার কাচ তুলে দিবি। নয়তো বাতাস লেগে চড়ে যাবে।

ওকে দেখেও অনেক কিছু শিখেছি। কথা বলার আগে আর একেবারে শেষে হাসতে হয় একবার। ও অনেক বই পড়ে এসে এক এক সন্ধ্যায় গল্পের মত সব বলে দিত। জল আর সোডা সমান সমান দিলে ভাল হয়। আর ওর পড়াশুনো তো অগাধ। কোন কিছুতেই আমি ওর কাছাকাছি যেতে পারিনি। ও গোগ্রাসে বই পড়তে পারে।

শুধু বিনা চেষ্টাতেই দুটো বিষয়ে আমি সম্ভবত ওর সমান বা এগিয়ে

আছি। এক ঃ যা-ই খাই সব হজম। দুই ঃ যে-কোন জায়গায় ঘুমিয়ে পড়তে পারি।

একটি বিষয়ে ওর সঙ্গে আমার মিল আছে। ভাল বই পড়লে আমিও সুনীলের মত কেঁদে ফেলি। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলি।

কিন্তু সুনীল কত ফর্সা। হাতের খেলা কত ভাল। গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে কবিতাও লিখতে পারে। আমার মত বানান-ভুল হয় না। আর গান তো সুন্দর গায়ই। শক্তিও। শক্তির গলা তো দানাদার। সিরাজ গাইতে জানলে অমন গাইত। সেদিক থেকে মতিও আমার শিক্ষক। সন্দীপনও। আমি কাজ করতাম তিরিশ টন ওপেন হার্থ ফারনেসে। কলেজ-জীবনের বেশিরভাগ ভোররাতে কুস্তি করতে গেছি। টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোয় ড্রাইভারদের আড্ডায়—নয়তো টালিগঞ্জ পুলিস ফাঁড়িতে হাবিলদারদের আড্ডায়। কমুনিকেশন গ্যাপের জন্যে যাদের প্রেমে পড়েছি তাদের সঙ্গে এগোতে পারিনি—সব ভেস্তে গেছে। ছাত্র ফেডারেশন করার দরুন, পার্টি জি বি অ্যাটেন্ড করার ফলে পুলিসের খাতায় নাম ওঠে। ছাত্রজীবনে ধীরেনবাবু নামে এক আই বি ভদ্রলোক আমায় ওয়াচ করতেন। রিপোর্ট পাঠাতেন। পরে তিনি বলেছিলেন, একবার এসে যদি বলতেন তো আমি সব মুছে দিতাম। ততদিনে ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে।

বেশি বয়সে খারাপ রেজাল্ট নিয়ে আমি লিখতে আসি। এডুকেশন নিল। বানান-ভুল। হাতের লেখা খারাপ। গান জানি না। হাসলে মগ্ন খুনী সমান লাগে। মাথায় চুল আঁচড়ানো যায় না। কোঁকড়া। বলা যায় বর্ণহিন্দু সাঁওতাল।

ঠিক এই সময় শিক্ষক হিসেবে আমি পাই—

ডক্টর সন্তোষকুমার ঘোষ

ডক্টর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ডক্টর মতি নন্দী

ডক্টর সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়

এঁদের।

চারজনই কলকাতাকে গুলে-খাওয়া-লোক। পাঁড় কলকাতানু। সন্তোষদা, সুনীল, সন্দীপন কবিতা-গল্প—দুই-ই বোঝে। সেইসঙ্গে সুনীল গান জানে। সন্দীপন জানে আহিরিটোলা, হাওড়া। মতির দখলে শোভাবাজার। এছাড়াও মতি জানে গদ্য, টেস্টম্যাচ, আই এফ এ শিল্ড—এবং স্টেটবাস অনেকটাই। ধুতি পাঞ্জাবি পরলে সবচেয়ে সুন্দর লাগত মতিকে। ও খুব কদাচিৎ কোঁচানো ধুতির সঙ্গে গিলেকরা পাঞ্জাবি পরত। মাংসের হাড় চিবানোর সময় আমি অনেকদিন মতির ডান কপাল ঘেমে উঠতে দেখেছি। ওদের বাড়ি এত পুরনো—কলকাতার বুকে বেশ খানিকটা বসে গিয়েছিল। গলিতে গ্যাসের আলোর খুঁটি।

কোন একটা সময়ে আমাদের কয়েক বন্ধুর বয়স কিছুদিনের জন্যে এক

জায়গায় থেমে গেল। তখনও আমাদের বয়স বেড়েই যাচ্ছিল। থেমে থাকছিল না। কিছুতেই। তারপরেই কয়েকটি সংকলনে দেখলাম কয়েকজনের জন্মসাল কিছুটা এগিয়ে এসেছে। ওরা হঠাৎ আমাদের চেয়ে বয়সে ছোট হয়ে গেছে।

এসবেরই ভেতর একদিন গঙ্গার সামনে ফুলেশ্বরী বাঙলোর চাতালে কয়েকজন মিলে জুয়া খেললাম। আগে খেলিনি। আমায় আবছামত শিখিয়ে নিল সবাই। খেলতেই আমি জিততে থাকলাম। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পেচ্ছাপ করছি টয়লেটে। বন্ধুদের টাকা আমার পকেটে গজগজ করছে। সুনীলকে ব্যাপারটা বললাম। সুনীল বলল, জুয়ার টাকা ফেরত দিতে নেই। প্রথম শিখে সবাই ওরকম জেতে।

সম্প্রতি একটি শারদ সংখ্যার সম্পাদক আমার উপন্যাস সবটা ধরাতে না পেরে খানিকটা কেটে রাখেন। তাঁর উপন্যাসও ছিল এই সংখ্যায়। কাগজ বেরোবার পর তিনি একথা আমায় জানান।

আরেকজন সম্পাদককে আমি জানতাম। তিনি মধুসূদন মজুমদার। নবকল্লোলে শারদীয় উপন্যাস দিয়েছি। ঈশ্বরীতলার রূপোকথা। বড় হয়ে গেছে। কাগজ বেরুবার পর জানলাম মধুদা তাঁর উপন্যাস তুলে রেখেছেন—আমার উপন্যাস ধরাবার জন্যে। অন্ধ ছিলেন বলেই হয়ত পেরেছিলেন। উনি চাইতেন—লেখক হিসেবে অনেকে আমাকে চিনুক—অনেকে আমাকে পড়ুক। ওঁর উৎসাহেই তাই একবার উত্তর কলকাতার এক কালীপুজোর মণ্ডপে গুণীজন সংবর্ধনায় আমাকে মঞ্চে ঠেলে তোলা হয়েছিল—আঙুরবালার পাশে।

আরেকজন সম্পাদক—অমৃতের মণীন্দ্র রায়। মণিদা। তিনিও মধুদার মতই আমার অতি খারাপ সময়ে আগ্রহ নিয়ে অদ্য শেষ রজনী ছেপেছিলেন। ওঁরা দু'জন কি জানতেন—তখন ওঁরা না ছাপলে আমি আর লিখতামই না? ওঁরা দু'জন সদয় হয়ে লেখা চেয়েছিলেন বলেই উৎসাহ ফিরে পেয়েছিলাম।

আরও একজন সম্পাদক—রবি বসু। কাগজ করা ওঁর এক নেশা। মনের মত কাগজ। কাগজ পান তো স্বাধীনতা পান না। স্বাধীনতা পান তো কাগজ নেই।

অনেকটা আমার মত। লেখা আছে—কিন্তু সে লেখা ছাপার মত কাগজ নেই। কাগজ আছে—কিন্তু সে কাগজের মত লেখা আমার নেই।

প্রত্যেক সম্পাদকই তাঁর নিজের সাধ্য আর মেধা মত লেখা চেয়ে থাকেন। আমিও পরে অমৃতের সম্পাদক হিসেবে তরুণ নবীন প্রতিভাদের কাছে লেখা চেয়েছি। আমার সাধ্য আর মেধা অনুযায়ী।

এজন্যে কাউকে দোষ দিয়ে কোন লাভ নেই।

তা রবি বসু হঠাৎ আমার কাছে লেখা চাইলেন। একটি নতুন কাগজ। প্রতি পুজোয় রবিবাবু একটি করে নতুন কাগজ বের করতেন। তার মানে তখন তিনি

উদ্বাস্তু। কোন পাকা কাগজে তখন আর কি তিনি পাকাপাকি নেই, বুঝতে হবে। সেরকমই এক হঠাৎ-ভেসে-ওঠা কাগজে ওঁর জন্যে লিখেছিলাম—সরমা ও নীলকান্ত।

সন্তোষদাকে কপি দিতাম আনন্দবাজারের জন্য। বিমলদাকে গল্প দিতাম দেশের জন্যে। রবিবাবুকে উপন্যাস দিয়েছি শারদ সংখ্যার জন্যে। গৌরকিশোর ঘোষ—গৌরদাকেও কপি দিয়েছি। এখন সন্তোষদার মেয়ে কাকলীকে রবিবারের বর্তমানের জন্যে গল্প দিই—শারদ বর্তমানের জন্যে উপন্যাস। রবিবাবুর ছেলে অশোক, বিমলদার মেয়ে অনুভা, গৌরদার মেয়ে সাহানাকে সাপ্তাহিক বর্তমানের জন্যে ধারাবাহিক উপন্যাস—অন্য লেখা দিই।

প্রেমেনদা একসময় বলেছিলেন—কল্লোল যুগ বলে কিছু ছিল না। অচিন্ত্য-কুমারের কল্লোল যুগ বইটি আমাদের খুব মনে ধরেছিল। কথাটা শুনে কষ্ট পেয়েছিলাম।

পরে ভেবেছি—আমি কি কৃত্তিবাসের কেউ ছিলাম? যাঁরা আজকের কবি—বিশিষ্ট কবি—তাঁরা প্রায় সবাই ওখানে লিখেছেন। আমিও ৫৪।৫৫ সনে একটি ছোট গদ্য লিখেছিলাম। পরে ৬৪-৬৫ সনে একটি বড়গল্প লিখেছিলাম। ব্যাস্! আজকের যাঁরা গদ্যলেখক—তাঁদের ক'জন ওখানে লিখেছেন?

বলা যায়—যারা কৃত্তিবাস করত—তারা সবাই আমাদের ভীষণ বন্ধু ছিল। আমরা কৃত্তিবাসের জয় চাইতাম। কিন্তু সেইভাবে সেখানে লিখিনি।

১৬-১৭ বছর আগে কৃত্তিবাসের জন্য কোমর বেঁধে লেগেছিলাম। তখন কৃত্তিবাস ছিল দেখা হবার জায়গা। ঘন মেশামিশির জায়গা। সেই সুবাদে একখানি ধারাবাহিক, একটি বড় গল্প, কিছু সমালোচনা লিখেছি। একটি বিশেষ সংখ্যা সম্পাদনা করেছিলাম। তখন আমার মন বলেছে—ওরা আমার বন্ধু—কিন্তু আমি কৃত্তিবাসের কেউ নই। তখন কৃত্তিবাস করতে গিয়ে বন্ধুত্বের কলকল আওয়াজ বুকের ভেতর টের পেতাম। বুঝতাম জল বাড়ছে।

তখনই অজিতেশ, কেয়া, রুদ্রপ্রসাদ, অসীম চক্রবর্তী—কিছু পরে মনোজ মিত্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়। গান শুনি প্রভার মেয়ে কেতকী—ছোড়দির। কলকাতার স্টেজের ধুলো তখন নাকে যেত। রিহার্সাল দেখতাম। বেপরোয়া অসীম, সাহসী কেয়া, অকুতোভয় অজিতেশ, রসিক মনোজ—এরা সবাই এক একজন দিকপাল লোক। নাটক লেখা, মহলা, হল আর টাকা যোগাড়, দর্শক ভোলানো—সব ব্যাপারেই এরা যেন বালজাকের হিউম্যান কমেডির এক একটি অংশ। এদের দেখেই আমার মনে অদ্য শেষ রজনী এসেছিল। একবার তো ভালমানুষের মেয়ে দেখতে গেছি। আমার স্ত্রী ইতিকে গ্রিনরুমে ঢুকতে দেবে, কিন্তু আমাকে দেবে না। আমি সেবারে কড়া কড়া কথা লিখেছিলাম। মরে যাবার দুদিন আগে কেয়ার ফোন—আপনি অজিতদার সঙ্গে মিটিয়ে নিন।

অজিতেশকে কেয়া অজিতদা বলত। ক্রেয়নের ভূমিকায় অজিতেশকে চোখ বুজলেই দেখতে পাই আজও। পাপপুণ্য নাটকে অজিতেশ যখন হাফপ্যান্ট পরে সাইকেল নিয়ে ঢুকত—মনে মনে বলতাম—কিং কিং! কী গভীর গলায় স্বীকারোক্তি ছিল ওর পাপপুণ্যে!

সাগিরুদ্দিনের কাছে ওঁর স্ত্রী তালিম নিতেন। একদিন সেখানে ওঁর স্ত্রীকে নামিয়ে দিয়ে অজিতেশের সঙ্গে মহলায় গেছি।

একদিন প্রায় সারাদিন ঠুংরি শুনলাম। মাথাটা সাফ করতে গঙ্গার ঘাটে গেছি। যিনি শুনিয়েছিলেন—তিনি রাম্ খেয়েছেন। আমরা যারা শুনছিলাম—আমরাও খুব রাম্ খেয়েছি। গাইতে গাইতে রাম্ খেতে খেতে মহিলা আবেগের চোটে খুব কাঁদতে শুরু করে দিলেন। সারাদিন গেয়েছেন। তারপর রাম্। তারও পরে কান্না। মহিলাকে নিয়ে গেছি গঙ্গার ঘাটে। সেখানে অসীমের সঙ্গে দেখা। তখন ও থিয়েটার কল শোয়ের ডাক নিয়ে গাঁয়েগঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার গায়ে একটা খাকি হাফশার্ট ছিল। চোখে ঠুংরি। মাথায় ঠুংরি। বেনারসি ঠুংরির তরকিপের কাজ ঘিলুর ভেতর বিঁধে আছে তখনও।

অসীম দেখেই বলল, এ কি শার্ট গায়ে দিয়েছ? কখনও এমন শার্ট গায়ে দেবে না।—বলতে বলতে ও গাড়ির ভেতর থেকে একটা পাঞ্জাবি এনে আমার গায়ে পরিয়ে দিল। শার্টের ওপর দিয়ে।

ওর পাঞ্জাবি আমার গায়ে বড় হবেই। অনেক লম্বা ছিল অসীম। গঙ্গাতীরে আমি যেন রেমন সার্কাসের ক্লাউন। কৃত্তিবাস যাতে ভাল করে চলে সেজন্যে প্রায়ই গোছা গোছা নোট দিত। সামান্য বিজ্ঞাপনের নামে।

মনোজ মিত্র সরকারী কলেজে দর্শন পড়াতেন। সাজানো বাগানে মনোজ নিজে বাঞ্ছার মুখ দিয়ে যখন বলেন, কথা রাখতি পারলাম না—মরা হয়নি—কথার খেলাপ হয়ে গেল—তখন ভাবি, আমরা সবাই মিলে কী লিখলাম? একা মনোজ সারাজীবনের কথা—জগৎসংসারের সব কথা ফস করে এভাবে বলে দিলেন? হাসাতে হাসাতে হঠাৎ গম্ভীর করে দিয়ে? যে যার মূলে ফিরে গেলাম? উনি কি বুঝে-শুনে করেন? না আন্দাজে? উনি কে? আসলে কে?

কৃত্তিবাস করতে গিয়ে লাভ হয়েছিল গণেশদার মত মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়ে। গণেশচাঁদ দে। তাঁর প্রেসেই ছাপা হত কৃত্তিবাস। ওখানেই ছাপা হত সোভিয়েত দেশ। যেদিন কাগজ বেরুত সেদিন বলতেন, 'আয় শ্যামল, আজ আমরা কাগজ কাঁধে নিয়ে গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে যাব।'

একবার পুজোর আগে প্রেস কর্মীদের বোনাস দিচ্ছেন। আমি আর সুনীল বসেছিলাম। বললেন, 'সই কর।' আমরা একখানি খাতায় সই করলাম। নোট গুনে আমাদের প্রেসের রেটে বোনাস দিয়ে দিলেন। দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে

ঠাণ্ডা লাগিয়ে ফিরে এসে মারা গেলেন।

কৃত্তিবাস করতে গিয়ে এক বাল্যসখীর সঙ্গে ফিরে দেখা। রাণু তখন একটি ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির হয়ে মাল বওয়ার ট্রিপ ধরে। কাজটা খুব কঠিন। এর ভেতর রাণু একবার বিয়ে করে তালাক নিয়েছে। নিউইয়র্কে গিয়ে বিউটিশিয়ানের কাজ শিখে এসেছে। দিনে একরকম লিপস্টিক—সন্ধ্যায় আরেক রকম। একটি ছেলে। আসানসোলের বোর্ডিং হাউসে থাকে। ভুল ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলে যেতে পারে।

একদিন সন্ধ্যায় পার্ক হোটেলের উল্টোদিকে একটা লাল নিওন বিজ্ঞাপনের জ্বলে-ওঠা নিভে-যাওয়া আলোর ভেতর রাণুকে দেখি একটি বিদেশী গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে।

এখানে ?

একটা লোককে ধরব।

দেখলাম, ফাঁদ পেতেছে রাণু। কোন কোম্পানির মাল বওয়ার অর্ডার হাতাবে বলে। দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছিল রাণুকে। ওর বাবা আসামে চা-বাগানের মালিক ছিলেন। চাঁদনী রাতে ওর বাবা একদিন জুয়ো খেলে সাইকেলে ফিরছিলেন। হাতি তাড়া করে। জ্যোৎস্নার ভেতর পকেট থেকে খুচরো টাকা, আধুলি ফেলতে ফেলতে জোরে প্যাডেল করে পালিয়ে আসেন রাণুর বাবা। চাঁদের আলোয় খুচরোগুলো রুপোলি ঝিলিক তুলেছিল। সেই সঙ্গে রাস্তায় পড়ে ঠুং-ঠাং শব্দ। হাতিদের বিভ্রম ঘটেছিল।

রাণুকে বললাম, এসো—কৃত্তিবাসের বিজ্ঞাপন করো।

রাণু এল। আমি আর রাণু একদিন শ'ওয়ালেসের দোতলায় ওদের মালিক হেওয়ার্ড-সাহেবের সঙ্গে দেখা করলাম। হরেক ব্যবসা। তার ভেতর একটি হল হেওয়ার্ডের নামে হুইস্কি। তাছাড় সার, চা-বাগান, বিয়ার কত কি! হেওয়ার্ডরা একশ বছরের ওপর এদেশে ব্যবসায়ী। তখনও শ'ওয়ালেস হাত বদলায়নি। কোন্নগরে না চন্দননগরে ওদের কাকার নামে রাস্তা আছে। ভদ্রেশ্বরে ভাটিখানা।

হেওয়ার্ড বেশ সুপুরুষ। আমাদের ওর ভিলায় নেমন্তন্ন করল। গিয়ে দেখি সুইমিং পুলের পাশে বড় ছাতার নিচে বরফ সাজানো। কাচের বিরাট মাগ। হেওয়ার্ড জাঙিয়া পরে পুলে। হাত তুলে ডাকল রাণুকে।

রাণু কিছুক্ষণ না-না করল ভুল ইংরেজিতে। আমিও কমপ্লিট ভুল ইংরেজিতে কথা বলছিলাম। একজন সুসজ্জিতা পরিচারিকা এসে রাণুকে একটা কাঠের ঝরোকার আড়ালে নিয়ে গেল। রাণু খানিক বাদে সুইমিং কস্টিউম পরে এসে জলে ঝাঁপ দিল। সেই প্রথম আমি রাণুর ফিগার দেখলাম। দারুণ! ছোটবেলায় ভালবেসে কী বোকার মত মিনমিন করতাম। আসলে আমার মত

লোককেই বোধহয় মেনিমুখো বলা হয়।

আমরা ছ'মাসের বিজ্ঞাপন পেলাম।

ইন্দিরা ভোটে হারলে জ্যোতি—জ্যোতির্ময় দত্তের কলকাতা কাগজের স্বাধীনতা সংখ্যা বেরুলো। এমারজেন্সির সময় জ্যোতিকে পুলিশ খুব হয়রান করেছিল। জ্যোতির পা ভেঙে যায় তখন। আমি ইন্দিরার সাহসিকতার গুণগ্রাহী। আবার জ্যোতির এ অবস্থার জন্য দুঃখ পাই। ইন্দিরা ভোটে জিতে ফের প্রধানমন্ত্রী। প্রজাতন্ত্র দিবসে কবি সম্মেলন। সেখানে জ্যোতির কলকাতা কাগজের স্বাধীনতা সংখ্যার কবিও নেমন্তন্ন নিলেন। গেলেন। কবিতা পড়লেন। স্বাধীন দেশে এমনটি হওয়াই তো স্বাভাবিক। গণতন্ত্রে এরকমই হয়।

জ্যোতির মত ঝকঝকে লেখা ক'জন লিখতে পারে? তেমনি সুন্দর কাগজ করে ও। একবার বলেছিলাম, তোমার পুরো 'কলকাতা' অমৃতে ছাপব।

দিব্যেন্দু আনন্দবাজারে তিনবার জয়েন করেছে। আমি দু'বার। প্রথমবার কিছুদিন কাজ করে ছেড়ে দিয়ে স্কুলে চলে যাই। ফের ফিরে আসি প্রায় বিশ বছরের জন্যে। তারপর আবার ছেড়ে দিই।

দিব্যেন্দু গোড়ায় হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডে সাংবাদিক ছিল। কাজ হল না। অনেক বছর বিজ্ঞাপন এজেন্সি করে তবে আনন্দবাজারের বিজ্ঞাপনে এল। ফের ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। আবার ফিরে এল সাংবাদিক হয়ে। অতি অল্পবয়স থেকে অসম্ভব কষ্ট করে ও এগিয়েছে। এই এত কাণ্ডের ভেতর অতি অল্প বয়স থেকে লিখে এসেছে। দিব্যেন্দুর 'আমরা' উপন্যাসের ভেতর আমি বার বার আমাদের জীবনকে দেখতে পাই।

খুব নিয়মতান্ত্রিক। একদিকে বিজ্ঞাপন জগতের টেনশন। অন্যদিকে লেখার টেনশন। একবার শারদ অমৃতে ওর একটি উপন্যাস ধরাতে ও যেমন কষ্ট করেছিল—আমিও যৎসামান্য করেছিলাম। উপন্যাসটির নাম সহযোদ্ধা। যা কিনা এখন যথেষ্ট প্রশংসিত, আলোচিত। এমন লেখা ছাপতে পারলে সম্পাদকের আনন্দ হয়। একসময় ওর চোখের অসুখ, কলকাতায় অনিশ্চিত থাকা, বিজলি গ্রিলে দেবুদার দোকানে খাওয়া—তার ভেতর ও কিন্তু দমেনি। সব সময় সবার জন্যে চিন্তা করত, খোঁজ নিত।

আরেকজনের কথা সহজে লেখা যায় না। বিদুষী? হ্যাঁ। রসিক? হ্যাঁ। খটোমটো প্রবন্ধ লিখতে পারে? হ্যাঁ। গাড়ি চালায়? হ্যাঁ, ভীষণ জোরে। এক অদ্ভুত রকমের লেখা লেখে—যা দেখতে বাইরে থেকে হাসির—ভেতর থেকে গম্ভীর। নবনীতার কবিতার কথা আমি বলার অধিকারী নই। ওর গদ্য—বিশেষ করে ভ্রমণে আর গল্পে—গল্পে আর গভীর উপন্যাসে ও এত অনায়াসে যাতায়াত করে—মনে হবে—লিখছেই না—যেন সামনে দাঁড়িয়ে বলছে।

ও একবার একটি ইংরেজি প্রবন্ধ লিখেছিল—একজিসটেনশিয়ালিজম নিয়ে। অক্সফোর্ডে না কোথায় সেটি কোন সেমিনারে পড়েছিল হয়ত। দিল্লির হিন্দুস্থান টাইমস্ ছেপেছিল। বাংলা উপন্যাসে অস্তিত্ববাদ। তাতে আমার একটি উপন্যাসের কথা কয়েকবার ছিল। আমার প্রথম উপন্যাস। বহু বছর পরে সেই প্রবন্ধ বাবদে ব্রিটিশ কাউন্সিলের নেমন্তন্ন পাই বিলেত ঘোরার জন্যে। যদিও আমি যাইনি—অন্য কারণে। এই ঘোরাঘুরি যে আমার চায়ের কাপ নয়—তা দু-চারটে দেশ ঘুরে বুঝে গিয়েছিলাম।

একবার টোকিও থেকে দেশে ফেরার পথে অমর্ত্য সেনের সঙ্গে একযাত্রায় অনেকক্ষণ কথা হয়। ব্রহ্মের ওপর এয়ার পকেটে পড়েছিল প্লেনটা। তাই খানিকক্ষণের জন্যে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। পরে আমার মনে হয়েছে নবনীতা নিজের আলাদা একটা ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলতে চেয়েছিল। তা ও পেরেওছে। অতি অল্পদিনে ও বিপুল পাঠক পেয়েছে। কিন্তু সেমিনার, সভাই ওর লেখার সব খেয়ে নেয়। নয়তো নবনীতা তো বেশ রসক্ষ্যাপা লোক।

বছর পনের আগে অমৃত করতে গিয়ে একঝাঁক নতুন, তাজা লেখকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাদের অনেকে লিখছে। আরও নতুন নতুন অনেকে লিখতে এসে গেছে।

আমাদের মাথার ওপর অনেকে নেই। এখন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয় না। ফোনে লাইন পেলে সামান্য কথা হয়। নবীনতরদের লেখা পড়ে মনে হয়—অনেক কিছু লেখার ছিল—লিখতে পারিনি। সেই শক্তি নিয়ে আসিনি। আমার সময়ের অনেকের লেখা পড়ে এই একই কথা মনে হয় আমার।

স্বপ্নময়ের গল্পগ্রন্থ ভূমিসূত্র পড়ে চমকে উঠেছি। কী ভাল লেখা। অমর মিত্র রীতিমত লেখক হয়ে উঠেছে। শৈবাল মিত্র বার বার আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে—রাজনৈতিক বিশ্বাস আর সংগ্রামের জায়গা থেকেও অনেক কিছু লেখার আছে—যা আমরা কেউই পারিনি।

কিন্নর রায় ঢালাও জীবনযাপন করছে। সে জানে জীবনযাপন থেকে লেখক উঠে আসে। তার আরও সময় চাই। সময়ের দূরত্ব চাই। তার পায়ের নিচের মাটি শক্ত।

রাধাপ্রসাদ নিয়মিত লিখছে। নানা ভাবনার লেখা। তার ভাষায় কল্পনা আছে। তার জীবনের পটভূমি নানা বাধাবিপত্তিতে ভরা। তবু সে এগিয়ে চলেছে। বিশেষ করে একটি মাছকে নিয়ে লেখা তার গল্প আমায় ভাবিয়েছে। মাছটি মরিয়াও মরে না। বার বার বেঁচে ওঠে।

বাড়ি করা নিয়ে নলিনী বেরার গল্প—ভগীরথ মিশ্রের একটি নিরুপায় চরিত্র নিয়ে অপমানিত মানুষের গল্প—দু'জনই বিভূতিভূষণকে মনে করিয়ে দেয়।

একসময় মনে হয়েছে—এই যে কথা ক'টি লিখলাম—না-জানি তা কত

অভিনব। অজর অক্ষয়। পরে দেখেছি—নিজের ছাপা লেখার দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে—এই যে পাতার পর পাতা—শুধুই কালো কালো হরফ। শুধুই বকবকানি। অপাঠ্য। অর্থহীন। সারা পৃথিবী জুড়ে কত কত লেখক কতদিন ধরে লিখে আসছেন—তার ভেতর বেশির ভাগই ক্ষীণায়ু, হারিয়ে যাবার জিনিস। এর ভেতর আমি আর জঞ্জাল বাড়াই কেন?

আবার এও তো দেখেছি—কত তরুণ দুই চোখে দৈবী জিজ্ঞাসা নিয়ে পাতার পর পাতা লিখে চলেছে নিজের অভিজ্ঞতাই তার কাছে সবচেয়ে উত্তপ্ত—নিজের ভাষাই তার কাছে অমোঘ। এর কি কোন দাম নেই? আমি নিজেও তো তাই করে এসেছি।

অযুত, অর্বুদ অভিজ্ঞতা, বর্ণ গন্ধ দিয়ে এই পৃথিবী আর তার মানুষজন। এর ভেতর ঠিক কোন্ রচনা শিল্প হয়ে উঠবে কে বলতে পারে? আমার মনে হয় এই উদ্যমের জন্যেই মানুষ মহান।

বার বার অপারেশনের ভেতর দিয়ে শৈবাল মিত্র জীবনমরণের মাঝখানে ভাসতে ভাসতে লেখার দিকে ঝুঁকেছে। একটি রাজনৈতিক বিশ্বাসের জন্যে সে প্রাণ দিতে বসেছিল। আমরা কেউ কি এরকম করেছি? জানি না। মানুষে অগাধ বিশ্বাস নিয়ে সে লিখতে বসেছে। পুরনো বিশ্বাস ফাঁপা বুঝতে পারলে সে তা আঁকড়ে ধরে থাকেনি। যথেষ্ট সাহসী হয়ে সে নিজের পথ খুঁজে বেড়িয়েছে। আজ বলা যায়—সে পথ সে খুঁজে পেয়েছে। তার লেখা আমাদের চেয়ে এগিয়ে। শিল্পের কাজ পিরামিড কিংবা নদীর বাঁধের মতই এগোয়। একদল খানিকটা করেন—আরেকদল তার পর থেকে এগিয়ে নিয়ে যান, পরের দলের হাতে তুলে দেবার জন্যে।

মানিকবাবুদের পদ্ধতি-প্রকরণ সন্তোষদা-সমরেশবাবুদের হাতে পড়ে আরেকরকম হয়েছে। সেই রূপটা মতি-সুনীলদের হাতে এসে নতুন চেহারা পেয়েছে। সঞ্জীব-সমরেশ মজুমদার তা আরও ধারাল করে ফেলেছে। অমর মিত্র—স্বপ্নময় ভগীরথ—কিন্নর সেই ধারাল প্রকরণে পান দিয়েছে। ভার দিয়েছে। ওজন এনেছে। রাধাপ্রসাদ-অনিল ঘড়াই তার সঙ্গে তাদের সময়ের দৃষ্টি-অঞ্জন দিয়ে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

এ এক বহতা নদী। নানা ঘাট ছুঁয়ে তার যাত্রা। কে কবে কোথায় সেই বহতা স্রোতে পা ডুবিয়েছিল—সেটা আর বড় কথা থাকে না। বড় কথা হল এই বহতা গতি।

অমর মিত্র মহিষবাথানে অপারেশন বর্গার সময় কানুনগো ছিল। তার তখনকার লেখায় মাটি নিয়ে মানুষের লোভ ফুটে উঠেছে। কিন্নর রায় কৈশোর ছাড়াচ্ছিল সত্তরে। তখন সে জেলে যায়। বেরিয়ে আসে মার খেয়ে—অপমানিত

হয়ে, বিশ্বাসের দাবানল বুকে নিয়ে। সে একটি সহজ রাস্তা নিয়েছে। আমি ভরাট জীবনযাপন করে দেখব। তাতে লেখা আসে তো ভাল। না আসে তো বয়েই গেল। এই রাস্তায় খাদ্য, সুখ, রস, বিষ, বিষাদ সবই আছে। এটি লেখকের রাস্তা—জীবনের রাস্তা।

লেখকের একটা ভাল লিভার চাই। উৎকৃষ্ট কিডনি, দুর্দান্ত হৃদ্‌যন্ত্র, চমৎকার চোখ দরকার। আর তার মনের বাতাসের নাম—জীবনে তো এমনটি হয়েই থাকে।

অমরের মতই স্বপ্নময়ও কানুনগো ছিল। ওর প্রথম দুটি গল্পগ্রন্থে স্বপ্নময় এমন সব লেখা লিখেছে—যা কিনা মনেই হবে না এসব তার গোড়ার দিককার লেখা। বরং মনে হয়—অনেকদিন ধরে মনে মনে মকসো করে তারপর লেখা। বিশেষ করে ভূমিসূত্রের গল্পে নিষ্ঠুর গ্রামীণ বদমায়েসীর ভেতরেও হেসে উঠবার মত বিরল ব্যাপার রয়ে গেছে।

ঠিকই এরকমই অদ্ভুত বিন্যাস পেয়েছিলাম বিশ বছর আগে—হাসান আজিজুল হক যখন ১৯৭১-এ ডিসেম্বরে খুলনায় বসে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে খান সেনাদের নির্যাতনে নিহত বুদ্ধিজীবীদের ওপর কষাই সমান অত্যাচারের বিবরণ দিচ্ছিলেন।

একজন নবীন গল্পকার আমায় সম্প্রতি বলেছেন, আপনি বই যেমন লিখবেন—সে বইয়ের মার্কেটিংয়ের জন্যে খাঁটি এগজিকিউটিভের মতই বিজ্ঞাপন লিখে দেবেন—লিখে দেবেন বইয়ের ভেতর মলাটের কথাগুলি। দেখবেন প্রচ্ছদ ঠিক হল কিনা।

কিন্তু কখন এসব করব?

লেখার জিনিস এত মাথায় আসে—তার বেশিরভাগই লেখা হয়ে ওঠে না। আফসোস থেকে যায়। কত কি মনে এসেছিল, লেখার সময় ভুলে গেছি। লেখা হয়নি।

এরপরেও সময় কোথায় পাব? যদি পাইও—তো সে সময়টায় তো লিখব। আজ অব্দি কোন লেখা ছাপা হবার পর পড়িনি। পড়ি না, কারণ ভয় করে। এত বাজে লাগবে পড়তে—সেই ভয়ে আর পড়া হয়নি কোনদিন।

আর যদি সময় পাইও, তবু ও-কাজ করলে—আমি যতটুকু-লেখক—তার চেয়েও খানিকটা কম লেখক হয়ে যাব যে।

তাতে নবীন গল্পকারের জবাব—তা কেন হবেন? ওটা করেও তো লেখক থাকা যায়।

কি জানি! তা কি হয়?

নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে একদিন দেখেছিলাম—খোলা মঞ্চে দাঁড়িয়ে একদল লোক নানা-ভঙ্গি করে নানা বাজনা বাজাচ্ছে। তাদের ভেতর একজন গলা খুলে

গাইছে। নিচে শ্রোতাদের ভেতর দাঁড়িয়ে একজন লোক মঞ্চের গায়ককে অবিকল নকল করে গাইছে। অঙ্গভঙ্গি করে। ভেঙিয়ে। দুতরফই দেখলাম—যে যার কাজে মগ্ন। মঞ্চের গায়ককে যদি ধরি পৃথিবী—আর শ্রোতাদের ভেতর থেকে দাঁড়িয়ে নকল করে যাওয়া লোকটিকে যদি ধরি শিল্পী—তো কেমন হয়? পৃথিবী যেমন আকর্ষণীয়—শিল্পীও তেমনি কম আকর্ষণীয় নয়।

আমাদের কিছু শিল্পীও আছেন এমন আকর্ষণীয়। নিপুণ করে তুলে আনতে পারেন। সেই নিপুণতায় বিশ্বাস করা যায়। চমকে যেতে হয়। কিন্তু তারপর? তারপর কি? বস্তু, বস্তু, বস্তু আর বস্তু। তার ভেতর থেকে ঘনত্ব, পরিতল—এসব খুঁজে পেতে হলে পাঠকের স্মৃতিভাণ্ডারে এমন দেশলাই জেবলে দিতে হয়—যেখান থেকে মানব ইতিহাসের কয়েক শতাব্দীর রহস্য সহসা বেরিয়ে পড়বে—বিপর্যয় কিংবা আবিষ্কারের খরখরে গা আলোয় ঝকঝক করে উঠবে—সেই ভুলে যাওয়া অতীত কিংবা না-জানা ভবিষ্যৎ এক পলকে বর্তমান হয়ে উঠবে। এ জিনিস আমার সময়ে আমি পাইনি। আমি এজন্যেই লিখি। এই লেখাই আমি লিখতে চাই। কুবেরের বিষয়ে কুবের দ্য ড্রিম মার্চেন্ট। সে ইস্পাতের নাচ নাচতে চায়, যে ইস্পাত ম্যালিয়েবল অ্যান্ড ডাকটাইল। নিশীথে সুকুমার গল্পটিতে সুকুমার উলঙ্গ হয়ে নাচতে নাচতে নিজের বউকে বলছে—তুমি আমার ধর্ম নেবে? আমার লেখায় কখনও কোন চরিত্র কোন গোডাউনের ভেতর দেখতে পায় ১৯৫৭ পড়ে আছে। হুবহু ১৯৫৭ কিংবা ১৯৪৩ নয়ত ১৯৭২। আস্ত ছাঁচে কাটা আলাদা একটি বছর—তার গন্ধ, ফুলেল লতা, মানুষজন নিয়ে আমার কাহিনীর ভেতর জায়গামত ওত পেতে বসে থাকে। তাদের আমি দরকার মত আনি। কিংবা তারা নিজেরাই উঠে বসে। আমার লেখায় গরু কথা বলে। বাঙলায় ডাকে। চন্দনেশ্বর জংশনে এক এক চাঁই পাথর এক একজন ঠাকুর্দা হয়ে যায়। কুকুর সময়মত এসে পারপাজ সার্ভ করে। এই রাস্তাটি কতটা সঠিক কতটা ব্যবহারযোগ্য আমি জানি না। স্বর্গের আগের স্টেশনে ভগবান রিকশা-সাইকেলে এসে পড়েন। আবার চন্দনেশ্বরের মাচানতলায় রিকশাওয়ালা সাইকেল-রিকশায় প্যাডেল করে শ্যামলবাবুকে ভগবান দেখতে নিয়ে যায়। সব মনে নেই। মনে পড়ছে না। স্বর্গের আগের স্টেশনে সাপিনীকে হারিয়ে সাপ প্রতিশোধে দংশাবে বলে ঘুরে বেড়ায় রাগে রাগে।

এসব কতটা সঠিক আমি জানি না। কিন্তু আমি পাঠকে সঞ্চারিত হতে পেরেছি। পাঠক বুঝতে পারেন আমাকে। তারা আমাকে পড়ে উদ্বেলিত হন। নিজের জীবন, শরীর, সম্মান, অস্তিত্ব, নিরাপত্তা বার বার নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার মত বিপজ্জনক জুয়ায় তলিয়ে যেতে যেতে ভেসে উঠে ঢেউয়ের ফেনায় যেটুকু খড়কুটো ধরা যায়—সেটুকুই শিল্প। নিশ্চিহ্ন হওয়ার মুখে যা জানা যায়—তা শুধুই জানা নয়—বোধিও বটে। এই বোধিকে আমি এভাবে বলি:

যে চিন্তা ঘাম দিয়ে আয় না হয়—সে-চিন্তার কোন দাম নেই।

ঘাম ঝরিয়ে—নিজেকে ক্ষয় করে যে ভাবনাকে পাই তাই হোক শিল্পের বিষয়। কথা তো বলছি বড় বড়, আমি কি নিজে সবসময় তা পেরেছি? জানি না।

আমাদের সময়ে কারও কারও ক্ষেত্রে শিল্পে সব কিছুই খুব মসৃণ, অনায়াস হয়েছে। এই মসৃণতাই মারাত্মক। বিপজ্জনক।

তাই কেউ কেউ বলতে পেরেছে—তার মৃত্যুতে যেমন পৃথিবীর কিছু যায় আসে না—তেমনই তার শিল্পও সে শিল্প থাকল—কি গেল—তাতে কিছু যায় আসে না।

আমি বিশ্বাস করি না—কোন বিশ্বাস থেকে এসব কথা বলা হয়েছে। বরং মনে হয়—এই কথার ভেতর একটি অহমিকা আছে। অবশ্য সেই অহমিকার চারদিকে ঘেরাটোপ পরানো আছে—পাছে তা বেরিয়ে পড়ে।

অহমিকাটি হলঃ দ্যাখো—আমি তাৎক্ষণিক জেনেই তো লিখে চলেছি। তবুও তা আদৌ তাৎক্ষণিক নয়। দিব্যি মনোহারী—দীর্ঘায়ুও বটে। হাঃ হাঃ! প্রায় বাঁ হাতে—

এই অহমিকার ভানটুকু বাদ দিয়েই আমি বলব, এই শিল্পী একজন বড় শিল্পী। তিনি বহু ভাল লেখা লিখেছেন।

কিন্তু আরও—আরও অনেক ভাল তাঁর লেখার কথা ছিল।

গত দেড়শ বছরের ভেতর ৮/৯টি নাম বাঙালীর মনে পাশাপাশি আসন পেয়েছে। মাইকেল, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, জীবনানন্দ, তারাশঙ্কর, মানিক, সতীনাথ। এঁরাও সবাই কি আরও পঞ্চাশ বছর আমাদের মনে পাকাপাকি থাকবেন? কেন অনেকেই মন থেকে ঝরে যান?

মনে হয়, দেখার দৃষ্টি থেকে আপনা-আপনি জমা হতে হতে যদি লেখকের কোন দার্শনিক ভাবনার পত্তন না হয়—তিনি যদি বছরের পর বছর শুধুই বস্তুপুঞ্জ, কাহিনীপুঞ্জ সৃষ্টি করে চলেন—তবে তাঁর লেখা যতই নিপুণ হোক—যতই অভিনব হোক—তা আপনাআপনি নড়বড়ে হয়ে যাবেই—তলিয়ে যাবেই।

এই দার্শনিক ভাবনা তখনই একজন লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে জেগে ওঠে—যখন তিনি মানুষ হিসেবে বারংবার নিজের বিশ্বাসের জায়গা হাতড়ে চলেন—নিজেকে ভাঙেন—খুঁজে বেড়ান—নিজেকে নিশ্চিহ্ন করার ঝুঁকি নিয়ে—নিজেকে দৈবী অতৃপ্তির—অস্থিরতার শিকার হতে দিয়ে—ঘাম ঝরিয়ে কোনও ভাবনার অধিকারী হন!

আমরা ক'জন তা করে থাকি জানি না।

কোন রাজনৈতিক বিশ্বাস আমাদের নেই। নেই ঘাম ঝরিয়ে কোন বিশ্বাস অর্জন করার কোন আয়োজন। কোন ধর্মীয় বিশ্বাসও আমাদের নেই—যে

বিশ্বাসের জন্যে কায়ক্লেশে জীবনধারণ করে কোন তীর্থে যাব বা কোন রাধাগোবিন্দের জন্যে নিজেকে সমর্পণ করব।

আমরা বলে থাকি—আমাদের সবারই মানবিক বিশ্বাস আছে। ধরেই নিলাম আছে। কিন্তু সেই মানবিক বিশ্বাসের জন্যে আমাদের কি নিজেকে নিশ্চিহ্ন করার কোন ঝুঁকি নিতে হচ্ছে? না নিজের নিরাপত্তার বলয়ের ভেতর থেকে শুধুই গলা বাড়িয়ে দেখছি আর লিপ সার্ভিস দিয়ে চলেছি?

সেদিক থেকে আমি বলব দেবেশ, শীর্ষেন্দু, সঞ্জীব, শৈবাল অনেকখানিই তাদের নিজের নিজের শক্ত মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। সে মাটি সত্যিই কতটা শক্ত—তা নিয়ে আমি প্রশ্ন তুলতে পারি। কিন্তু ওরা তো ওদের বিশ্বাসের জায়গায় পায়ের নিচে একটা মাটি পায়—সেটা তো সত্যি!

আমি জানি না—আমাদের বিশ্বাস ঠিক কোথায় আছে। আমাদের কথাটি ব্যাপক অর্থে বলছি। এই আমাদের ভেতর আমি নিজেকে ছাড়াও—একজন পাঠক হিসেবে—মতি, সুনীল, সন্দীপন, সমরেশ মজুমদারকেও ধরব।

আমাদের লেখার ভেতরে কোন চরিত্রের কিংবা আমাদের এই লেখকদের কারও কোথাও বিশেষ কোন বিশ্বাস আছে কি?

তেমনভাবে খুঁজে পাই না। যা পাই তা হল: মানুষে বিশ্বাস, মানুষের রূপ, মানুষের বৈচিত্র্য, মানুষের পতন, মানুষের উত্থান পড়তে পড়তে বড় হয়ে ওঠা, বড় হয়ে ওঠার ভেতর পতনের বীজ।

গত শতাব্দীর শেষদিকে একখানি বাংলা দৈনিকের মালিক রবীন্দ্রনাথকে রবিবারের পাতা দেখতে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ রবিবারের পাতায় নিজের একটি গল্প তিন কিস্তিতে ছাপান। সম্ভবত মাস্টারমশাই গল্পটি। কাগজের মালিক রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, আপনার গল্প পাঠকদের মাথার ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। বরং অন্য গল্প ছাপুন।

প্রবাসীর মালিক সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দুই কন্যা প্রবাসীতে লিখতেন। আগে কাগজ গড়ে উঠত একজন উৎসাহী উদ্যোক্তাকে ঘিরে। যেমন গড়ে উঠেছিল বঙ্গদর্শন, সাধনা, ভারতী, বালক, নারায়ণ, মর্মবাণী, যমুনা।

প্রবাসীকেই বলা যায় বিরাট করে দরজা খুলে দিয়েছিল সাহিত্যের জন্যে। রবীন্দ্রনাথ হেঁটে লেখা দিতে এসেছেন জোড়াসাঁকো থেকে। সে বিবরণ পড়েছিলাম সীতাদেবীর একটি লেখায়। ওখানেই লেখা দিতেন তারাশঙ্কর, দুই বিভূতিভূষণ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মনোজ বসু।

উদ্যোক্তা ঝিমিয়ে এলে কাগজও ঝিমিয়ে পড়ে। প্রবাসীর আয়ু ফুরনোর বেশ কয়েক বছর আগেই শনিবারের চিঠি, বঙ্গশ্রী এগিয়ে আসে। এই দুই জায়গাতেই সজনীকান্ত চালকশক্তি হিসেবে দেখা দেন।

এসব কথা বলছি—সম্পাদকের কথা বলব বলে। আমরা শুনেছিলাম—

সজনীকান্ত মানুষটি নাকি সুবিধার নয়। কিন্তু তিনটি বিষয় জেনে তাঁর প্রতি মাথা নত হয়ে আসে।

এক ঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানতে পারি—জীবনানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর কবিতা আগাগোড়া বলে চলেছেন সজনীকান্ত। যদিও সজনীকান্ত তার শনিবারের চিঠির সাহিত্যসংবাদে জীবনানন্দকে আক্রমণ করতেন। জীবনানন্দের মৃত্যুশয্যায় চিকিৎসা যাতে ভালভাবে হয়, সেজন্যে সজনীকান্ত তখনকার মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রকে অনুরোধ করেন। সবটা বলতে পারবেন এখন মেডিকেল কলেজের থোরাসিক বিভাগের প্রধান প্রফেসর ডক্টর ভূমেন্দ্র গুহ। তিনি কবির শেষ শয্যার পাশে ছিলেন। তখন সম্ভবত তিনি ডাক্তারি পড়তেন।

দুই ঃ মানিকবাবুর মৃত্যুর পর পরিচয় পত্রিকায় লেখকের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থপঞ্জিটি দিয়েছিলেন সজনীকান্ত।

তিন ঃ রবীন্দ্রনাথের অপ্রচলিত লেখাগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে এগিয়ে দিয়েছিলেন সজনীকান্ত।

কাগজ বড় হয়ে গেলে মালিক সম্পাদকের পক্ষে রোজকার সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। আমি কাছের থেকে শ্রীঅশোককুমার সরকারকে যতটা দেখেছি—তিনি একজন সৌম্য, সুস্থির মানুষ। মুখে সবসময় তাঁর হাসিই দেখেছি। তিনি নিজে সাহিত্যপ্রেমিক মানুষ ছিলেন। সুবোধ ঘোষ মহাশয়ের লেখা ছাপতে পেরে তিনি গর্ববোধ করতেন। শরদিন্দুর লেখায় তাঁর গভীর আগ্রহ ছিল। লেখকেরা যাতে ভাল রয়ালটি পান সেজন্যে তিনি আনন্দ পাবলিশার্স পত্তন করেন—কিংবা সেরকমই নির্দেশ দেন।

সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা অমৃত সম্পাদনা করতে গিয়ে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের সঙ্গে বহুবার রোজকার সম্পাদকীয় বৈঠকে বসেছি। ভাল লেখার জন্যে পাগল ছিলেন। যখন যেখানে যান সেখানে তাঁর সঙ্গে বই। একবার বিলাসপুরের হোটেলে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের জন্যে তাঁর পাশের ঘরে উঠেছি। খাবার সময় ডাকলেন। একা বসে খেতে পারেন না। দেখলাম—বিছানায় বেশ কয়েকখানা বই ছড়ানো। শিশিরকুঞ্জে ওঁর লাইব্রেরি তো দেখার মত। আমার সঙ্গে বই খুঁজতে নব্বই পেরিয়ে তিনি কলেজ স্ট্রীটেও গেছেন।

কোন একটি কাগজকে নিজের সন্তানের মত ভালবেসে সম্পাদনা করে আসছেন—পঞ্চাশ বছরের ওপর—সেই মানুষটি হলেন শ্রীসাগরময় ঘোষ। সবসময় তিনি সুবিচার করে উঠতে পারেননি হয়ত—হয়ত কারও কারও আমার মতই ক্ষোভ থাকতে পারে—কিন্তু আজ বয়সের একটা প্রসন্নতায় এসে বলতে কোন দ্বিধা নেই—তিনি সাহিত্য সাপ্তাহিকের যে মাত্রাটি গত অর্ধশতাব্দী ধরে সাপ্তাহিক

দেশ-এ গড়ে তুলেছেন—সেখানে পৌঁছানো কঠিন—এর আগে এমনটি আর হয়নি।

তবু সব উদ্যোগেরই মৃত্যু আছে। মানুষ আসে। মানুষ যায়। এবার যেন মনে হয়—এই সম্পাদনার পরেও আরও কিছু যেন দরকার। আমরা নিজেরা কিছু একটা করে সেই প্রথার নিগড়ে নিজেদের পা প্রোথিত করে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকি।

এবার যেন মনে হয়—নতুন কিছু একটা করা দরকার। সেদিক থেকে চতুরঙ্গ আমাদের পরপর ভাল নিবন্ধ দিয়ে চলেছে। সর্বদাই গভীর অন্বেষায় নিয়োজিত শ্রীশিবনারায়ণ রায়। জিজ্ঞাসায় তিনি বার বার আমাদের জন্যে বড় বড় দরজা খুলে ধরেছেন। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে প্রথম যখন তাঁকে দেখি তখন মনে হয়েছিল—তিনি সবার থেকে আলাদা। বছরখানেক আগে যখন তাঁকে দেখলাম—এখনও তিনি সবার থেকে আলাদা। গভীরে যাওয়ার নেশায় তিনি সমান মাতোয়ারা।

সম্পাদক বুদ্ধদেব, মানুষ বুদ্ধদেব, লেখক বুদ্ধদেব—তিনজনকেই দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। তাঁর কাছে ২০২ রাসবিহারীতে কখনও লেখা দিতে যাইনি। কিন্তু ছাত্র হিসেবে গেছি।

তাঁকে আমি স্যার বলতাম। তাই শ্রীমতী প্রতিভা বসু আমার স্যারিনা। স্যারিনার সঙ্গে আমরা কজন একঘরে বসে কথা বলছি। স্যার পাশের ঘরে বইয়ের র‍্যাকের ভেতর চেয়ার টেবিল পেতে বসে লিখছেন। এ দৃশ্য চোখে ভাসে। বিদ্যুৎচন্দ্র পাল নামে···আমার একটি গল্প তিনি এমনভাবেই প্রশংসা করলেন—যেন আমি একজন লেখক। ওঁর প্রবন্ধ—প্রবন্ধের ভাষা—এসব কথা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। মানুষ বুদ্ধদেব—অন্তত আমাকে আর দিব্যেন্দুকে উঠে দাঁড়াতে কী ভাবে করেছেন—তা বলে শেষ করা যায় না। এত স্নেহপরায়ণ মানুষ ছিলেন।

স্নেহপরায়ণ মানুষ আরেকজন শ্রীসত্যপ্রিয় ঘোষ—যাঁর দুই বিখ্যাত ভাই—শঙ্খ ঘোষ আর নিত্যপ্রিয় ঘোষ। সত্যদার কারও লেখা ভাল লাগল—সেই লেখকের লেখা যদি কারও তেমন ভাল না লাগে তো কেন লাগছে না—ভাল লাগা তো উচিত—এরকম মনে করেন। ফলে আমি ভীষণ লজ্জা পেয়েছি। ভালবেসেই তিনি অন্যকে দিয়েও তাঁর প্রিয় লেখকের লেখা ভাল লাগাতে চান।

এসব কথা এভাবে বললাম, কারণ এছাড়া অন্য পথে বলা যায় না। সব যে মনে ভিড় করে অগোছালভাবে চলে আসে।

আরও একজন সম্পাদকের কথা বলব। তিনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। কৃত্তিবাসের আমি কেউ না হলেও আমি ওঁর সম্পাদনায় দুবার দুটি বড় গল্প লিখেছি। সম্পাদক হিসেবে ও লেখককে যত্ন করে। ভালবাসে। নাক গলায়

না। আর সম্পাদকীয় লেখে চমৎকার। সম্পাদকদের মতই।

একবার এক শীতের দুপুরে—বোধহয় বছর ১২/১৪ আগে—ও চাদর জড়িয়ে টিভি দেখছিল। আমি যেন কি ব্যাপারে উত্তেজিত ছিলাম। ওর বাড়িতে। সুনীল শান্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, আমি কি তোকে ভালবাসিনি? শান্ত হ। প্রসন্ন হ।

সেদিন সুনীলকে আমি কিছুই বলতে পারিনি। মনে হয়েছিল—সুনীল খুবই শিক্ষিত।

ইদানীং লোকে নানান জায়গায় নিয়ে যায়। প্রবীণ হয়েছি যেন। কারণ মাথার ওপর অনেকেই আজ নেই। একথা একদিন দেবেশ রবীন্দ্রসদনের একটি সভায় বলেই ফেলল।

আমাদের ভেতরেও কেউ কেউ আজ আর নেই। যারা আমাদের দাদা ডাকে—তাদের মুখে তাকাই। সেখানে সংসারের ছায়া—চাপ। তাদের ভালবাসতে ইচ্ছে করে। বলতে লজ্জা হয়। মুখ চেপে থাকি। হয়ত চোখে ফুটে ওঠে।

আমিও কি ভালবাসিনি? আমার তো আবার ইচ্ছা হয়··কোম্পানিটা খুলি—লাভ, লাভ অ্যান্ড লাভ।

দলে দলে দৈবী পাগল মানুষ লিখতে আসেন। কিছু থাকে—কিছু ভেসে যায়। সময় সবাইকে খেয়ে ফেলার চেষ্টা করে। সময় যে বড় বলবান। নবীনদের লেখায় স্নান করে বার বার মনে হয়—এই বিশাল সঙ্গমে ডুব দেওয়া হয়নি আমার। সময় যে বড় বলবান।

সমাপ্ত